Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, বৈশাখ, [১ম সংখ্যা

১।	নববর্ষ	... ...	৩৭৫
২।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee	শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	৩৭৪
৩।	নিস্তারিণী	শ্রীযুক্ত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭৬
৪।	পাণ্ডব নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৩৭৮
৫।	ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ	... ...	৩৮৬
৬।	কেনারাম-বেচুরাম-রেচারাম	শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর	৩৯৮
৭।	নববর্ষ	শ্রীযুক্ত বনমালী শেঠ	৪০০
৮।	কলহ	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	৪০১
৯।	শেষ	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪০৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 13-6-27

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

জ্বর ছাড়ে ! পথ্যের বিচার ... !

..., ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪১।B মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০।৩৩
শ্রেণী সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ } ১৩৩৪ সাল, বৈশাখ { ১ম সংখ্যা

নববর্ষ।

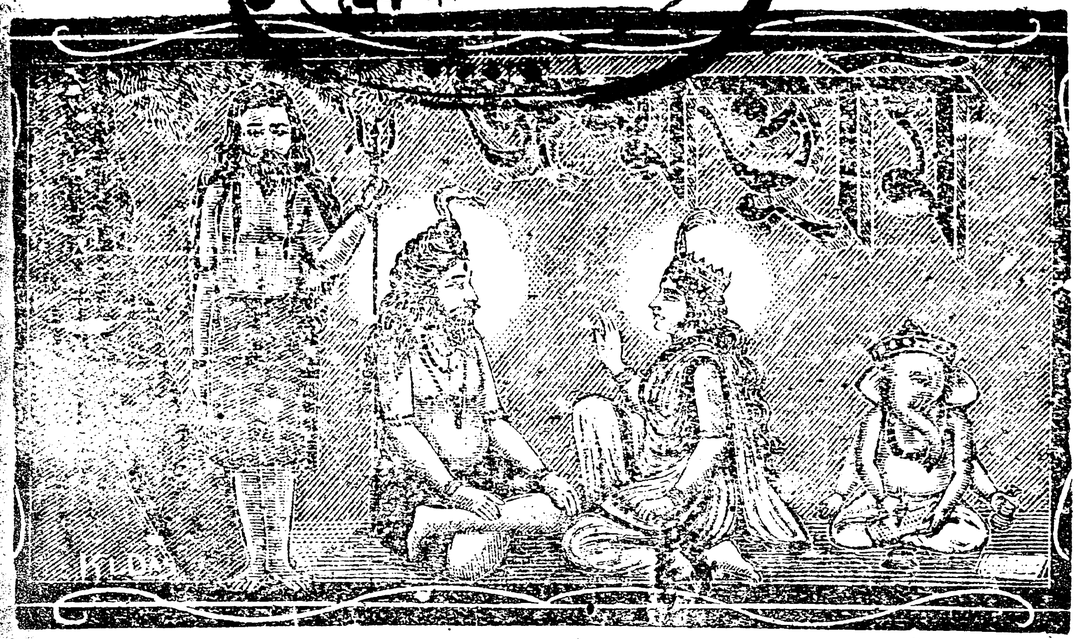

সর্ব্বমঙ্গলময়ী মা জগদম্বার অপার করুণায় "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা ৩২ বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ ৩৩ বৎসরে পদার্পণ করিল। ১২৯৭ সালে জন্মভূমির জন্ম। ১৩০৭ সাল হইতে আমরা জন্মভূমির পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া অবধি সাধ্যমত যত্নে জননী জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিতেছি। জন্মভূমির উন্নতি-কল্পে পাঠক মহোদয়গণের মনোরঞ্জনার্থ, বাগ্‌বাদিনী বীণাপাণির আরাধনায় দেহ, মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সাহিত্যসেবাব্রতে কর্ত্তব্যপালনে আলস্য অবহেলা অথবা ত্রুটি করিয়া জ্ঞানকৃত অপরাধে অপরাধী হই নাই।

এই সুদীর্ঘকাল নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়াও জন্মভূমির সেবা করিয়া আসিয়াছি। ১৩০৭ সাল হইতে আমরা হিন্দুধর্ম্মনীতি সমাজ এবং সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় জন্মভূমির সেবায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, শত সহস্র বিপৎপাতেও তাহা পরিত্যাগ করি নাই। গত বৎসরের শেষভাগেও আমরা সংসারের একটি শোচনীয় দুর্ঘটনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। গত

২০শে ফাল্গুন শুক্রবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় সংসারধর্ম্মের অকৃত্রিম সহায় সুহৃদ সহধর্ম্মিণীকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি! পত্নী ইহলোকে একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, শ্রীশ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছি। হরিনামে সংসারের লোকের শোক তাপ দূর হয় এবং প্রেতের সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর হয়, - তাই মানবের অন্তিমকালে হরিনাম করিতে হয়। গভীর শোকের সময় হরিনাম করিয়া শোক তাপের হস্ত হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। জানি না, আমাদের ও শিশু পুত্রের ভাগ্যে কি আছে। গতস্য শোচনা-নাস্তি। এক্ষণে আমরা জন্মভূমির নব-বর্ষাগমে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী সর্ব্বকল্যাণবিধায়িনী সর্ব্বমঙ্গলার শ্রীচরণে শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি. শুভঙ্করীর কৃপায় সকলের পক্ষেই এই নববর্ষ শুভ ও সুখাবহ হউক ইহাই কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছি।

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee.

[লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,]

স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লোকগণ।

১২৬১ সালে, পর পর ১ম ও ২য় ভাগ "চারুপাঠ" প্রণয়ন করেন। ১২৬৩ সালে তৃতীয় ভাগ 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ বিদ্যা' প্রকাশিত হয়।

ইং ১৭৭৭ সালের আষাঢ় মাসে তিনি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগ উপলক্ষে তাঁহাকে জন্মের মত লেখনী ত্যাগ করিতে হইল। হস্ত নিরস্ত হইল বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং এরূপ পীড়িতাবস্থায় ১৭৯২ সালে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ভাগ" ও ১৮০০ সালে উহার ২য় ভাগ পরিসমাপ্ত করেন। তিনি যে কিরূপ পীড়িতাবস্থায় এবম্বিধ প্রগাঢ় গবেষণা ও বহু শ্রমসাপেক্ষ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মন এককালে বিস্ময় ও করুণরসে মগ্ন হয়।

অক্ষয় বাবু পীড়িত হওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে থাকেন। শেষে বালি গ্রামে একটী বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি

পরিচারক মাত্র লইয়া বাস করেন। তিনি বহু যত্নে ও ব্যয়ে দেশী বিদেশী, সাধারণ ও অসাধারণ নানাবিধ বৃক্ষলতাগুল্মাদি সংগ্রহ করিয়া এই বাটীর অঙ্গনে একটী রমণীয় পুষ্পোদ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক সহৃদয় বন্ধু ঐ লোকপ্রসিদ্ধ সুচারু উদ্যানের "চারুপাঠ ৪র্থ ভাগ" নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ উদ্যানটিকে উদ্ভিদ্ রাজ্যের সংক্ষিপ্তসার বা উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষার উপযোগী পরীক্ষা ক্ষেত্র স্বরূপ বলা যায়। সমাজ ও স্বপরিবার হইতে অপসৃত হইয়া ঐ উদ্যানবাটী মধ্যে নির্জ্জনে জীবন্মৃতাবস্থায় শেষ কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার গৃহসজ্জা সামগ্রী সমূহও বিজ্ঞানার্থীগণের প্রীতির আস্পদ। গৃহের চারিদিকে নানাপ্রকার সিন্ধুজাত শঙ্খ, শম্বুক, প্রাণীদেহ জীবকঙ্কাল, নানাবর্ণের প্রস্তর এবং প্রস্তরীভূত বহুবিধ উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর (Fossils) প্রভৃতি অসামান্য বস্তু সমুদয় মনোহর ভাবে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত কয়েক প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বিবিধ ভূচিত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রতিকৃতিও গৃহসজ্জার মধ্যে; এই সমস্ত সামগ্রীর সহিত তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট। এরূপ কৌতূহল উদ্দীপক ও জ্ঞানদায়ক মনোরম দুর্লভ সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত উদ্যানবাটী বিরল।

এবম্বিধ গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তিনি দুই ভাগ সুবৃহৎ "উপাসক" সম্প্রদায় পরিসমাপ্ত করেন। জীবন্মৃতাবস্থায় এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন অসাধারণশক্তি বলিতে হইবে।

বালির উক্ত বাটীতে নির্জ্জন অবস্থিতি কালে তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী সভা" হইতে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। পরে যখন আপন পুস্তক বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাঁহার সকল ব্যয় সংকুলান হইতে লাগিল, তখন তিনি সেই বৃত্তি ত্যাগ করেন।

নিঃস্বার্থ জ্ঞানচর্চ্চা ও স্বদেশবাসীর মঙ্গলসাধন করিবার জন্যই তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। আপনি শিখিব ও সাধারণকে শিক্ষা দিব, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতেই তাঁহার সমগ্র রচনাবলী [illegible] হইয়াছে। স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু ও বিশুদ্ধপ্রকৃতি ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রচনা সরল, মধুর সারবান, সরস, বিশুদ্ধ ও নীতিপূর্ণ।

যখন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, ক্ষীণ ও নির্জীব ছিল, ভাষায় বিজ্ঞানাদির অস্তিত্ব ছিল না, সাহিত্যজগতের ও সমাজের নৈতিক বায়ু বড়ই দূষিত ছিল সেই সময়ে অক্ষয় বাবু নির্জীব বঙ্গভাষাকে তেজস্বিনী করিয়াছেন, অনেক নূতন কথা

প্রস্তুত করিয়া, নূতন বাক্য বাহির করিয়া ও নূতন ধরণের রচনাপ্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া ভাষাকে পুষ্ট ও স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

অক্ষয় বাবু স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে কিরূপে সক্ষম হওয়া যায় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই মানব জন্ম সার্থক।

এবম্বিধ মহাত্মাই ভাষার গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব, মনুষ্য নামের গৌরব। এরূপ আদর্শ চরিত্র অনুকরণের যোগ্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

নিস্তারিণী।

লেখক—শ্রীযুক্ত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি কে?

আমার এ কথা জান্‌তে হলে আগে মাঝিকে ডাক্‌তে হবে, কারণ তা না হলে তোমায় পাওয়া যাবে না এবং মাঝি যদি আমায় কোনও রকমে তোমার দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলে! দেখি একবার হাঁক মেরে, কোথায় হে পারের বন্ধু! আগে তোমার কাছে আমার প্রাণপাখীকে দক্ষিণা করি, তবে তোমার উপহারের ফুলটী আমার ঘ্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিও যাহা ষট্‌চক্র বলে; এবং তন্ত্রে যাহাকে ক্ষিতির গুণ গন্ধ বলে, সেই মূলাধারে বসে আধেয়কে ডাকে।

১। জ্ঞানান্মানং পরমাত্মনং দানং ধ্যানং জ্ঞানং যোগং অন্তরযোগং বাহ্য বিধানং শিবেন কথিতং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।

প্রাণং দেহং গেহং রাজ্যং স্বর্গং ভোগং মোক্ষং ভক্তিং পুত্রং মিত্রং বিত্তং কলত্রং শিবেন রচিতং ন গুরোরধিকং। ২।

বিষ্ণুভক্তি পূজনং চরিতং বৈষ্ণবসেবা মাতরি ভক্তিং শ্রীবিষ্ণু বিধিরপি সেবন পূজনং ন গুরোরধিকং। ৩।

প্রত্যাহারং চেন্দ্রিয়জয়ং প্রণায়ামং ন্যাসবিধানং ইষ্টে পূজা তপজপ-ভক্তিং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং। ৪।

তাইতো—গুরুদেবকে এতদূর বলে ডাক্‌লুম তবু তিনি কৃপা করলেন না কেন? এখন কথা হচ্ছে ডাক্‌বার জন্য ব্যস্ত মাত্র আমি হয়েছি। আমি কি আমার মনটীকে তাঁকে দিয়ে ডেকেছি? এর প্রমাণ আমায় কে দেবে? তন্ত্রের মদের বোতল না মুদ্রা না মাংস না মৈথুন? আর যখন আমি এর আস্বাদ পাই নাই তখন আমি কার কথায় বিশ্বাস করে এই প্রলয়ের মধ্যে অগ্রসর হতে চলেছি? এই কি আমার প্রকৃতির গতি না ধ্বংসের পথ?

পঞ্চতত্ত্ব সাধনা।

প্রকৃতি রাণী এখন তুমি বিশ্বাসীর কাছে কি পেলে? এক বোতল মদ্য, এতে তোমার কি হবে? সাধনার উন্নতি হবে, না ঘোর অবনতি হবে একবার ভেবে দেখো দেখি। ঘোর অমাবস্যায় তোমার প্রকৃতি চাচ্ছিল পূর্ণিমাকে দেখে আনন্দ অনুভব কর্‌বে, সেইজন্য তুমি গুরুদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌লে—ক্রমোন্নতি কর্‌বার জন্য, সে জায়গায় তোমায় কি দিয়ে রেখে দিলে ভাব, "মন তোর" বিচার কর, দেখ কি কর্‌বে, "জয় গুরুদেব" বলে? রসনায় দিয়ে তার সুফল কুফল ভোগ করবে, না অবিশ্বাস করে ঐ জায়গাটুকু বাদ দিয়ে সাধনা কর্‌বে? তাহলে কিন্তু সাধনা হবে না, ঠিক বিশ্বাস করা হবে না—তাতে পাবে না। আমার রুচি যখন আসব পান কর্ত্তে চাচ্ছে না তখন আমার সুনীতি দ্বারা সাধন করায় আপত্তি কি?

"মূলমন্ত্রে যন্ত্রভরা শোধন করি বলে তারা"
"যা দেবী সর্ব্বভুতেষু "কারণ" রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

(শোধন ও দেবীকে নিবেদন)

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং
যোগীন্দ্র মীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমৎ গুরুং নিত্যমহং ভজামি।

গুরু। বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে বৎস! পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় অগ্রসর হয়েছ, চল। তোমার কোনও ভয় নাই, ধ্বংস ও রক্ষা আমারই, আমার উপর নির্ভর করে নিস্তারনৌকা গুরুপাদপদ্ম ধরে চলে যাও, আমি তোমায় সর্ব্বদা রক্ষা কর্‌বো, কোনও ভয় নাই, মাভৈঃ।

শিষ্য। দেবতা, আমার প্রথমে মনে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল, কারণ ভাব্‌ছিলুম ব্রাহ্মণের ছেলে যা কখনও করি নাই সেই কি তোমার আদরের প্রিয় বস্তু?

তোমার প্রবৃত্তিকে আমার কাছে কেন রাখ্‌লে দয়াময়! ক্রমশঃ আমার সুনীতি যদি সুরুচিতে গিয়ে প'ড়ে তখন আমার উপায় কি হবে? দয়াময়, তুমিই সর্ব্বদা আমায় শ্রীচরণে স্থান দিয়ে এই কথা মনে আমার জাগিয়ে রেখো "অভিষেকো ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ"। তাহলে প্রবৃত্তি আমায় বিপথগামী কর্‌তে পার্‌বে না। রামপ্রসাদ সেন সুধা পান করেছিল এবং বলেছিল,—

সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে যত মদ মাতালে মাতাল বলে॥
অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরী অমৃতবর্ষিণী
অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা।

স্বভাব।

লেখক — শ্রীযুক্ত অবণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি নিয়মে আকৃতি সময়ে
ধারণ করিয়া থাকে।
তোমার অভাব, তাহার স্বভাব,
স্বভাব, অভাবে ঢাকে?

পাণ্ডব নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুঞ্জ।

দ্রৌপদী। ওলো! বৃথা হ'ল ব্রজলীলা আয়োজন!
সঙ্গীত শিখিলি নিকুঞ্জে সাজালি আজ
ধরিলি গোপিনী বেশ সবে মিছা কাজে!

চতুরা। কেন দেবি! ব্রজরাজে সখা সনে তাঁর
তুষিব—দেখাব সে মোহন অভিনয়।
দ্রৌপদী। জেনে শুনে রুক্মিণী-রমণ আর হেথা রয়?
চলিলা দ্বারকাপুরে।
চতুরা। ভাল, শুনাইব তাঁহার সখারে।
দ্রৌপদী। কোথা পাইবি তাঁরে কেমনে?
চতুরা। কৃষ্ণ নাম শুনে
কৃষ্ণ সখা আসিবে এখানে।
দেবি! তবে গাও গীত একপ্রাণে।

দ্রৌপদী। (গীত)

ওলো সই কই কৃষ্ণ এলো রে আমার।
যাপি যামী যার তরে, সে তো নাহি মনে করে,
আছে ভুলে কুহকে কাহার?
আস্‌ব ব'লে গেলো চলে ফিরিল না আর॥
শুকালো কুসুম রাশি, মলিন চন্দ্রমা হাসি,
ফণিসম দংশে মণি-হার।
শ্যাম চাঁদ বিনা বৃন্দে হৃদয় আঁধার॥

ওলো সখি! এইজনে কহে দয়াময়!
অবলায় ভুলাইয়া ছলে গেলা চলে
মধুপুরে! আর হরি না স্মরিলা কভু
রাধিকায়! প্রাণে প্রাণে যে যাহারে চায়
ক্ষণে না হেরিলে তায় নয়নে নয়নে
সদা দুঃসহ দহনে পোড়ে সে রমণী।
নাহি জানি আহা! কোন্ প্রাণে, রে চতুরা!
কেমনে সরলা কৃষ্ণপ্রাণা গোপবালা
এতদিন সহে জ্বালা হরি হরি করি।
কোথা হরি হায় এবে দ্বারকাবিহারী?
যথা কৃষ্ণ সখা তার তেমনি নির্দ্দয়

চতুরা। রাজেন্দ্রাণি! মনে হয় ফিরিবে এখনি
পাণ্ডব ফাল্গুনী হেথা না হইবে বৃথা
এই সব আয়োজন।

দ্রৌপদী। পুরুষের মন
না জান অনূঢ়া তুমি, তুমি বালা; করি ছলা
আত্মগত জনে, অন্যস্থানে যাচে প্রেম;
ফেলি হেম আদর লৌহেতে, প্রতিদান
চিতে চিতে নাহি পারে দিতে; লুব্ধ নর
যেন মধুকর নব ফুলে মধু আশ,
নিত্য নব নব সৌন্দর্য্য বিলাস জড়-
সেবী; যদি কভু পুরুষে দানিস্ প্রাণ,
ত্যজি অভিমান রাখিস্ চোখেয় পরে
তারে।

চপলা। মহারাণি!
তব অধিকার জানি সবার উপরে;
পাটরাণী, পাণ্ডব-ঈশ্বরী সোহাগিনী,
ইন্দ্রাণী অধিক ঐশ্বর্য্যে সম্পদে মানে;
যাদবেন্দ্র সম্মানে সতত সখীভাবে;
যাদবনন্দিনী সেবে তোমা আজ্ঞাধীনা
কনিষ্ঠা ভগিনী সমা; অন্যজনা কেবা
ধরে কতেক গরিমা লঙ্ঘিতে তোমায়?

দ্রৌপদী। রে গর্ব্বিতে! সপত্নী আশয় কি বুঝিবি?
পতি লাগি সহোদরা ভগ্নী পর হয়,
নাহি রয় দাম্পত্য বিশ্বাস, হৃদাকাশ
ঘেরে ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ জীমূতজালে;
কোন কালে পতিপ্রেম আশ নাহি মিটে—
বটে, সখা অনুরোধে ক্ষমি সুভদ্রারে,
তাই সে আমারে সদা জ্যেষ্ঠা মানে মনে;
কিন্তু প্রাণে কেমনে বুঝাই, কহি তাই—
রাজ্য পারি পতি নারি বিলাইতে কারে।

চপলা। দেবি! কহিবা আমারে—কে সে নারী, তোমা
না বিচারি, সভার মাঝারে কালি স্ফীত-
নেত্রা বসিল সদর্পে সিংহাসনে, কা'রে
অহঙ্কারে না গণিল? কহিল—পাণ্ডব
বরিল তাহারে অগ্রে, শ্রেষ্ঠ ভাগ রাজ্যে
আছে তারি।

দ্রৌপদী। মিথ্যা কথা!
কামরূপা নিশাচরী সে, ধরি মোহিনী
শুনি ভুলাইল দ্বিতীয় পাণ্ডবে, যবে
জ্ঞাতি-শত্রু খল দুর্য্যোধন ছলে পড়ি
জৌ-গৃহ অনলে সাধু বিদুর কৌশলে
পেয়ে রক্ষা, অজ্ঞাতে পাণ্ডব ছিল বনে।
এ কুলটা হিড়িম্ব-রাক্ষস-সহোদরা,
হয়ে কামাতুরা ভজিল ভীমে স্বৈরিণী।
ক্ষত্রিয়ে অগ্রজ বিদ্যমানে সবে জানে
অনুজের পরিণয় কভু সিদ্ধ নয়,
এ হ'তে সে দাসীত্বে অধিক্ সত্ত্ব জানি
ধিক্ মানি, এ হেন নির্লজ্জ কামিনী,
কলঙ্ক রমণী-কুলে।

চপলা। রে চতুরে! পুনঃ যাবি ভুলে, একপ্রাণে
সবে মিলি গাও নব তান, যাঁর গান
ভুলাইব তাঁরে।

দ্রৌপদী। সখি, সখি! ভুলায়েছ মোরে নিজগুণে—
তোমা দোঁহে শৈশবের সখী ভগ্নীসমা
দেখি, অনুপমা বালা চিরদিন
অনূঢ়া রহিলা মোর লাগি; সুখে বহু,
দুঃখে ভাগী এক নাহি মিলে! গাহি শুন
কৃষ্ণবিলাসিনী কিবা বলে।

(গীত)

সখি রে ! কি হ'তে কি হইল আমার,
সঁপিনু দেহ মন জীবন যৌবন
কিনিয়ে শঠের প্রেম একে হ'ল আর।
কৃষ্ণ ধন বিনে বৃন্দে ! কি আছে রাধার ?
জাগরণে ধ্যানে, শয়নে স্বপনে
এই দেখি, লুকায় আবার।
সখি রে ! যাব যথা পাব দেখা তার॥

দেখ সখি ! হেন আত্মসমর্পণ পরে
পুরুষে কভু না জানে ; কখন সংগ্রামে,
মন্ত্রণা-ভবনে কিবা রাজ-সিংহাসনে,
প্রজার শাসনে কিবা কূটনীতি তত্ত্বে
অর্থ অভিলাষে, কভু পরনারী পাশে
গোপন বিলাসে, অথবা মৃগয়া সুরা
মায়ার দেবনে—কখন সে নরজাতি
নহে স্থির মতি, কিন্তু সতী সদা রহে
পতিপদ ধ্যানে।

চপলা। দেখ দেখ রাণি ! সত্য যা কহিনু,
আসিছেন গজগতি গাণ্ডীবী এখানে।

চতুরা। দেবি ! দেখিব আজিকে রহ অভিমানে।

দ্রৌপদী। তা'রে ভীরু !
বিহ্বলা গোপিনী মোরে না ভাবিস্ মনে,
এই হবে পরক্ষণে যাবে অভিমান—
গাও পুনঃ নব গান।

(সখীগণের গীত)

হেলিয়া দুলিয়া, অলসে রসিয়া,
আসিছে মোহন ঠাম।
যামিনী যাপিয়া, বিহারে মাতিয়া,
পুরাইল কা'র কাম্॥

মনোচোরা, বিলাস বিভোরা,
সুন্দর নট ভঙ্গিম অভিরাম।
ক'ার কুঞ্জে, পশিয়া নাগর,
ভুলিল রাধার নাম॥
কোন্ ধনী, কিমতি সাধনা
করিয়া লভিল শ্যাম ?
ধনী ধন্য মানি, সোহাগিনী হ'য়ে
পুরাইল মনকাম॥

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। ভারত-ঈশ্বরি ! হের এ চির অধীনে,
করি বাস তব রাজ্যে, সদা নিয়োজিত
তব কার্য্যে, ভাগ্যে আছে বহুদিন পরে
বন্দিতে তোমারে ; পাইলাম অবসর।

দ্রৌপদী। ধন্য মানি কর্ত্তব্য-তৎপর ! ভাল, ভাল—
হে গাণ্ডীবধর ! শুনি অনন্তের ভার
ধর করে, ত্রিসংসার জিনিলা স্ববলে,
অতি সুকুমার মার, তার সুকোমল
শর পারনা বারিতে, সবার সাক্ষাতে
কপটতা আজি তব বুঝিব বিচারি।

অর্জ্জুন। মহারাজ্ঞি !
অনঙ্গ সে তব আজ্ঞাকারী, তেঁই হারি
তার সনে।

দ্রৌপদী। কপট সে রণে, তুমি রণচোর নিরন্তর—
ভাল, ওহে দিগ্বিজয়ী বীরবর ! কোন্
দিগঙ্গনা—পাতিয়া ছলনা
বাঁধিল তোমায় এবার ?

অর্জ্জুন। দেবি ! সাধ্য কার অন্যে বাঁধিতে অর্জ্জুনে
যোগ্য ধর্ম্ম কর্ম্মে দৃঢ়ব্রতী স্থিরমতি ?

দ্রৌপদী। জানি, ওহে যতি! জানি তব ব্রতাচার,
তপস্বী সাজিয়ে, মরি! ছলনা পাতিয়ে
যাদবী হরিয়ে শেষে হাসালে সংসার,
বার বার পাঞ্চালীরে কতেক জ্বালাও।

অর্জ্জুন। সতি! জেনে শুনে নিজ অনুগত জনে
কেন এ যন্ত্রণা দাও? জান মম প্রাণ—
সত্য যাহা; তুমি ধ্যান জ্ঞান, একা ভদ্রা,
লক্ষ হ'লে তুমি জানি সবার উপর।
জিষ্ণুর অমূল্য রত্ন লক্ষ্য-বেঁধা-ধন!

দ্রৌপদী। জানি ভাল,
ওই গুণে ভুলাও হে পাঞ্চালীর মন।

অর্জ্জুন। সুধি প্রিয়ে!
নব ভাব আজি সব করি নিরীক্ষণ।

দ্রৌপদী। কৃষ্ণলীলা ক'রেছি রচন, ছিল চিতে
সখারে তুষিতে নৃত্যগীতে এ বিপিনে,
জানি অন্তর্যামী চলিলা দ্বারকাপুরী।

চতুরা। দেবি! মোরা সহচরী তব, দেহ আজ্ঞা—
করি সাধ, গাইব এ মধুর মিলন।

(সকলের গীত)

শ্যাম চাঁদ মরি উদিল রে।
হেরি গোপিনীপ্রাণ মাতিল রে॥
গাও নিকুঞ্জ, তরুলতা মুঞ্জ, গুণ্ গুণ্ গুঞ্জরে
ভ্রমরা ভ্রমরী।
গাও শুক শারী, মধু সহকারী
গাও কোকিল মধুর লহরী॥
গাও অনিল, যমুনা সলিল,
নীল গগণ গাও রে।
মাধব মাধবী মিলন রে,—
হেরি গোপিনী-প্রাণ মাতিল রে॥

অর্জ্জুন। ধন্য ধন্য সতি! ভক্তির কল্পনা তব,
শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর আদর্শ মিলন!
প্রেমচক্ষে নিরখিলা উচ্ছাসে গাইলা,
কিশোর কিশোরী জগজনে কণ্ঠ মন;
ধন্য মানি প্রিয়ে, যোগ্য সখী তুমি তাঁর,
সত্য সখা শ্রীহরি তোমার প্রেমাধার।

(দূরে ভেরি নিনাদ)

ক্ষম দেবি! পুনঃ হবে যাইতে সভায়,
ধর্ম্মরাজ নিমন্ত্রিলা রাজা দুর্য্যোধনে
আমা সবা সনে বঞ্চিতে সভায় আজি,
রাজসম্ভাষণ গীতনাট্য বিলাসরঞ্জন
হবে মহোৎসব কৌরব সম্মান হেতু।

দ্রৌপদী। পাণ্ডবপ্রধান যথা আর্য্য-ধর্ম্ম-সেতু,
কুরু তথা দুষ্টতা জলধি; পাণ্ডবের
কৌরব সনে মিলন অপূর্ব্ব ঘটনা
বিষদান জৌগৃহদাহন কথা যত—
শুনিয়াছি সেই দিন মহাদেবী মুখে।

অর্জ্জুন। মহারাণি!
রাজ-ব্যবহার রাজা ছাড়ে না কখন!

দ্রৌপদী। রাজনীতি করেছি শ্রবণ; জ্ঞাতি শত্রু
মিত্র হয় বিনাশ কারণ।

অর্জ্জুন। যথা ধর্ম্ম তথা জয় সদাকাল দেবি!
তাই কভু নাহি ভাবি শত্রুর কারণ;
সদা নারায়ণপদে মতি, জেনো সতি!
গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন নহে ন্যূন একা
বাহুবলে রক্ষিতে ধর্ম্মের সিংহাসন,
তাহে অন্য ভ্রাতৃগণে দিগ্বিজয়ী জনে জনে।

দ্রৌপদী। জানি মনে;
তথাপি কৌরব খল ক্ষুদ্র শত্রু নহে।

অর্জ্জুন। ক্ষুদ্র, দেবি! অর্দ্ধভাগে কুরু রাজ্য ধন

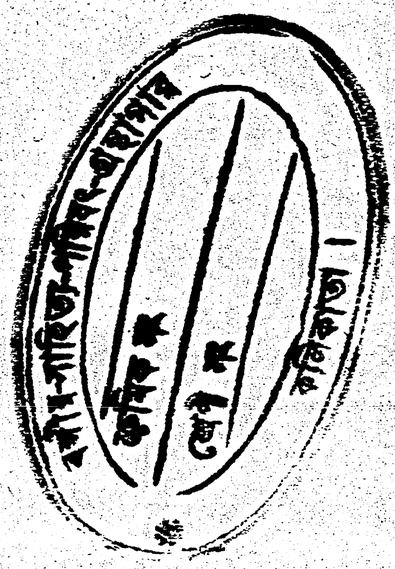

ভুঞ্জে আমা সবা সনে, অধিক তাহার
নিল ছলে, বাহুবলে নহে কভু মম
পিতৃ-সিংহাসন হস্তিনার অধিকার।

দ্রৌপদী। সে গর্ব্ব হ'য়েছে খর্ব্ব এবে ; ইন্দ্রপ্রস্থে
পাণ্ডব ভারতেশ্বর একা, ছোট বড়
ছত্রধর বলি নৃপ যে যথায় আছে,
এবে পাণ্ডব অধীন, শুনিলে ত সখা
মহাদেবী পাশে কহিলা বিদায় কালে।

অর্জ্জুন। শুন সতি! যথাকালে ধর্ম্মবল ফলে।
উৎসবে ত করিবে গমন ?

দ্রৌপদী। যাব বটে কিন্তু সেই দুর্জ্জনবদন
দেখিতে বিরাগভাব সদা মোর মনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রী শ্রীভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

প্রথম অঙ্ক।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষ।

ধৃতরাষ্ট্র আসীন।

(সঞ্জয়ের প্রবেশ)

সঞ্জয়। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে প্রণাম করি।

ধৃত। (আশীর্ব্বাদ করিয়া) উপবেশন কর। আমি তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। হে সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ যুদ্ধাভিলাষী হয়ে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন সে কথা আমি শুনেছি, তথায় তাঁরা কি করিলেন, সবিশেষ আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয়। মহারাজ! সমরক্ষেত্রের শোকাবহ সমাচার আজ আমি নিবেদন করিয়া আপনাকে ব্যাকুল করিতে আসিয়াছি। শান্তনুনন্দন কুরু-পিতামহ ভীষ্মদেব আজ শিখণ্ডীর হস্তে পরাজিত হয়ে শরশয্যা আশ্রয় করেছেন। হে মহারাজ! যিনি মহাবীরগণের অগ্রগণ্য, যিনি কৌরব-গণের আশ্রয়, অরাতিকুল যাঁহার ভয়ে বিকম্পিত হইত, মহাবীর্য্যবান পরশুরাম যাঁহার শরে পরাজিত হয়েছিলেন, আপনার পুত্রেরা যাঁহার বীর্য্যের উপর নির্ভর করে ভীষণ সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছিলেন, বিপুল বিক্রমে দশদিন রণস্থলে পাণ্ডবগণের বহুসৈন্য নিধন করে আজ সেই মহাবীর্য্যশালী দেবব্রত ভীষ্মদেব বাতাহত মহাদ্রুমের ন্যায় রণভূমে নিপতিত; শৌর্য্যবীর্য্যে যিনি দেবরাজ পুরন্দরতুল্য, ধৈর্য্যে যিনি হিমাচলতুল্য, সহিষ্ণুতায় যিনি জীবধাত্রী ধরণীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে যিনি মহার্ণব তুল্য, আজ সেই পরাক্রান্ত ভীষ্মদেব যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যাশায়ী।

ধৃত। হে সঞ্জয়! মহাত্মা ভীষ্মদেবের পতনে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। পঞ্চালনন্দন খড়্গাজিহ্ব শিখণ্ডী কিরূপে সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীরকে রথ হইতে নিপাতিত করিল? ভীষ্মদেবের পতনে আমার পুত্রগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন? যুদ্ধ কালে কোন্ কোন্ বীর সেই অতিরথ শান্তনুনন্দনের পুরোবর্ত্তী, কোন্ কোন্ বীর তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী এবং কোন্ কোন্ বীর তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়েছিলেন? ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে থাকিতে কিরূপে ভীষ্মদেবের পরাজয় হইল? কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, দেব-গণের অজেয়, পরশুরামবিজেতা, দেবোপম দেবব্রতের নিধনে যুধিষ্ঠির কি করিতেছেন? হে সঞ্জয়! এই সকল বিষয় সবিস্তারে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয়। মহারাজ! ভীষ্মদেব রথোপরি উপবিষ্ট হইলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সময়োচিত উপদেশ দিয়া দুঃশাসনকে বলিয়াছিলেন, তোমরা সকল বীর সযত্ন হইয়া ভীষ্মদেবকে রক্ষা কর; ভীষ্মদেব রক্ষিত হইলেই আমরা সুরক্ষিত হইব ভীষ্মদেব অক্ষত থাকিলেই পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল হইবে! হে মহারাজ! দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন যত্নবান হয়ে অপরাপর বীরগণের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভীষ্মদেবের

প্রতিজ্ঞা ছিল শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীলোক ছিল, তাহাকে পরিত্যাগ করাই ধর্ম্মাত্মা বৃকোদরের অভিপ্রেত শিখণ্ডী সেই সাহসে ভীষ্মদেবের সহিত যুদ্ধে অভিলাষী হয়। তাহার হস্তেই ভীষ্মের পতন সম্ভাবনা এই চিন্তা করিয়া আপনার পুত্রেরা শিখণ্ডীকে বধ করিবার পরামর্শ করেছিলেন; সে পরামর্শ সিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট হইল; ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর অর্জ্জুন সেই শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছিলেন, অতএব কৌরবপক্ষীয় বীরেরা শিখণ্ডীকে সংহার করিতে পারেন নাই, শিখণ্ডীর হস্তেই ভীষ্মদেবের পতন। হে মহারাজ! দেবগুরু প্রসাদে আমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সমস্ত তত্ত্ব আমি পরিজ্ঞাত হইতে পারি। আপনি ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যেরূপ দুর্ম্মন্ত্রণায় লিপ্ত আছেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা তাহা অবগত ছিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাদের শঠতা বুঝিতে পারিয়াও কেবল আপনার মুখ চাহিয়াই ত্রয়োদশবর্ষকাল বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণে কাল পূর্ণ হইয়াছে; পাণ্ডবেরা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, আপনার পুত্রেরা অধর্ম্মের দাস; ইহজগতীতলে মানবগণ স্ব স্ব শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করে আপনার পুত্রেরা কর্ম্মসূত্রে অধর্ম্মপথে গতি করিতেছে, তাহাদের পাপেই অজেয় ভীষ্মদেবের পরাজয়; আমি জানিতে পারিতেছি, এইরূপে বিশাল কুরুকুল এই ঘোর সমরানলে ভস্মীভূত হইবে। ধর্ম্মের মহিমা চিরদিন সমান। ভীষ্মবিরহে যুধিষ্ঠির অতিশয় কাতর হইয়াছেন, ভীমার্জ্জুনও ক্রন্দন করিতেছেন।

ধৃত। (বিমর্ষবদনে) হে সঞ্জয়! আমার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইতেছে। আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। উভয় পক্ষীয় বীরগণ কিরূপে সজ্জিত হইয়াছিলেন, কি প্রকারে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে, তুমি তাহা সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় এইরূপে অভিহিত হইয়া কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের সজ্জা বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিলেন। তাহার পর কহিলেন, অর্জ্জুনের অনুরোধে তদীয় সারথি বাসুদেব উভয় সেনার মধ্যস্থলে শ্বেতাশ্বযোজিত কপিধ্বজ রথ সংস্থাপন করিলেন। উভয়পক্ষ সৈন্য ব্যূহ সন্দর্শন করিয়া

ধনঞ্জয় আগ্রহ-সহকারে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাসুদেব! কোন্ কোন্ বীরপুরুষ রাজা দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে রণবেশে এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তুমি বিশেষরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর!

শ্রীকৃষ্ণ তখন একে একে কৌরবপক্ষীয় রথী মহারথী সেনাপতি ও প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণের যথাযথ পরিচয় দিলেন। দর্শনে ও শ্রবণে মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক রথোপরি ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

ধৃত। কুরুসৈন্য দর্শন করিয়া অর্জ্জুন তখন কি করিল?

সঞ্জয়। নিতান্ত বিষণ্ণবদনে কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! ইহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে? যুদ্ধকরা আমার অসাধ্য। আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে, হস্তমুষ্টি হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, আমি আর স্থির থাকিতেছি না, চক্ষে যেন অন্ধকার দর্শন করিতেছি; বল! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য শূরবর কৃপাচার্য্য, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয় নরপতিগণ এবং আমাদিগের আত্মীয়বর্গ জিগীষা পরবশ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহাঁদিগকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে আমি কি ফললাভ করিব? আমি জয় চাহি না, রাজ্য চাহি না, কোন প্রকার সুখের আশা রাখি না, দুর্য্যোধনের আকাঙ্ক্ষা সফল হউক, আমি যুদ্ধ করিব না। গাণ্ডীব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থিতি।

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! এই মহাশঙ্কট সময়ে কিহেতু তোমার এই অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? এরূপ মোহ স্বর্গ প্রতিরোধক। বীর গৌরবান্বিত ক্ষত্রকুলে তোমার জন্ম, অরাতি-নিপাতন তোমার ধর্ম্ম, আততায়ী শত্রুকুল তোমাকে হনন করিতে উদ্যত, এ ক্ষেত্রে মোহবশে দয়া প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না; মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন! যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা সম্মুখে উপস্থিত; বিশেষতঃ পূজনীয় গুরুজনগণ সশস্ত্র যুদ্ধার্থী, ইহাদিগকে বধ করিয়া আমি রাজ্য

লাভ করিব, সে রাজ্যে ধিক্! অধিকন্তু যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, যদি আমি জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে জয়লব্ধ শোণিতলিপ্ত অর্থ আমার ভোগ্য হইবে, ধিক অর্থভোগ! তদপেক্ষা বরং ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করা ভাল। হে ভগবন্! তুমি আমার সখা, তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য, এক্ষণে আমার পক্ষে কি করা শ্রেয়ঃ, উপদেশ দাও।

কৃষ্ণ। হে পার্থ! তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বধের আশঙ্কা করাতে তোমার মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না, যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও ক্ষয় হয় না। তুমি, আমি, এবং এই সমস্ত সমবেত বীরপুরুষ, সকলেই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম ইহার পরেও বিদ্যমান থাকিব; মৃত্যু কেবল দেহান্তর গ্রহণ মাত্র। দেহের বিনাশ আছে, জীবাত্মার বিনাশ নাই। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। অতএব জ্ঞানী পুরুষেরা কি মৃত, কি জীবিত, কাহারও জন্য অনু- **কৃষ্ণ।** শোচনা করেন না। আত্মা অবিনাশী, নিত্য, অক্ষয়, শাশ্বত, আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, আত্মাও কাহাকেও বিনাশ করেন না, মৃত্যু কেবল কাল্পনিক নাম। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাপ্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে নব নব দেহ আশ্রয় করেন। এই ধ্রুব জ্ঞানের যাঁহারা অধিকারী, দেহান্তে তাদৃশ মহাপুরুষেরাই মোক্ষলাভ করেন। হে অর্জ্জুন! যুদ্ধে তুমি যাহা-দিগকে নিহত দেখিবে, তুমি তাহাদিগের বধের হেতু হইবে না; কেন না, তাঁহাদিগের জীবাত্মা জীবিত থাকিবে, জীবাত্মা কাহারও বদ্ধ নহেন দেহ নিধনে জীবাত্মা নিধনের পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। মায়া ও শোক পরিহার পূর্ব্বক তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; দেহের সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ উপরে যাহা আমি বলিলাম, সেই জ্ঞানে বিশ্বাস রাখিয়া চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন কর। ভূত সকল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, বিনষ্ট হইবার পরেও অব্যক্ত হয়, কেবল জন্ম মরণের ব্যবধান সময়টিতে ভূতের প্রকাশ; অতএব কাহারও নিমিত্ত শোক করিতে নাই, তুমি কাপুরুষের ন্যায় বৃথা শোক করিও না। ধর্ম্ম যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; তুমি ধর্ম্মযুদ্ধে বিমুখ হইও না, উৎসাহের **অর্জ্জুন।**

সহিত প্রবৃত্ত হও। যে সকল ক্ষত্রিয় ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহাদের স্বর্গে বাস হয়। তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, স্বর্গবাসী হইয়া পরম সুখভোগ করিবে। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া বৃথা মায়াবশে পাপভাগী হইও না. যুদ্ধে বিমুখ হইলে লোকে চিরদিন তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে, সমর্থ পুরুষের অকীর্ত্তি অপেক্ষা মরণ মঙ্গল। হে ধনঞ্জয়! তুমি স্বর্গ রোধক নরক জনক অকীর্ত্তিকর কল্পনা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন কর।

অর্জ্জুন। হে নারায়ণ! আত্মতত্ত্বের কথা উত্থাপন করিয়া যে উপদেশ তুমি প্রদান করিলে, তাহাতেও আমার সম্পূর্ণ মোহ দূর হইতেছে না; মোহবশে গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধ পাপের আশঙ্কা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, মায়া যেন পুরবর্ত্তিনী হইয়া ভাবী শোকের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। মায়ার এ মায়াচ্ছেদন করিবার শক্তি আমি কোথায় পাইব?

কৃষ্ণ। হে পার্থ! মায়াচ্ছেদনের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র কর্ম্মযোগ। তুমি কর্ম্মযোগ-বিষয়িনী বুদ্ধির তত্ত্ব অবগত হও। কর্ম্মযোগে মানুষের সদ্গতিলাভ হয়, কর্ম্মযোগে বুদ্ধি সংশয়রহিত হইয়া একমাত্র পরমেশ্বরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকপন্থী মনীষী পুরুষ, তাঁহারা কর্ম্মযোগের সমস্ত লক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন, বিবেকবিমূঢ় অজ্ঞান লোকেরা ভোগবাসনার অনুকূল সহস্র সহস্র ফলপ্রদ বৈদিক বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, নিয়তই স্বর্গবাসের কামনা করে, স্বর্গই তাহাদের স্বর্ব্বসুখপ্রদ পরম পুরুষার্থ, ফলভোগের বাসনাতেই তাহারা কাম্যকর্ম্মে অনুরক্ত, ফলে তাহাদের সিদ্ধিলাভ হয় না। কামনাবর্জ্জিত কর্ম্মযোগেই ঈশ্বর লাভ হয়। নিষ্কাম হইয়া বুদ্ধিকে সংশয় রহিত করিয়া, একমাত্র পরমেশ্বরে মতি রাখিয়া সংসারে কর্ম্ম করাই জ্ঞানবানগণের কর্ত্তব্য, তুমি কর্ম্মী হও, একাগ্র-চিত্তে অসংশয় বুদ্ধিতে তুমি কর্ম্ম কর, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে। মনীষীগণ সমাধিতে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি সমাধিযোগের অধিকারী হও।

অর্জ্জুন। হে কেশব! কর্ম্মযোগের লক্ষণ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারিলাম না। বুঝাইয়া দাও—সমাধিস্থ স্থিরপ্রজ্ঞ সাধুর

লক্ষণ কি? তাঁহার বাক্য, তাঁহার অবস্থান ও তাঁহার গতি কি প্রকার?

কৃষ্ণ। হে ভারত! যাহার মন সকল প্রকার কামনা শূন্য তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ, যিনি দুঃখে অবসন্ন হন না, যিনি সুখের স্পৃহা রাখেন না—তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ, যাঁহার আত্মা কেবল আত্মাতেই পরিতুষ্ট, যিনি ভয় অনুরাগ ও ক্রোধ পরিশূন্য, যিনি সংসারে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহবর্জ্জিত, মমতা বর্জ্জিত, যিনি অনুকূল বিষয়ে হর্ষ প্রকাশ করেন না, প্রতিকূল বিষয়ে বিষণ্ণ হন না! তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ জ্ঞানের প্রকৃষ্টতাই প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞা যাঁহার নিশ্চলা, তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ। কূর্ম্ম যেমন ইচ্ছা হইলেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিতে পারে, স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ। যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হয় নাই, তাঁহার চিত্তে বিষয় ভোগের বাসনা সর্ব্বক্ষণ জাগরণ করে, ইন্দ্রিয়গণকে তিনি সেই দিকেই নিয়োজিত করেন, বিষয় লাভেই বিষয় ভোগেই তাঁহার প্রবৃত্তি হয়। যিনি স্থিরপ্রজ্ঞ, বিষয়ে তাঁহার অভিলাষ থাকে না, বিষয় তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না, একমাত্র পরমেশ্বরেই তাঁহার চিত্ত সংলিপ্ত হইয়া থাকে। লোভে ক্ষোভে উত্তেজনাকারী ইন্দ্রিয়গণ ধৈর্য্যশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, যোগীগণ সেই আশঙ্কায় তাদৃশ ইন্দ্রিয়গণকে যত্নে সংযমন করিয়া নির্ম্মলচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করেন, রিপু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করে না, রিপু দমনে ও ইন্দ্রিয় দমনে ঐরূপে যিনি সমর্থ, তিনিই স্থিরপ্রজ্ঞ। বিষয়চিন্তা হইতেই আসক্তি, অভিলাষ, ক্রোধ ও বুদ্ধিনাশ হয়. বুদ্ধিনাশ হইলেই বিনাশ। অজিতেন্দ্রিয় লোকেরা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিবিধ কু-কার্য্যে রত হয়; তাহাদের চিত্ত ভীষণ বাত্যা তাড়িত সমুদ্রে ঘূর্ণয়মান তরণীর ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা কদাচ সেই প্রকার বিপদে পতিত হন না, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া তাঁহারা একান্ত বশীভূত করিয়া রাখেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহারা পরমেশ্বরের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখেন, তাদৃশ ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষেরাই স্থিরপ্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম অজ্ঞান লোকেরা ব্রহ্মনিষ্ঠাযোগে অভিভূত হইয়া

নিদ্রা যায়, যোগী পুরুষেরা জাগিয়া থাকেন, বিষয়ী লোকেরা দিবা ভাগে বিষয় চিন্তায় জাগরণ করে. সেই দিবাভাগই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী-গণের রাত্রি, যোগীর নিদ্রা নাই, দিবারাত্রি ঈশ্বর চিন্তায় জাগরণ। হে পার্থ! যাঁহারা ভোগের কামনা করেন না সমুদ্রগামিনী নদী-সমূহের ন্যায় ভোগ্য বস্তু সমূহ সেইরূপে তাঁহাদের সম্মুখে সততই আসিয়া উপস্থিত হয়; সেই ভোগকে পরমার্থ ভোগ বলা হয়। কামনা, অনুরাগ স্পৃহা, অহঙ্কার ও ক্রোধাদি বর্জ্জিত হইয়া যাঁহারা ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন, তাঁহাদের মোক্ষলাভ হয়, একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষ চরমে পরমব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন! তোমার কোন্ কথাটি অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মানিব? তুমি বলিতেছ, কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; তাহা যদি সত্য হয়, তবে কেন তুমি আমাকে এই রণক্ষেত্রে মারাত্মক ভীষণ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছ? তুমি একবার বলিতেছ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, একবার বলিতেছ—জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যে কোন্‌টি নিশ্চয়, তাহা আমি কি প্রকারে বুঝিব?

কৃষ্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিষ্ঠা দুই প্রকার, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানযোগে অধিকারী হওয়া যায় না। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের জ্ঞানের উদয় হয়; যাঁহারা কামনা পরিত্যাগের ছল করিয়া মনে মনে বিষয়ভোগের কামনা করে, তাহারা কপটাচারী মহাপাপী; তাহাদের জ্ঞানসঞ্চার বহুদিন-সাপেক্ষ। নিষ্ঠ যোগীগণের ইষ্টসিদ্ধি অচিরেই হয়। কর্ম্মযোগ অবশ্য অবলম্বনীয়, কর্ম্ম ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ হয় না! মনুষ্য কখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না; ফলতঃ সৎকার্য্যে সৎগতি, অসৎ কার্য্যে অধোগতি। কামনাবর্জ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্মযোগই প্রকৃত কর্ম্মযোগ। সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক নিয়ম তাহাকে কর্ম্মে আকর্ষণ করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে; ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে মুক্তি লাভের হেতু। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের প্রীতিসাধন কর।

অর্জ্জুন। যে ব্যক্তি আসক্তিশূন্য হইয়া একমাত্র পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করে, তাহার আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি ?

কৃষ্ণ। আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তিনিই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন ; কর্ম্ম করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাহার পাপ হয় না ; কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি জনকাদি মনীষী সাধু পুরুষেরা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেখ, আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমার কোন কামনা নাই, আমার কিছুই অভাব নাই, কর্ম্ম করিবারও প্রয়োজন নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করি। আমি কর্ম্মত্যাগ করিলে জগতের যাবতীয় লোক কর্ম্মত্যাগী হইয়া উৎসন্ন যাইবে, আমাকে কর্ম্মশীল দেখিলে অজ্ঞান মূর্খলোকেরাও আমার অনুবর্ত্তী হইবে. তন্নিমিত্তই আমি লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। সংসারে শ্রেষ্ঠ লোকেরা যাহা করেন, জ্ঞান না থাকিলেও ইতর লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। হে পার্থ! এই সকল মূল-তত্ত্ব অবগত হইয়া তুমি নিষ্কাম কর্ম্মে অনুরক্ত হও, কর্ম্মানুষ্ঠানে তুমিও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, জগতবাসী-গণেরও মঙ্গল লাভ হইবে। কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, আমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের অভিমতানুসারে কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানযোগ হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক আসক্তি. মমতা ও শোক পরিত্যাগ করিয়া তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিও না। পূর্ণাঙ্গ পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেয়স্কর, পরধর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর, স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেষ্ঠ কল্প। হে ধনঞ্জয়! পরমেশ্বরে একান্ত মতি রাখিয়া তুমি স্বধর্ম্ম পালন কর।

অর্জ্জুন। হে হৃষিকেশ! আর একটি বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। পাপে প্রবৃত্তি না থাকিলেও কে বলপূর্ব্বক মানবকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করে ?

কৃষ্ণ। কাম রিপু ক্রোধের উৎপাদক, রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত, কাম রিপুর আশা অতিশয় উগ্র, সহজে তাহার পূরণ হয় না, উহা মুক্তি পথের চির-বৈরী। ধূম দ্বারা অনল, মল দ্বারা দর্পণ ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, মুক্তির চির-বৈরী অনলস্বরূপ কামনাও সেইরূপে

জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই কামনার উৎপত্তি ও আশ্রয় স্থান, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ইহারা দেহীগণকে বিমোহিত করিয়া রাখে ; অতএব তুমি অগ্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশী ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া পাপরূপিণী কামনাকে বিনাশ কর, দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সংসার-রহিত-বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ. তিনিই আত্মা। হে অর্জ্জুন! আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া তুমি সংসার রহিত বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া সেই ভয়ঙ্কর বৈরী কামকে বিনাশ কর! হে ধনঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি আদিত্যকে এই অব্যয় যোগবৃত্তান্ত কহিয়াছিলাম, আদিত্য তৎপরে মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে তাহা বলিয়াছিলেন. অতঃপর নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পরম্পরানুক্রমে তাহা অবগত হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছিল, অদ্য আমি তোমার নিকটে সেই অব্যয়যোগ পরিব্যক্ত করিলাম। তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তন্নিমিত্তই তোমাকে আমি যোগ রহস্য বলিলাম।

অর্জ্জুন। হে বাসুদেব ! তোমার জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে আদিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তবে তুমি কি প্রকারে সর্ব্বাগ্রে আদিত্যকে এই যোগ বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে ?

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন ! তোমার এই সংশয় ভ্রান্তিমূলক। আমি জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত, আমি অবিনশ্বর, আত্মাতেই আমি স্বভাব (স্বকীয় মায়া) প্রভাবেই পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। অনেকবার আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকর্ম্মবৃত্তান্ত কিছুই তোমার স্মরণ নাই, কিন্তু আমি সমস্তই অবগত আছি। যে যে সময়ে পৃথিবীতে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটে, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি আত্মাকে মানবরূপে সৃষ্টি করি সাধুগণের পরিত্রাণার্থ, দুষ্ক্রিয়ান্বিত অসাধুগণের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ যুগে যুগে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। যিনি আমার এই অলৌকিক লীলা যথার্থ অবগত আছেন, দেহান্তে তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যাঁহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করেন, সেইরূপেই আমি তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করি। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি

চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি, তথাচ আমাকে কর্ত্তা মনে করিও না। কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই, যিনি আমার এইরূপ নির্লিপ্তভাব অবগত আছেন, তাঁহাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এইরূপে অবগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তুমিও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান কর। কর্ম্মের গতি অতি দুরবগাহ। বিহিতকর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মত্যাগ, এই ত্রিবিধ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও যিনি আপনাকে কর্ম্মশূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও যিনি আপনাকে কর্ম্মযুক্ত মনে করেন, সংসারে তিনিই প্রকৃতযোগী। বিবিধ যজ্ঞ হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি, যাজ্ঞিকেরা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ হন, অতএব তুমি স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিয়া নিষ্পাপ হও। হে কৌন্তেয়! তুমি জ্ঞানের সেবা কর। জ্ঞানের অধিকারী হইলে আত্মাতে ও সর্ব্বভূতে অভিন্ন দর্শন করিবে, আত্মাতে ও পরমাত্মাতে অভেদ ভাব দেখিবে। জ্ঞানের তুল্য সংশয়চ্ছেদনের তীক্ষ্ণাস্ত্র কিছুই নাই, জ্ঞানযোগে শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া অটলরূপে উত্থান কর।

অর্জ্জুন। হে ভগবন! কর্ম্ম ও সন্ন্যাস - এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর তাহাই তুমি বিশেষ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দাও।

কৃষ্ণ। কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয়েই একত্র বদ্ধ। সন্ন্যাসের সঙ্গেও কর্ম্মের সংযোগ, সেই সংযোগকে সমাধি বলে। কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী পৃথক্ মনে করা উচিত নহে। সংসারে যিনি সমদর্শী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কুক্কুর লোষ্ট্র তৃণ রত্ন এই সমস্তে যাহার সমজ্ঞান যোগী ও আসক্তি শূন্য কর্ম্মযোগী তাঁহারই পন্থার অনুসরণ করে। আমিই সর্ব্বভূতের আধার ও আধেয়। আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, অকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত। এই প্রকৃতি অপরা। স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। আমিই সৃষ্টির নিদান, আমিই প্রলয়কর্ত্তা, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় সংহারকর্ত্তা আর কেহই নাই। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত, এই বিশ্ব সংসার সেইরূপে আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। সলিলে আমি রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে, বেদে ওঁকার রূপে,

আকাশে শব্দ রূপে, মানবে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বীগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বলবানের বল, তেজস্বীর তেজ এবং সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমা হইতেই উৎপন্ন, কিন্তু আমি কদাচ তৎসমূহের বশীভূত নহি। জগতের সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না। হে পার্থ! অলৌকিক শক্তি রূপিণী আমার এক মায়া আছে, সেই মায়া-সমুদ্র পার হওয়া অতি দুরূহ; যাঁহারা সেই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। সংসারে আমার চারি প্রকার উপাসক বিদ্যমান—আর্ত্ত, অর্থাভিলাষী, আত্মজ্ঞানাভিলাষী ও জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী পুরুষেরাই আমার অধিকতর প্রিয়, আমিও তাঁহাদের উপাসনার প্রিয়। তদ্ব্যতীত অপর তিন শ্রেণীর উপাসকেরা অজ্ঞান মোহবশে আমার স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই সকল দেবার্চ্চনার শ্রদ্ধা প্রদান করি, তাহারা সেই শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করিলে ফলভোগী হয়, ক্রমে দেব লভ্য ফলভোগ ক্ষয় হইয়া যায়। দেববাদী উপাসকেরা স্ব স্ব উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রকৃত জ্ঞানবান যোগীগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের স্বরূপ অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। চারি প্রকার উপাসকই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জ্ঞানবানের কর্ম্ম নিষ্কাম, অজ্ঞানের কর্ম্ম সকাম। কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহারা স্থিরপ্রজ্ঞ হইতে পারেন, তাঁহারাই সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারাই মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

(ক্রমশঃ)

কেনারাম—বাবুরাম—বেচারাম।

লেখক - রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি। আমাদের দেশের অনেক ক্ষেত্রেই যে ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, আমি অনুপ্রাসের সহায়ে তাহারই একটু পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমি যাঁহাদের কথা বলিতেছি, তাঁহারা তিন পুরুষে বিভক্ত,—প্রথম পুরুষ কেনারাম ; দ্বিতীয় পুরুষ বাবুরাম ; তৃতীয় পুরুষ বেচারাম।

আমি বাল্যকালে এই কেনারাম-শ্রেণীর একজনকে জানিতাম। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করিলাম, তখন এই কেনারামের পুত্রদ্বয় বাবুরাম হইয়াছিলেন ; আর এখন এই শেষ বয়সে দেখিতেছি, বাবুরামদের ছেলেরা বেচারাম হইয়াছেন।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। আমি যে কেনারামের কথা বলিলাম, তিনি পূর্ব্বে অতি দরিদ্র অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। সে সময়ের বুড়াদের মুখে শুনিয়াছি যে, কেনারাম হাঁটুর উপর কাপড় পরিয়া মুড়কি বাতাসার বোঝা লইয়া হাটে হাটে বাড়ীতে-বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন এবং তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ হইত, নিতান্ত কৃপণের ন্যায় তাহা সঞ্চিত করিতেন ; পাছে অধিক ব্যয় হয় বলিয়া দুইবেলা অন্নগ্রহণ করিতেন না—একবেলা উপবাসী থাকিতেন। অবশ্য কেনারামের এ অবস্থা আমরা দেখি নাই। আমরা যখন বালক, তখন কেনারাম সরকার দোকান খুলিয়া বসিয়াছে ; দোকানের কাজ বেশ চলিতেছে, কেনারামের সঞ্চয়ও তখন শুনিতাম, কয়েক হাজার টাকায় উঠিয়াছে। আমাদের সম্মুখেই কেনারাম গুড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল। কেনারাম তখন জমি জমা কিনিতে লাগিল, তিন চারিখানি লাভের তালুকও কিনিল। কিন্তু তাহার চাল বদ্‌লাইল না—সেই হাটুর উপর মলিন বস্ত্র, সেই নগ্নপদ, সেই সামান্য আহার—বোধ হয় তখন দু'বেলাই আহার করিত। অর্থ উপার্জ্জন, সঞ্চয়, বিষয় বৃদ্ধিতেই কেনারাম তন্ময়, ভোগ বিলাসের দিকে তাহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার

অবসরই বা কোথায়—আর সে ইচ্ছাও তাহার হয় নাই,—সে তখন সুধু কিনিতেছে। তাই তাহার নামকরণ করিলাম, কেনারাম, কারণ সে কিনিয়াছে, সে কিনিতেই আসিয়াছিল, সে সঞ্চয় করিতেই আসিয়াছিল, ব্যয় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এমনই করিয়াই আমাদের দেশের কেনারামের দল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অতুল বিভব রাখিয়া, চিত্রগুপ্তের নিকট হিসাব দাখিল করিবার জন্য চলিয়া যায়—কিছুই জীবনে ভোগ করে না—কিছুই সঙ্গে লইয়া যাওয়ার পথ নাই। এঁরাই হইতেছেন, এদেশের কেনারাম-শ্রেণী।

এই কেনারামের পুত্রগণের নাম দিলাম—বাবুরাম। কারণ তাঁরা যখন উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন দেখিলেন, ঘরে অনেক অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে, কারবারে বহু টাকা খাটিতেছে, তালুক হইতে যথেষ্ট আমদানী হইতেছে। তখন কি আর তাঁহারা আড়তের গদিতে যাইয়া বসিতে পারেন, তখন কি তাঁহারা টাকা পয়সার হিসাব করিতে পারেন? তখন তাঁহারা ম্যানেজার, কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, পিতা কেনারামের আমলে যে বাড়ীতে সামান্য গৃহ ছিল, সেখানে দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে থাকে, বৈঠকখানা হয়, দাসদাসী নিযুক্ত হয়—কেনারামের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ পুত্রেরা দুই হাতে উড়াইতে থাকেন, আয় বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—শুধু ব্যয়! বিলাস-ব্যসনে হাজারে হাজারে টাকা উড়িতে থাকে—কারণ তাঁহারা ত কেনারাম নহেন—তাঁহারা কিনিতে আসেন নাই! কেনারামেরা অনাহারে অর্দ্ধাহারে যে বিষয়, যে অর্থ সঞ্চিত করিয়া গিয়াছিলেন, পুত্রদের হাতে পড়িয়া তাহাই উড়িতে লাগিল—তাঁহারা বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন। তাই এই শ্রেণীর কেনারামদের পুত্রগণের নাম দিলাম বাবুরাম।

ঢালিতে আরম্ভ করিলে কলসীর জল কতদিন থাকে? বাবুরামদের ভবলীলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কারবার মন্দা পড়িল, দেনা পর্ব্বতপ্রমাণ হইল, তালুক বন্ধক পড়িল। লক্ষ্মী উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাপু সকল! হয় আমাকে ছাড়, আর না হয়, নবাবী চাল ছাড়।" বাবুরামেরা বলিলেন, "মা লক্ষ্মী। তোমাকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু চাল ছাড়িতে পারিব না, মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন করিতে পারিব না।"

লক্ষ্মী তখন বিমুখ হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। বাবুরামদের তখনও চৈতন্যোদয় হইল না—তাঁহারা চাল বজায় রাখিলেন। মর্টগেজের উপর মর্টগেজ পড়িতে লাগিল। অবস্থা-গোপন করিবার জন্য বাবুরামেরা তখন বাহিরের আড়ম্বর আরও

বাড়াইয়া ফেলিলেন। তাহার পর একদিন বাবুরামের বাবুগিরির অবসান হইল—বাঁশের দোলায় অথবা খাটে চড়িয়া বাবুরাম পরপারে চলিয়া গেলেন।

তাহার পরই আসিলেন বাবুরামদের পুত্রগণ। তাঁহারা তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কারবার রক্ষা হওয়া অসম্ভব। ঋণের সুদ আসল অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছে, বিষয়-আসয় আর রাখা যায় না। তাঁরা তখন যা কিছু আছে সমস্ত বেচিতে বাধ্য হইলেন। তাই তাঁদের নাম দিয়াছি বেচারাম। দেখিতে দেখিতে বেচারামেরা সমস্ত বেচিয়া ফেলিলেন। কোঠা বালাখানা কোথায় চলিয়া গেল, বেচারামেরা তখন পথের ভিখারী হইলেন।

কেনারাম, বাবুরাম আর বেচারামদের খেলা প্রতিনিয়তই চলিতেছে, অথচ এসব দেখিয়া কাহারও চৈতন্য হয় না—কেনারামের ছেলেরা অতি কমই কেনারাম হন, প্রায় অনেকেই বাবুরাম হন। তার ফলে বাবুরামের ছেলেরা একেবারে বেচারাম হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ত তখন উপায়ান্তর নাই—বেচারীরা বাধ্য হইয়াই বেচারাম হন।

এই তিন রামের মধ্যে বাবুরামেরাই অপরাধী, কারণ কেনারামেরা সঞ্চয় করিয়া অপরাধ করেন নাই, কার না ইচ্ছা করে যে পুত্র-পৌত্রাদির জন্য কিছু ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বাবুরামদের দল সে কথা মোটেই ভাবেন না, তাঁরা তাদের পুত্রগণকে একেবারে পথের ফকির করিয়া যান। বেচারামেরা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সর্ব্বস্ব বেচিয়া পিতৃ-পিতামহের আবাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তবুও কেহ ভাবিয়া দেখেন না।

নববর্ষ।

লেখক—শ্রীযুক্ত বনমালী পেঠ।

এস এস নববর্ষ এস ধরা'পরে।
বঙ্গবাসী অর্ঘদান করে সমাদরে।
বৈশাখের ফুলসাজ পরি এস ধরামাঝ
নবীন বরষ রাজ লয়ে সুকল্যাণে,
বঙ্গবাসী হাসিমুখে তোমারে আহ্বানে।

এস এস নববর্ষ অরুণ আলোকে।
সু-প্রভাতে শুভদিনে বিপুল পুলকে।
খুলি বঙ্গ নবখাতা লিখিবে তোমার কথা,
ব্যবসায়ে বান্ধবতা প্রীতির ভোজনে।
পুণ্য দিনে পুণ্য কর্ম্মে সুখী দাতা দানে!
এস এস নববর্ষ সহচর সনে!
প্রজাপুঞ্জ সুখী হ'ক, তোমার বিধানে।
অনুরোধ কর হেন ক্ষান্ত হন রবি যেন
জ্বালাময় অতি তীব্র কর বরষণে?
শুধাংশুর অংশু যেন শান্তি ঢালে প্রাণে।
বলে দিও ঋতুগণে বিশেষ বিধানে
ধরারে সাজায় যেন পরম যতনে.
গ্রীষ্ম যেন সুধা মেখে রসাল, পনসে রাখে,
মনোহর আনারসে সুধারস উঠে.
দেখ যেন অভিমানে ফুটী নাহি ফাটে।
বরষায় বলে দিও, নব জলধর—
ক্ষীর সম নীর যেন ঢালে ধরাপর,
যেন সুবর্ষণ ফলে কৃষকে আনন্দ মিলে
ভীষণ অশনি যেন করেনা গর্জ্জন,
নীরদ নিরখি শিখী করিবে নর্ত্তন।
চাতকে "কটিক জল" শরত যোগাবে,
মরাল মৃণাল-মধু সরোবরে পাবে।
তরঙ্গিণী প্রেমরঙ্গে মিলিবে সাগর সঙ্গে,
কুমুদিনী প্রমোদিনী শরদিন্দু হেরি
চকোর পাইবে সুখ সুধাপান করি।
হেমন্ত শ্রীমন্ত হবে প্রভাবে তোমার,
শস্যশীর্ষে পুষ্প শোভা আনন্দ আগার।
খর্জ্জুর ইক্ষুর রস ঘোষিবে তোমার যশ,
দেখ যেন পাকা ধানে পড়ে নাক মই,
গর্জ্জনে পবনে কথো অনুরোধ এই।

শান্ত শীতে বলে দিও মধুর বচনে—
কার্য্যকর দীর্ঘ দিবা শীঘ্র ডেকে আনে,
বাল বৃদ্ধ প্রাচীনারে শীত যেন নাহি জারে,
বলে দিও বৈশ্বানরে দিতে মৃদু তাপ,
বিবরে আবদ্ধ করে রেখো কালসাপ।
তোমার বসন্তে কোরো অতি সুখকর,
তরুলতা নব সাজে শোভিবে সুন্দর।
পল্লবে মুকুলে ফুলে সৌরভ সম্পদে দুলে
আমোদিবে দশ দিক অবনী অম্বর,
বেনু বীণা বিনিন্দিত ভ্রমরঝঙ্কার।
সহকার আলিঙ্গনে দুলিবে মাধবী,
তমালে কনকলতা মধুময় সবই।
এক কথা আমি বলি, ঋতুরাজে দিও বলি
মলয়ে কোকিলে যেন করেন বারণ,
বিরহ-ব্যথিত পাশে করিতে গমন।
বসন্তে বিদায় দিয়া তুমি যাবে চলে,
জন্মভূমি ভাসে যেন শান্তির হিল্লোলে।
সুকীর্ত্তি জগতে তব ঘোষিবে প্রচুর
পার যদি করে দিও ম্যালেরিয়া দূর।
পুত্রার্থীরে দিও পুত্র, অ-ধনীরে ধন-সূত্র,
রোগীকে আরোগ্য দিও, অসুখীরে সুখী,
হউক তোমার জয় যেও যশ রাখি।

কলহ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল।

কলহের কারণ কি? মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ অনেক সময়ই হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি?

সাধারণতঃ কলহে উভয় পক্ষেরই দোষ।

"In most quarrels there is a fault on both sides. A quarrel maybe compared to a spark which cannotbe produeed without a flint as well as steel. Bolton.

কলহ দুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। বাক্যে অথবা কার্য্যে।

সাধারণতঃ বাক্যে যে কলহসৃষ্টি হয় তাহা মনের মানুষ না হইলেই বা বিসদৃশ চরিত্র বিশিষ্ট লোকের সংশ্রবেই হইয়া থাকে, এজন্যই কবিবর ৺ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"মনের মানুষ কোথা পাই?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই!
যাহা বলি কর তবে তাই।
বিপদ হয়েছে যারা বিপদের হেতু তারা
জগতে মানুষ কেহ নাই।
(হায়!) মনের মানুষ কোথা পাই?

বাক্য দ্বারা যে কলহসৃষ্টি হয়, তাহার সাধারণতঃ দৈবক্রমে বা হঠাৎ উদ্ভব হইয়া থাকে। কথায় কথায় তর্ক বিতর্কে ইহার সৃষ্টি, সুতরাং কলহ এড়াইবার জন্য প্রত্যেকেরই বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কথা বলা কর্ত্তব্য। যেখানে কলহের সম্ভাবনা সেখানে আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

এক পক্ষ তীব্র বাক্য ব্যবহার করিলে অপর পক্ষের নীরবতা বা নম্রতাই শ্রেয়ঃ, নতুবা কলহ সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাতে আত্মজয় আবশ্যক, স্বীয় হৃদয়বেগ প্রশমিত করিয়া রাখা দরকার, তাহা করিতে পারিলেই প্রতিপক্ষকে জয় করা হইল।

"If you can make it up with yourself, you can almost immediately make it up wifh your opponent," Sir H. Helps,

সংসারে নিরর্থক বাক্ বিতণ্ডার কলহই অধিক। সুতরাং তাহা সতত পরিহার করা প্রয়োজন এবং উপরোক্ত প্রণালীই তাহা পরিবর্জ্জনের প্রধান উপায়।

কার্য্য দ্বারাও অনেক কলহসৃষ্টি হয়। পরের অনিষ্ট চিন্তাই তাহার মূল যন্ত্র এবং স্বার্থ-পরতা তাহার চালক। যুদ্ধবিগ্রহ, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত। ত্যাগস্বীকার করিতে এবং নিঃস্বার্থ হইতে পারিলেই মানবসমাজে এই প্রকারের অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের দ্বারা কলহ অধিক সৃষ্টি হইতে পারে না।

মোটের উপর সর্ব্বপ্রকারের কলহই পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক। কলহের অভাবই শান্তি।

শেষ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

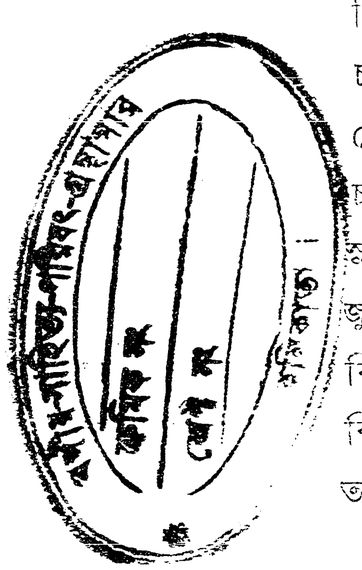

দিনান্তে মার্ত্তণ্ডদেব শ্রান্ততনু লয়ে,
চলিলেন অস্তাচলে, শ্রান্ত আঁখি তাঁর—
হেরি স্নেহে অঙ্কে ধরি অদিতি, নিলয়ে
চলি গেলা, ভ্রাতৃস্নেহ ভার
সুধাংশুর স্নিগ্ধ অংশু শীতল প্রলেপে
জুড়াইল শ্রান্ত তনু। মধুর আলাপে
ঝিঁ ঝিঁ পোকা আরম্ভিল মধুর সুতান।
বিহঙ্গ আনন্দে গায় কলকণ্ঠে গান॥
তরল আঁধারে,—
আদিত্যের শেষ রশ্মি
মিশাইল হায়!
যাত্রীরা তরণী বেয়ে শেষ খেয়া যায়॥
তরুণীর কাঁকনের মধুর নিক্কন
শেষ জল-তরঙ্গেতে হলো নিমগন,
পান্থ গেল পান্থ বাসে, শেষ চলা তার,
বিহঙ্গ দিবস শেষ করিল প্রচার॥

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৶০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৶০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ, [২য় সংখ্যা

১।	ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ	... ...	৪০৫
২।	পাণ্ডব নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৪১৯
৩।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee	শ্রীযুক্তকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	৪১৪
৪।	নিন্দা ও প্রশংসা	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	৪২১
৫।	ঘাত প্রতিঘাত	শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী	৪২৩
৬।	মাসিক পত্র	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র	৪২৭
৭।	ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ	... ...	৪২৯
৮।	ভাব ও ভাষা	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র বি, এ,	৪৩১
৯।	অভেদ মূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৩৫

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং খাগিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

5-7-27

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ } ১৩৩৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

প্রথম অঙ্ক।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষ।

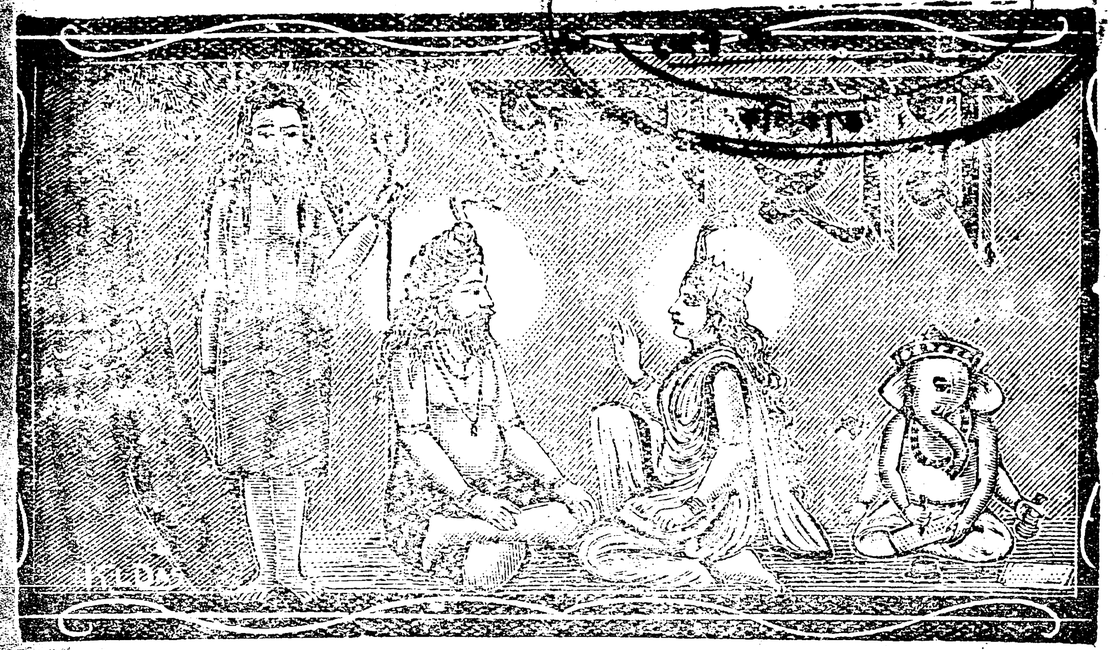

অর্জ্জুন। হে বাসুদেব! যাহা তুমি বলিলে, তাহার এক একটির প্রকৃত অর্থ পৃথক করিয়া বল নাই। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অধিযজ্ঞের অবস্থান কিরূপ তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে, অতএব তুমি এক একটি তত্ত্ব বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন কর।

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! যিনি এই জগতের মূল কারণ এবং শাশ্বত অক্ষয় পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশ জীবাত্মা; দেহ আশ্রয় করিয়া

জীবাত্মা ইহ-সংসারে কার্য্য করেন, ইহাই অধ্যাত্মভাব; যাহাতে ভূতের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, তাহাই যজ্ঞ, ভূতগণ বিনশ্বর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, এই কারণে উহা অধিভূত শব্দে প্রসিদ্ধ; সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বিরাট পুরুষ সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ, এই কারণে উহা অধিদৈব; আমি জীবদেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে অবস্থান করি, এই নিমিত্ত আমি অধিযজ্ঞ নামে খ্যাত। যিনি অন্তকালে সংশয়-রহিত বুদ্ধিতে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনিই আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন! মৃত্যুকালে যাহারা যে যে বস্তু স্মরণ করে দেহত্যাগের পর তাহারা সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যিনি চিন্ময়, অক্ষয়, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্ব্বলোকের বিধাতা, তিনিই পরমাত্মা; মৃত্যুকালে একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়। তিনি যোগীগণের পরমারাধ্য ও পরমগতি। হে পার্থ! তুমি অবিচলিতচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে; পরিণামে সেই সর্ব্বময় পরমেশ্বরের স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই পরমপুরুষের পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, সেই ঈশ্বরজ্ঞানের গুহ্যতত্ত্ব তুমি আমাকে বল।

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! সেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান যোগনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী জ্ঞানীগণেরও অজ্ঞাত। সেইজ্ঞান অতি পবিত্র, জ্ঞানযোগে তাহার আলোচনা করা সহজসাধ্য। অজ্ঞান লোকেরা আমার স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রমবশে আমাকে মনুষ্য, মীন, কূর্ম্ম ও বরাহ ইত্যাদি নামে পরিচয় দেয়, মূর্খেরা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে পারে না, তন্নিমিত্ত তাহারা এই ঘোর সংসার পারাবারে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্ত ও অব্যয় ভূতগণ আমাতেই অবস্থান করে, আমি কিছুতেই অবস্থান করি না। সমীরণ যেমন কেবল আকাশে অবস্থান করে, ভূতগণ সেইরূপ আমাতেই অবস্থান করে। প্রলয়কালে আমি সর্ব্বভূতকে লয় করি, অনন্তর আবার নূতন নূতন ভূত সৃজন করি। আমি কেবল নিমিত্তমাত্র, স্বয়ং আমি কোন কার্য্যে লিপ্ত হই না, প্রকৃতিরূপিণী মায়াই সৃষ্টি স্থিতি

প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী। মূর্খেরা আমাকে জানিতে পারে না, আমার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, যোগীপুরুষেরা আমাকে অবগত হইয়া চিদানন্দ উপভোগ করেন। আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি মন্ত্র, আমি ঔষধ, আমি অগ্নি, আমি আজ্য, আমি হোম। আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি পবিত্র ওঁকার ঋক্ সাম যজু, আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, শরণ, সুহৃদ, প্রভাব, প্রলয়, আধার ও অব্যয় বীজ; আমি তাপপ্রদান, বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করি; আমি অমৃত আমি মৃত্যু, আমি সৎ এবং আমি অসৎ। হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে এইরূপ অবগত হইয়া মোহ পরিত্যাগ কর, বৃথা অনুশোচনা পরিহার পূর্ব্বক পূর্ণ উৎসাহে উত্থিত হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন ধর্ম্মযুদ্ধে তৎপর হও।

অর্জ্জুন। হে দামোদর! তোমার বদন বিনির্গত পবিত্র বাক্যাবলী পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমার আশানুরূপ প্রীতিলাভ হইতেছে না, কি কি তোমার বিভূতি, কোন্ কোন্ পদার্থে তোমার দর্শনলাভ হয় কিরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে সর্ব্বদা আমি তোমায় দেখিতে পাই এক্ষণে তুমি আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান কর।

কৃষ্ণ। হে সখে! আমার বিভূতি অসংখ্য, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাতে আমি অবস্থান করিতেছি। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে আমি সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, গ্রহমণ্ডলের মধ্যে আমি চন্দ্র, বেদের মধ্যে আমি সাম, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, ভূতগণের দেহে আমি চৈতন্য, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে আমি সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে অমি বৃহস্পতি সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক, জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র, মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু বাক্যাবলীর মধ্যে আমি ওঁকার, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় তরুগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল, অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গের মধ্যে আমি ঐরাবত, নরগণের মধ্যে আমি রাজা,

আয়ুধগণের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, জীবের উৎপত্তি হেতু আমি কন্দর্প, বিষধর ভুজঙ্গের মধ্যে আমি বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মধ্যে আমি অনন্ত, জলেশ্বরের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়মীগণের মধ্যে আমি যম, দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণকগণের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ, বিহঙ্গের মধ্যে আমি গরুড়, বেগবানের মধ্যে আমি পবন, অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, জলচরগণের মধ্যে আমি মকর. নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, পার্থিব পদার্থসমূহের আদি অন্ত ও মধ্য আমি, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা, বাদীগণের মধ্যে আমি বাদ, অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, অনন্তকাল আমি সর্ব্বময় বিধাতা, অভ্যুদয়লাভের যোগ্য জীবগণের মঙ্গলস্বরূপ আমি, নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত, প্রতারকদিগের মধ্যে আমি দ্যূত, তেজস্বীগণের মধ্যে আমি তেজ, যদুবংশীয়গণের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য। আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীগণের মধ্যে আমি সুনীতি, গোপ্য বিষয়দিগের মধ্যে আমি মৌনভাব, আমি জ্ঞানবানদিগের জ্ঞান এবং সর্ব্বভূতের বীজ। হে অর্জ্জুন! এই চরাচর ভূতসমূহ আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ জগতের যে যে পদার্থ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাবসম্পন্ন, তৎসমস্তই আমার প্রভাবের অংশ। আমার অনন্ত বিভূতি, আমি একাংশে জগৎসংসারে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং আমার সমস্ত বিভূতির পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ এস্থলে অনাবশ্যক।

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বময়! আত্মা, দেহ ও ভূত সমূহের বিষয় তুমি যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম তুমি আমাকে যেরূপে বুঝাইলে, তাহাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল। এক্ষণে আমার আর একটি উচ্চ অভিলাষ হইতেছে, তুমি যদি আমাকে তোমার রূপ জানিবার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া থাক, তবে

কৃপা করিয়া তোমার সেই অব্যক্ত অব্যয় রূপ আমাকে প্রদর্শন কর।

কৃষ্ণ। হে পার্থ! পার্থিব মানবগণ যে চক্ষু দ্বারা জগতের ভৌতিক পদার্থ নিরীক্ষণ করে, সেই চক্ষু দ্বারা তুমি পরমাত্মার পরম জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমি তোমাকে যোগবলে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, সেই যোগজ্যোতিতে তুমি আমার যোগময় রূপ সন্দর্শন কর। আদিত্য, বসু, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তোমার জ্ঞান চক্ষুর গোচর হইবে।

সঞ্জয়ের মুখে এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া মহাবিস্ময়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! যোগবলে অর্জ্জুনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মদেহে কি প্রকার বিরাট রূপ প্রদর্শন করিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

সঞ্জয়! হে মহারাজ! মহাযোগী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কলেবরে বহু বদন, বহু নয়ন ও বহু হস্ত প্রদর্শন করিয়া দিব্যলাবণ্যযুক্ত দিব্যালঙ্কারভূষিত দিব্যায়ুধধারী দিব্যমাল্যাম্বরশোভিত চন্দনচর্চ্চিত বিরাট বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। সে অপূর্ব্ব রূপজ্যোতির তুলনায় সহস্র সূর্য্যের সংমিলিত জ্যোতিও পরাভূত হয়। কুন্তিনন্দন অর্জ্জুন সেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ দর্শনে বিমুগ্ধচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপে তাঁহার স্তব করিলেনঃ "হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমার বহু বাহু, বহু বক্ত্র ও বহুনেত্রযুক্ত অনন্তমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। হে অনন্তদেব! আমি তোমার শরীরে পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মা, সমস্ত দেবতা, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, রক্ষ, যক্ষ, উরগ প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছি কিন্তু আদি অন্ত ও মধ্য নিরূপণে সমর্থ হইতেছি না; সুরগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ এবং গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাদি তোমার স্তব করিতেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ তোমার করালগ্রাসে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য আমি সন্দর্শন করিতেছি, তোমার তেজোময় দুর্নিরীক্ষ্য রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতেছি না; পতঙ্গেরা যেমন প্রদীপ্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, জগতের এই সমস্ত লোক সেইরূপে তোমার করাল আস্যরূপ জলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান

করিতেছে, তোমার সংহারমূর্ত্তি অবলোকনে পদে পদে আমার মোহ জন্মিতেছে, হে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর! সত্য তুমি কে, দয়া করিয়া সেই স্বরূপ পরিচয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর!”

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! আমি কে, সে তত্ত্ব জানিবার আকিঞ্চন এক্ষণে পরিহার কর। সম্প্রতি আমি এই করালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই সমস্ত লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ঐ সমস্ত বীরগণকে অগ্রেই আমিই বিনাশ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হইয়া উহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর, মোহ পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই তোমার জয়লাভ হইবে, অবশ্যই তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত রণবিজয়ী হইয়া রাজ্য সম্পদের ভোগসুখে অধিকারী হইতে পারিবে। অতএব হে বীরসত্তম! বৃথা আর বিলম্ব করিও না, পাপের আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য প্রদর্শন কর।

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডব নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—কক্ষ।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। নির্ব্বীর্য্য কি ক্ষত্রিয় সমাজ হ'ল আজ?
ক্ষত্রতেজ বীরদর্প বিলুপ্ত ভারতে?
পাণ্ডবের রাজসূয় পূর্ণ এতদিনে।
ইন্দ্রপ্রস্থ-সিংহাসনে পাণ্ডুনন্দনে

পার্থিবে পূজিল পায়! সে পুনঃ পূজিল
কৃষ্ণসখা—বাসুদেবে নারায়ণ বলি।
অবহেলি নৃপতিমণ্ডলে সভামাঝে
রাজপূজা স্থলে যোগ্য অগ্রঅর্ঘ্য দিল
গোপাল যাদবে! ক্ষত্রিয়ে কে কবে কোথা
সহিল এ অপমান? বিরোধী হইল
যদি চেদীপতি শিশুপাল তারে কৃষ্ণ
করিল সংহার; যতেক ভূপাল যেন
মেষপাল, নীরবে রহিল চেয়ে—পাণ্ডু-
গণ্ড পাণ্ডবের ভয়ে, অতঃপর এক-
কথা কেহ না কহিল। ধিক্ সর্ব্বে!
মহত্ত্ব ভুলিল ছি ছি হীনত্ব রহিল.
নতশিরে ধীরে হায় ধরিল সহিল
গর্ব্বিত পাণ্ডব-পদাঘাতে! সমস্বরে
ভারত গাইল যশ, গগন ভরিল—
“জয় জয় ধর্ম্মরাজ” রবে; মহোৎসবে
মত্ত ত্রিভুবন! আর দুর্য্যোধন—ধিক্!
দাণ্ডাইয়া দেখিনু ভাণ্ডারী দুর্য্যোধন।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ। সুপ্রভাত মহারাজ কৌরবপ্রধান!

দুর্য্যো। সুপ্রভাত! কি সংবাদ কহ মতিমান!

সহ। ধর্ম্মরাজ ইচ্ছা রাজা আর কয়দিন
বিশ্রাম হেথায় ভাবি আপনার পুরী।
তব তুষ্টি তরে সদা চিন্তা তাঁর; শ্রম
অপার ভাণ্ডার ভার করিতে বহন;
প্রীতি তাঁর আমোদে বঞ্চিতে তব মনে।
ভারত ভুবনে কহে অতুল এ সভা
মনোলোভা বিচিত্র নির্ম্মাণ গুণে; কিন্তু
তাঁর মনে নাহি ভাব তব মত বিনা।
করি আমন্ত্রণ আসি বিহর সভায়।

দুর্য্যো। ভাল, কহ তায় আজি বঞ্চিব সভায়
মাতুলের সনে, অন্যজনে হস্তিনায়
করিব প্রেরণ।

সহ। হে রাজন! শুধি পুনঃ; নাহি জানি যদি
থাকে বিশেষ নিয়ম কোন কহ আজ্ঞা-
মত হবে আয়োজন।

দুর্য্যো। কিবা আর? সবে সদা সন্তোষ আমার।

সহ। হই তবে বিদায় এখন হে রাজন!

(প্রস্থান)

দুর্য্যো। হেন ছল আত্মীয়তা কোন্ প্রয়োজন?
পাণ্ডুর নন্দন সহজে কৌরবশত্রু,
জ্ঞাতিশত্রু মিত্র হয় বিনাশ কারণ; দহে
ঈর্ষাদাহে, শত্রুতেজ আর নাহি সহে,
দুষ্ট তৃষা তুষ্ট নয় জলধি শুষিলে।
কনিষ্ঠ হইল জ্যেষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিষ্ঠ,
একচ্ছত্র সার্ব্বভৌম রাজা যুধিষ্ঠির
মেঘমুক্ত মিহির প্রতাপে আজি দিনে
উদিত ভারতাকাশে, ক্ষুদ্র গ্রহ হেন
ক্ষত্ররাজগণ বল ঢাকিল লাজে,
সেই তেজে সবে মিশাইল! কি হইল!
কৌরব-গৌরব-শশী ম্লান হীনভাতি!
ভানু পাশে শশাঙ্ক উদয় হয় শুধু
গৌরব কারণ সবিতার। সাক্ষ্য তা'র
কৃষ্ণ মন্ত্রে আমা না গণিল যোগ্য মানে।
ভ্রাতৃ-ভাগে দিল ধন-কোষ ভার! ওহো—
সেই সে কৌরব—ধিক্ মোর কুরুরাজ!—
পাণ্ডব-আশ্রয়ে আজি রাজ-চিহ্নধারী!
আত্মীয়তা আত্ম-তিরস্কার-সহিষ্ণুতা—
সহিষ্ণুতা হীনতা অপার, ওহো! ধরি—
ধিক্ কাপুরুষ ধিক্ ঘৃণার জীবন!

দীর্ঘসূত্রে ক্ষুদ্র শত্রু হইল প্রবল
অগ্নিকণা উথলিল দাবানলে আজি!
শমীবৃক্ষে দহে সে স্বকুলে কেনা জানে?
ছার প্রাণে ক্ষণে না সুস্থির গণি; ওহো!
কালফণী করিছে দংশন, কোথা শান্তি
শিয়রে শমন?

(শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। দুর্য্যোধন! কহ বাপু!
পাণ্ডবের রাজসভা দেখিলে কেমন?

দুর্য্যো। সহদেব মুখে সভা প্রবেশিতে আজি
এইমাত্র পাইনু আমন্ত্রণ। হে মাতুল!
ভাল, শুনি তোমার বর্ণন।

শকুনি। অতুলন!
অতুলন-শিল্প ময়দানব-রচন!
মানব নয়ন হেরেনি এ হেন ছবি!
বহুরূপী বিচিত্র গঠন, সংযোজন,
বিচিত্র কিরণ-জ্যোতি, বিচিত্র মিলন!
বিচিত্র বিশাল আয়োজন, ত্রিভুবন
পায় ঠাঁই। হয় নাই, হবে না কখন
হেন সভা, হেন রাজসূয়-সম্মিলন,
সত্য ভাগ্যবন্ত মানি পাণ্ডুর নন্দন।

দুর্য্যো। সত্য!
নহে কি দ্বাপরে রাজসূয় মহাযজ্ঞ
বিনা বিঘ্নে সমাধান হয় কভু
এ ভারতে? রণমত্ত ক্ষত্রিয় শোণিতে
আহুতি পাইত হুতাশন! হা মাতুল!
এ সভা-প্রাঙ্গণ বিকট শ্মশান হ'ত,
উচ্চ বেদধ্বনি হাহাকারে মিশাইত,
শিবা শ্যেন গৃধ্র আদি মাংসলোভীগণ

যজ্ঞীয় ব্রাহ্মণ করিত পারণ সুখে,
মেদ মাংস মজ্জা রক্ত স্বাদু ভক্ষ্য পানি !
ব্যাপিয়া ধরণী জ্বলিত সমরানল।
এই তব প্রবল পাণ্ডব কুন্তীভোজ
যাদব পাঞ্চালসনে সে আগুনে
পড়িত, পুড়িত তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ প্রায়।
হায় ! বিধি তায় শেষে কৈলা অন্যমত !
কুন্তীসুতে সত্য তেঁই মানি ভাগ্যবান।

শকুনি। দুর্য্যোধন ! সাবধান ! নহে ক্ষুদ্র অরি
বলীয়ান্ পাণ্ডুপুত্র ; কর অবসান
হিংসাবুদ্ধি বিদ্বেষ পাণ্ডবগণ প্রতি ;
কুনীতি আশ্রয়ে নিত্য ভয় ! দেখ ভাবি,
ক্ষত্ররাজ সবে এবে হস্তগত তার।
কৃষ্ণ—চক্ষু, মাদ্রী-পুত্র—যুগল চরণ,
সদাশয় বান্ধববৎসল যুধিষ্ঠির ;
জেনো স্থির, অমঙ্গল তাহারে হিংসিলে।
প্রত্যক্ষ দেখিলে বাপু কেমন কৌশলে
শ্রীকৃষ্ণ বধিল শিশুপালে ! কহ মোরে,
বলে কে আঁটিবে তায় ?

দুর্য্যো। হে মাতুল ! হেন বুদ্ধি পাণ্ডব-পূজায় !
স্বেচ্ছায় ত্যজিলে স্বাধীনতা, হীনতায়
কিবা ব্যথা তার ? তিরস্কার পুরস্কার,
দেহ নিজ কারাগার অসার জীবন-
ভার ঘৃণায় সে বহে, পলে পলে দহে,
ক্ষত্র হ'য়ে সহে যেই, অতি অভাজন।
হীনত্বে জনম—মহত্ত্ব দুর্ল্লভ তায় !
কিন্তু ক্ষম মোর, হয়ে কৌরব-ঈশ্বর
হস্তিনার একদণ্ডধর হেন দশা
মোর, অতঃপর তার অন্যে কি কহিব ?

শকুনি। সে কি তাত ! কুল প্রিয় প্রধান—পাণ্ডব।

সদা ব্যগ্র তব তুষ্টি তরে। আজি হেরি
ঘরে ঘরে সৌধশিরে গবাক্ষ প্রাচীরে
থরে থরে দীপালোকে, কুসুম স্তবক-হারে
সুসজ্জিত সভা পুর-প্রাঙ্গণ প্রাচীর।
যুধিষ্ঠির কভু নাহি অনাদরে তোমা।
বুঝহ অন্তরে বাপু ! ভাবিয়া আপনা
ধনকোষ সঁপিল তোমায় অন্য তাজি;
এ হ'তে সৌহৃদ্য উদারতা নাহি জানি।

দুর্য্যো। ধিক্ মানি ! হেন ভৃত্য পাইবে কোথায় ?
পাণ্ডব বান্ধব প্রিয় ! হেয় কুরুকুলে
আমা হতে ছিল কেবা ? শক্রপদসেবা
সম্পদ বলিয়া বলি, গণি ! এতদিনে
জানি মহামানী কৌরব পাণ্ডবাধীন,
রাহুগ্রাসে শশী ক্ষীণ দিন দিন, আজি
শ্রীহীন হস্তিনা, কাপুরুষ আমার পালনে !
মম প্রজাগণে অন্তরে অন্তরে গণে
তাহারে অধিক, ধিক্ ! হেরিছ নয়নে
ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতের এক রাজধানী।

শকুনি। দুর্য্যোধন ! শান্তি মনে স্থাপহ সম্প্রতি।
আছে পূর্ব্ব নীতি মাত্র আচার্য্যের বাণী,
বলাবল কাল স্থল বুঝি করি কার্য্য,
আছে তায় ফল ধার্য্য অন্যথা স্বতঃই ;
আত্মহানী বুদ্ধিবল উপায়বিহীন,
জড় উদ্যম-পৌরুষ, আপন সংহার
হেতু হয় ; মন্ত্রে নহে বলে শীঘ্র হয়
কার্য্যসিদ্ধি।
হের, অতুল সমৃদ্ধি বৃদ্ধি সাম্রাজ্যস্থাপন
কেমন কৌশলে পাণ্ডব করিল ! ছলে
নিল কর না দিল না আছে হেন জন।
বৃথানুশোচন ! রহ সুদিন চাহিয়া।

দুর্য্যো। হা মাতুল! দহে হিয়া, হয় সদা মনে—
বিনা রণে জিনিল পাণ্ডব মোরে আজি।
জৌ-গৃহ দাহন, পাণ্ডবের নির্ব্বাসন,
হস্তিনা-বঞ্চন, নিল শোধ এককালে।
কৌশলে সাধিল শিরশ্ছেদ কৌরবের!
এর চেয়ে মৃত্যু কিবা আর। উদার পাণ্ডব
বল যারে, দেখাইল ভাণ্ডারে সঞ্চিত
মহা সর্ব্ব রত্ন ধন; আজি আয়োজন
পুনঃ সম্পদ দেখাতে, বশীভূত বৈরী
জনে সম্মানে তুষিতে, দাসত্ব স্বর্ণ-
শৃঙ্খল পরাইতে, নাচাইতে করধৃত
পুত্তলিকা প্রায়, আছে যেই নীতি
যুধিষ্ঠির জানে ভাল।
শবদেহে অলঙ্কার বিচিত্র বসন
হেন কৌরবসম্মান আজি ইন্দ্রপ্রস্থ
পুরে। এতদিনে যবনিকা হইল পতন,
রাজনাট্য কৌরবের ফুরাল প্রভাতে—
বীর রঙ্গে এবে পশিল ভারতে দর্পে
পাণ্ডুর নন্দন—তেজে মধ্যাহ্ন তপন,
জগজ্জন চমকিত চায় তার পানে,
সেই দৃশ্য, দ্রষ্টব্য, অদৃষ্ট সবাকার।
ইচ্ছা তার অবশ্যকর্ত্তব্য অন্যজনে,—
ওহো! বাজে প্রাণে বাজের অধিক, ধিক্
দুর্য্যোধন নামে!

শকুনি। বাপু, হও স্থির—
শুন সাবধানে, এই রাজসূয় সমাপনে,
পশিবে কি আজি পাণ্ডব সহ বিবাদে?
কহ সাধে সাধে কেন বিষাদ কিনিবে?
পারিবে কি পরাজিতে তারে বাহুবলে?

দুর্য্যো। বটে! হীনবীর্য্য কেমনে জানিলে মোরে?

কৌরব মুকুটধারী অন্য রাজনামে
বহু ব্যবধান জেন:—

শকুনি। শুন দুর্য্যোধন! সুহৃদ্ ভেদ কর কেন?
ছাড়ি রাজা অন্য যেই ক্ষুদ্র সুত জন
দাসত্ব হীনত্ব বলি জানে; ভাল, শুনি
তব স্থানে—বিনা তব সহোদরগণ,
আমি, কর্ণ, আর অন্য কেবা হবে পক্ষ
তব কহ পাণ্ডব সহ অন্যায় বিবাদে হেন?
সর্ব্বজন চিরদিন পাণ্ডবে কৌরবে
দেখে সমভাবে, বহুমানে ধনে সবে
তুষিল যতনে, মনে মনে চিন্তিবে
পাণ্ডব হিত, জেন কদাচিৎ না হবে কৌরব
পক্ষ কেহ, মাত্র হবে বিফল পৌরুষ;
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপযশ, সুকৌশলে
ঢাকহ সৌহার্দ্দ আবরণে।
দেখ স্বর্গভ্রষ্ট একা দেব পুরন্দর
করি উপায় সম্বল, অচিরে নাশিয়া নমুচিরে
পাইল অমরাবতী রাজ্য! তেঁই কহি,
সম্প্রতি বিদ্বেষ ত্যজ পাণ্ডবের প্রতি,
সার নীতি যথাকালে কর দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। কূর্ম্মশুণ্ডবৎ নারি লুকাতে বদন—
ক্ষণে, হা মাতুল! পুড়ে পুট পাকে মন,
এই নরকাগ্নি কিসে করিব দমন
আবরণ ধরি মুখে? হায়! যথা যাব,
স্মৃতি যাবে সাথে সাথে, জ্বলন্ত অক্ষরে
জাগিয়া হৃদয়পটে! হীন আমি কভু
না ভুলিব, কপটতা দুর্ব্বলের বল।

শকুনি। বাপু!
কালোচিত কার্য্যে নাহি অনুতাপ ফল।
জতুগৃহদাহ পরে যবে বহুদিনে

তব পিতৃ আবাহনে, স্মর মনে,
পাঞ্চালী লভিয়া পরে পাণ্ডব পশিল,
এক কথা না কহিল. আইল হস্তিনা ত্যজি,
আজি সেই যুধিষ্ঠির হের বিদ্যমানে।

দুর্য্যো। সেই দিন সে ভুল না ভুলিব জীবনে।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কৃপ বচনে যবে
অন্ধরাজ পাণ্ডবে আনিলা, কর্ণ বাকা
কর্ণে না তুলিলা, দিলা ব্যাধি পশিতে শরীরে,
ঘরে অগ্নি জ্বালিলা আপনি। কালফণী
পুষিলা সাদরে আপন কুমারে
দংশিবারে নিশি দিবা, বাকি কিবা আর?
হৃদ্‌পিণ্ড প্রায় পুড়িয়া অঙ্গার,
বরিষয় অঙ্গার শত্রুর সম্পদ নেত্রে,
আর নাহি সহে।

শকুনি। তবে যাবে না কি সভাগৃহে?

দুর্য্যো। যাব সত্য, লইয়াছি নিমন্ত্রণ যবে।
পূজিয়া পাণ্ডবে পূর্ণ করি বিষপাত্র,
অধীনতা হীনত্ব দাসত্ব হলাহল!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ছার জীবন বিফল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

কি ভাবে রবে জগতে?

লেখক—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

সুপথে সুমতি লয়ে থাক যদি তুমি।
হইবে তোমার কাছে মর্ত্ত স্বর্গ-ভূমি॥
স্বস্তি শান্তি স্বচ্ছন্দতা পাবে মনে মনে।
আনন্দ লাবণ্য দেহে থাকিবে জীবনে॥

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর W. C. Bonnerjee.

[লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,]

স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণ।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই জীবনী-প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ব্যক্তি W. C. Bonnerjeeর পিতা ছিলেন। তিনি ইংরাজী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে পীতাম্বরের প্রথমা পত্নী মৃতবৎসা হওয়ায় জনৈক তেজস্বী ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া ৺নারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের শরণাগত হওয়ায় তাঁহারই অনুরোধে পীতাম্বর প্রথমা পত্নীর সম্মতিতে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। উক্ত দারপরিগ্রহ করিবার কিছুদিন বাদেই পীতাম্বরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে গিরীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। গিরীশচন্দ্র বাল্যকালে অতিশয় শান্ত শিষ্ট বালক ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের চেষ্টায় স্থাপিত ৺গৌরমোহন আঢ্যের Oriental Seminery স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে পল্লীস্থ হরেরাম গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তালপাতায় পরে কলাপাতায় লিখিতে অভ্যাস করেন। এই বিদ্যালয়ে উক্ত পল্লীস্থ যাবতীয় বালক ধারাপাত, লিখন ইত্যাদি প্রথম অভ্যাস করে। গিরীশচন্দ্র Oriental Seminary ছাড়িয়া Hindu Collegeএ ভর্ত্তি হন। তথায় সুলেখক ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতির সহিত শিক্ষালাভ করেন। তিনি বাড়ীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও উর্দ্দু ভাষায় "পান্নানামা" ও "চাহার দরবেশ" পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠানুরাগ যথেষ্ট ছিল। তিনি সর্ব্বদা পাঠে নিরত থাকিতেন। যখন তিনি Attorneyর কার্য্য করেন তখনও Hindu Law সম্বন্ধে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার ন্যায় সুলেখক অতি বিরল ছিল। বর্ত্তমান লেখক একদিবস প্রকাশ্য আদালতে Advocate General Sir Charles Paulকে গিরীশচন্দ্রের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মাধিকরণে মহামান্য বিচারপতিগণকে বলিলেন "ইদানীং Attorney গণ স্বয়ং কোন মুকদ্দমা করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে একজন Attorney ছিলেন তাঁহার নাম গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি কিরূপে সুন্দরভাবে, স্বল্পে, আর্জ্জি জবাব মুসবিদা করিতে হয় জানিতেন। তাঁহার অভাব এক্ষণে আমরা

খুবই অনুভব করিতেছি। উক্ত গিরীশচন্দ্র বর্ত্তমান সুযোগ্য Counsel W. C. Bonnerjeeর পিতা।" পরে W. C. Bonnerjee যে একজন বিখ্যাত draughtsmex বলিয়া আইনজগতে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি তাঁহার পিতার নিকট মুসবিদা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে W. C. Bonnerjee বর্ত্তমান লেখককে বিলাত হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যথা - "১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র মিষ্টার George Rogers attorneyর অফিসে শিক্ষানবিশ কেরাণী (articled clerk) হন এবং যথারীতি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার attorney পরীক্ষা দিবার কথা কিন্তু তাঁহার পিতা পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করায় তাঁহার স্কন্ধে একটী বৃহৎ পরিবারের ভার পতিত হয়। তাঁহার মাসিক বেতন বেশী না থাকায় তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দিন রাত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত তজ্জন্য তাঁহার অফিস যাইতে বিলম্ব হইত। তিনি প্রাতে খিলাৎ ঘোষের বাটীতে Correspondent Clerkএর কার্য্য করিতেন ইত্যাদি। উক্ত অফিসের কর্ত্তা মিষ্টার Archibald Grant তাঁহার বিলম্বে অফিসে যাওয়ায় অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং মাসিক ১৫০৲ টাকা হইতে তাঁহার মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন কিন্তু এই সর্ত্তে বৃদ্ধি করিবেন বলিলেন যে গিরীশচন্দ্রকে সকাল সকাল আসিতে হইবে। গিরীশচন্দ্র অল্প দিনের জন্য সকাল সকাল আসিতে পারিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় বিলম্বে অফিসে যাইতেন। ইহাতে Grant সাহেব বলিলেন "যদ্যপি গিরিশচন্দ্র সকাল সকাল না আইসে তবে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।" উক্ত সময়ে শোভাবাজার রাজপরিবারে একটী ভারি মোকদ্দমা Supreme courtএ চলিতেছিল। উক্ত মোকদ্দমা Grant এবং Rogers সাহেব একপক্ষে attorney ছিলেন অপর পক্ষে Allen এবং Judge সাহেব attorney ছিলেন। উক্ত মোকদ্দমা গিরীশ চন্দ্রের হস্তে ছিল। তিনি এক জবাব লিখিয়া দেন। উক্ত জবাব তাঁহার মক্কেল মহারাজ বাহাদুর কমলকৃষ্ণকে পাঠান হয়। এখানে বলা উচিত মহারাজ বাহাদুর কমলকৃষ্ণ গিরীশচন্দ্রের এবং পুত্রগণের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। একদিন Allen সাহেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের বন্ধু মহারাজ বাহাদুরের সাক্ষাৎ হয়, তিনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন—কথিত জবাব কোন্ কৌন্সিলি লিখিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর বলিলেন "উহা কোন কৌন্সিলি লেখে নাই কিন্তু গিরীশচন্দ্র নামক জনৈক Articled clerk (শিক্ষানবিশ কেরাণী)

লিখিয়াছিলেন। Allen সাহেব ঐ সময়ে Supreme Courtএ পশার নির্ভর না করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি পশার করিতে মনস্থ করেন তজ্জন্য Supreme Court attorney officeএর কার্য্যাদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তিনি মহারাজ বাহাদুরকে অনুরোধ করেন গিরীশচন্দ্র তাঁহার অফিসে কার্য্য করুন। মহারাজ বাহাদুর বলিলেন Grant সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি চলিতেছে এবং তাঁহার নিকট গিরিশচন্দ্র জবাবপত্র পাইয়াছেন। এই খবর পাইয়া Allan সাহেব গিরীশচন্দ্রকে মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কিন্তু Grant সাহেব গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িতে চাহেন না, তজ্জন্য দুই মাস যাবৎ Allan সাহেবের অনুরোধে বাটিতে বসিয়া মাসিক ২৫০৲ লইতে লাগিলেন। গিরীশচন্দ্রের ব্যাপার তদানীন্তন Attorney associationএ মন্তব্যের জন্য পাঠান হয়। উক্ত association allan সাহেবের অনুকূলে মীমাংসা করেন। তখন গিরিশচন্দ্র Allan সাহেবের অফিসে যাইতে পারিলেন। Grant ক্রুদ্ধ হইয়া Rogers সাহেবের নিকট গিরীশ চন্দ্রের যে article sheet ছিল তাহা হস্তান্তর করিতে অনুমতি দিলেন না, তজ্জন্য উক্ত articles বাতিল হইল। অতএব গিরিশচন্দ্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় allan সাহেবের সহিত নূতন articlesএ আবদ্ধ হইলেন। (ক্রমশঃ)

নিন্দা ও প্রশংসা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল।

এ সংসারে নিন্দা ও প্রশংসা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। কেহ বা নিন্দাভাজন হয় আবার কেহ বা প্রশংসালাভ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে সকলের ভাগ্য সমান নহে। কেহ প্রশংসার কার্য্য করিয়াও প্রশংসা লাভ করিতে পারে না বরং নিন্দনীয় হয়। আর কেহ নিন্দার কার্য্য করিয়াও প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। ইহা সময়ের ফের বা অবস্থা গতিকে হইয়া থাকে।

"The praise of men is not the test of our praiseworthiness, nor is their censure; but either should set us upon testing ourselves." Whately.

বাস্তবিক নিন্দা ও প্রশংসার সকল সময় কোন অর্থ নাই। তবে অন্যের নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা আমরা আত্মসংশোধন করিতে সমর্থ হই।

যখন আমরা বুঝিতে পারি যে অযথা বা অন্যায়ভাবে প্রশংসা স্থলে নিন্দা হইতেছে, তখন আমাদের আত্মনির্ভরতা অধিক হয়। আবার যখন আমরা দেখিতে পাই যে নিন্দা স্থলে অযথা প্রশংসা হইতেছে, তখন আমরা মনে মনে সতর্কিত হই এবং ভবিষ্যতে প্রশংসাজনক কার্য্য করিতে সচেষ্ট থাকি।

নিন্দা ও প্রশংসার মূল এই যে অপরের উপর বিচার ভার ন্যস্ত হয়। সুতরাং বিচারক যে বিচার করেন তাহা অনেক সময়ই ঠিক হয় না। তবে সকল সময়ই যে ঠিক হয় না তাহা নহে।

অনেক লোক স্বভাবতঃ বড়ই বৃথা নিন্দুক। তাহাদের নিন্দার কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ সদা অপরের অমূলক দোষ খুজিয়া উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিবে। ইহা পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ। তাহাদের অসঙ্গত নিন্দায় জ্ঞানী লোকের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জ্ঞানীলোক তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাকিবে। এজন্যই কবিবর রবীন্দ্রনাথ কবিত্ব ভাবে লিখিয়াছেন,—

"তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল।
শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমূল॥
যতক্ষণ নিন্দা করে থাকি আমি চুপে।
ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে॥"

কিন্তু প্রত্যেক মানবেরই নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে পারিলেই ভাল ; নিষ্কাম, নির্লিপ্ত ভাবে চলিতে পারিলেই মহত্ত্ব। এজন্যই রবিবাবু লিখিয়াছেন,—

"স্তুতি নিন্দা বলে আসি, গুণ মহাশয়!
আমরা কে মিত্র তব? গুণ শুনি কয়—
দুজনেই মিত্র তোরা, শত্রু দুজনেই—
তাই ভাবি শত্রু মিত্র কারে কাজ নেই।"

কিন্তু এরূপ নিষ্কাম, নির্লিপ্ত ভাবে চলিতে না পারিলে কি কর্ত্তব্য ?

But, after all the great thing is so to lie as to deserve praise and then whether it be given or not, the mind will find for itself sufficient recompense in its own peace and blessedness.

Rev. J, Cramaook,

ঘাত প্রতিঘাত।

লেখিকা—শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী।

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। নবীনকিশোর বাবু ঘুম হইতে উঠিয়া পাঠ-নিরতা কন্যার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মলিনা, আজ তোমার স্কুলে না গেলে কি খুব ক্ষতি হবে?" পিতার প্রশ্নে একটু বিস্মিতা হইয়া মলিনা বলিল, "কেন বাবা! আজ তো এমন কিছু দরকার নাই, যার জন্য স্কুল কামাই করতে হবে। যদিও না গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে না তা মিছামিছি কামাই করতে যাব কেন?" নবীনকিশোর বাবু বলিলেন, "আজ তোমাকে দেখতে আস্‌বার কথা আছে, কথা আছে কেন নিশ্চয়ই আস্‌বে।" তারপর যেন আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ছেলেটি দেখতে মন্দ নয়। বিষয় আশয়ও আছে, বি-এ পড়ছে, ঈশ্বরেচ্ছায় বিবাহ হ'লে সকল দিকেই ভাল হয়। ওরে শ্যামা, মুখ ধোবার জল দে রে" বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ীর কর্ত্তা নবীনকিশোর বাবু প্রসিদ্ধ ধনী না হইলেও মধ্যবিত্ত বলা যায় না। কলিকাতার বহুবাজারে বৃহৎ ত্রিতল প্রাসাদখানি, চাকর, ঝি, বামুন ঠাকুর প্রভৃতি সকলই তাঁহার সচ্ছল অবস্থার পরিচায়ক। তাঁহার দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা। বড় মেয়ে মলিনা উপযুক্ত হওয়াতে পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহের ঘোরতর বিরোধী। বয়স্থা ও শিক্ষিতা করিয়া বিবাহ দিবার পক্ষপাতী।

(২)

মলিনা আজ পিতার আদেশে স্কুলে যায় নাই। রাস্তার ধারের ঘরটায় খাটের উপর বসিয়া সঙ্গিনীদের সহিত তাস খেলিতেছিল, সত্য কথা বলিতে কি তাসে তার আদৌ মনোযোগ ছিল না। মন ছিল সাম্‌নের জানালাটার বাহিরের পথটার দিকে। এই তরুণীর প্রাণটা আজ কি যেন এক আবেশে বিভোর। তাস্‌টা মুখের সাম্‌নে ধরিয়া উৎসুক উদাস চোখে কি যেন ভাবিতেছে। সঙ্গিনীদের তাড়নায় বা হোক্ এক খানা তাস ফেলিয়া দিতেই তাহারা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, কেহ বা অনুপস্থিত ব্যক্তিবিশেষ 'আগন্তুকের নাম ধরিয়া টিপ্পনি করিতে ছাড়িতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইতেছিল।

এমনি করিয়া কয়জনে যখন তাস খেলিতেছিল, তখন বামী ঝি আসিয়া বলিল "ও দিদিমণি! আর তাস খেলায় কাজ নেই গো, শীঘ্র নেমে এস, বাবু ডাক্‌ছেন।" হাতের তাস ফেলিয়া দিয়া মেয়েরা সব মলিনাকে ঘিরিয়া গোলমাল করিতে লাগিল। বেচারী মলিনা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সঙ্গিনীদের নিকট হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া লাজ-নম্রমুখী ধীরে ধীরে বৈঠকখানা অভিমুখে চলিল। ঘরের কাছে যাইতেই অপরিচিতের কণ্ঠস্বর কাণে বাজিল। নবীন কিশোর বাবুর প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিতেছিল "আমার নাম শ্রীযামিনীনাথ চৌধুরী।"

(৩)

সেদিন মলিনা স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র যেন তাহাকে শোনাইবার উদ্দেশ্যেই নবীনকিশোর বাবু স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো! যামিনী চিঠি লিখেছে যে এই অগ্রহায়ণে ত বিয়ে হ'তে পারে না; ক'টা দিনই বা আর আছে এ মাসের। মাঝে পৌষ মাস, মাঘ মাসে বিয়ে হ'বে। মনির পড়া শোনা কেমন হচ্ছে লিখেছে, লেখাপড়ার উপর তার ভারী ঝোঁক কিনা।" মলিনার মা সুমতি দেবী কন্যার লজ্জারাগরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, "যামিনীর মামাও না ওই কথাই লিখেছে? তুমি লিখে দাও—বিয়ে মাঘ মাসেই হ'বে। সেজন্য কোন চিন্তা নেই!" নবীনকিশোর বাবু বলিলেন, "হাঁ এই কথাই লিখে দিই গে তুজনকে।" মলিনা বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া আরক্তমুখে দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। নবীনকিশোর বাবুর কন্যার বিবাহের প্রতিবন্ধক শুধু এই শেষ পৌষ মাসের দিন কয়টা। দেখিতে দেখিতে পৌষ মাস শেষ হইয়া শুভ মাঘ মাস পড়িল। মাঘ মাসের আরম্ভে নবীনকিশোর বাবুর বৃহৎ বাটীখানি আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাটীর ভিতর কোলাহল কলরবে মুখরিত হইল। বাড়ীটী পরিপাটীরূপে সুসংস্কৃত করা হইল। ইহার পর একদিন খুব ঘটা করিয়া শ্রীমতী মলিনা দেবীর ও শ্রীমান যামিনী নাথের আশীর্বাদ হইয়া গেল। আর তিন দিন পরে বিবাহ হইবে। বিয়ের গহনার জন্য স্যাকরাবাড়ী শ্যামা চাকরের তাগাদার মাত্রা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে! হোগ্‌লা ঘের্‌বার জন্য ছাতের উপর রাশি রাশি হোগ্‌লা স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘরের ভিতর তক্তার উপর ঠিকানা লেখা ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র গুলি জমা হইয়াছিল। সমস্ত বাড়ীটা যেন সাগ্রহে উৎসব রজনীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

(৫)

সেদিন ভিতর বারান্দার গলির দিক্‌কার জানালাটা খুলিয়া দিয়া মলিনা দাঁড়াইয়াছিল! সাম্‌নের নিম গাছটার পাতা কাঁপাইয়া ঝির ঝির করিয়া হাওয়া বহিতেছিল। মলিনার অশ্রু, ভয় ও লজ্জা-ড়িত মুখখানা এক অপূর্ব্ব শ্রীতে উদ্ভাসিত। কাল মলিনার গায়ে হলুদ, তৎপর দিন বিবাহ। বিয়ের আর তুইটী দিন মাত্র বাকী। মলিনার প্রাণ আশার আলোকে আলোকিত। পঞ্চদশী তরুণী তার ভাবী স্বামীর কথাই ভাবিতেছিল। যামিনীনাথের মত অমন রূপবান গুণবান স্বামী লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিতেছিল। কখনও তাহার কত স্নেহের ভাই বোন্‌গুলিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া ম্রিয়মাণা হইতেছিল। এই রকম চিন্তায় মগ্না হইয়া সে যখন দাঁড়াইয়াছিল, তখন সহসা পাশের ঘর হইতে তাহার পিতার আর্ত্তস্বরে সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ঘরের মেঝেয় বসিয়া তাহার মা বরণ ডালা সাজাইতেছিল, একখানা খোলা চিঠি হাতে লইয়া নবীনকিশোর বাবু আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো সর্ব্বনাশ হ'য়েছে আমাদের, হায়! এই তাদের মনে ছিল!" নবীনকিশোর বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সুমতি দেবী স্বামীর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ, বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কি হ'য়েছে গা? অমন করে বস্‌লে কেন?" নবীনকিশোর বাবু ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এই দেখ, বরকর্ত্তা যামিনীর মামা চিঠি লিখেছে যে এ বিয়ে এখন কিছুতেই হ'তে পারে না. পরে হ'বে কি না তাহাও ঠিক বল্‌তে পারি না। তাহাদের প্রতিপক্ষ জমিদারের সহিত মামলা বাধিয়াছে। বুঝি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিবাহ করে কি গাছ তলায় লইয়া রাখিবে? আরও লিখেছে যে এ মেয়ে বড় অপয়া, বিয়ে হ'তে না হ'তেই কি বিপদ। এ মেয়ে কিছুতেই ঘরে আনা যেতে পারে না।" অধীরচিত্তে এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। সুমতি দেবী এই নির্ঘাত কথাগুলি শুনিয়া খানিকটা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া যাইতেই বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "যামিনী! এই কি তোমার উচিত হল বাবা!" মলিনা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তার রাঙ্গা মুখখানা এক মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। কোন মতে বুকখানাকে তুই হাতে চাপিয়া ত্বরিত পদে বিছানায় গিয়া মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

(৬)

এই সাংঘাতিক আঘাতটার পর দুই দিন চলিয়া গিয়াছে। নবীনকিশোর বাবু ও সুমতি দেবী অনেকখানি সামলাইয়া উঠিয়াছেন। না সাম্‌লেই বা করেন কি? কিন্তু মলিনাকে দেখিয়া তাঁহারা দুজনেই একটু শঙ্কিত হইলেন। এ দুই দিন সে কাহারও সহিত কথা কহে নাই, সে ইহার মধ্যে গাম্ভীর্য্যময়ী নারী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আর সে চঞ্চল কিশোরী ভাব নাই। তাহার মুখে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছায়া সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

তখন গৃহে গৃহে সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছিল। বায়সেরা দলবদ্ধ হইয়া নীড় অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার ঘন ছায়া নিবিড় হইয়া আসিল। কোন কোন বাড়ীতে নিত্য সেবার আরতি কাঁসর ঘণ্টা ধ্বনিয়া উঠিল। এমন সময়ে নবীনকিশোর বাবু কন্যার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা মলিনা! গুরুদেব আসিয়াছেন, প্রণাম করবে, বাহিরে এস মা!" তাঁহার অন্তর তখন হাহাকার করিতেছিল, আজ যে মলিনার বিবাহ তারিখ; তাসের প্রাসাদের মত সে স্বপ্ন যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মলিনা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল, কন্যার ম্লান মূর্ত্তিখানি স্নেহময় পিতার প্রাণে বড়ই বাজিল, তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, প্রশান্ত বদন, করুণাসজল স্নেহপূর্ণ নয়ন গৌরবর্ণ গৈরিক-পরিহিত গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া মলিনা প্রণাম করিবার জন্য মাথা নত করিতেই গুরুদেব তাঁহার বাম হাতখানি স্নেহভরে তার মাথায় স্থাপিত করিয়া স্থিরস্বরে বলিলেন, "মা! শুন্‌লেম নাকি তুমি অত্যন্ত কাতরা হয়েছ? কেন মা মলিনা! এত ব্যথিতা তুমি? তা হবে না মা, মনকে দৃঢ় কর। কি কর্‌বে জননী! এ যে স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল। মলিনার মলিন মুখ কিসের এক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দৃঢ় সঙ্কল্পের ছায়া বদনে প্রতিফলিত হইল। সে পরিষ্কার দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, "করুণাময় দেবতা! আমি আমার জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করেছি। মঙ্গলময়ের সকল কার্য্যের ভিতরই মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই বিবাহ যে হ'ল না তাহা সেই ইচ্ছাময়েরই শুভ প্রেরণায়। আমি আর জীবনে বিবাহ করিব না। আমি আজ জগতের বড় কাজের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিলাম। ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সংসারে আমার আত্মাকে সঙ্কুচিত হইতে দিব না। কেননা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচই হ'ল মৃত্যু, আর সকলপ্রকার প্রাপ্তিই হ'ল জীবন।" গুরুদেব একাগ্রমনে তাহার কথাগুলি শুনিলেন, তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিলেন,—"মা

মলিনা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। সকল সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া প্রকৃত কর্ম্মের অধিকারিণী হও। পিতামাতার প্রতি ভক্তি রেখে, সমস্ত স্বার্থকে পদদলিত কোরে নির্ব্বিচারে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করে দাও মা, এই তোমার গুরুর আশীর্ব্বাদ।" শান্ত মুখে মলিনা উত্তর দিল "তাই আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব! যেন সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে আচ্ছন্ন হোয়ে অন্যায়ের নিকট বিবেককে না বলি দিই। ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায় কর্ত্তব্য-পথচ্যুত না হই। হৃদয় হোতে সমস্ত গ্লানি দূর হোক্, সকল স্মৃতি বিস্মৃতির কোলে বিলীন হোক্। কর্ম্মই আমার সঙ্গী হোক্, সেবাধর্ম্মই আমার অবলম্বন হোক্।" গভীর বিশ্বাসে ভক্তিভরে মলিনা গুরুদেবের পায়ে প্রণতা হ'ল। গুরুদেবের বামহস্ত তখনও মলিনার মাথায় ন্যস্ত। গুরুদেব পূর্ব্ববৎ স্বরে উচ্চারণ করিলেন, ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

মাসিক-পত্রিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র।

"মাসিক পত্রিকা"র প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শিরোদেশে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

এই পত্রিকা কি কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল ও কিরূপ প্রণালীতে পরিচালিত হইবেক তাহা উপরের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া পাঠক মহাশয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন তৎজন্য কোনও টিপ্‌নি অনাবশ্যক। পরে কোন সময়ে ইহা প্রকাশিত হইত তাহা আমরা বিবৃত করিব।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভার্ণাকিউলার লিটরেচর সোসাইটি (Vernacular literature Society) স্থাপিত হইয়াছিল। এই বৎসর কার্ত্তিক মাস হইতে (১৭৭৩ শক হইতে) সোসাইটির উৎসাহে প্রকাশিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বঙ্গভাষায় অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি

রাখিয়া গিয়াছে। এই পত্রিকা খানির সম্পূর্ণ নাম ছিল—বিবিধার্থ সংগ্রহ। অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্র।

প্রথম সংখ্যার অবতরণিকাতে ইহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত ছিল,—"যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপর ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না; অতএব অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপ-কথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।"

"বিবিধার্থ সংগ্রহ ব্যতীত তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রতি মাসে প্রকাশিত হইত ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। এতৎব্যতীত মধ্যে মধ্যে খৃষ্টীয় পাদ্রীগণ বঙ্গভাষায় মাসিক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতেন, তন্মধ্যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাস হইতেপাদ্রী লং সাহেবের যত্নে প্রকাশিত "সত্যার্ণব পত্রিকা" উল্লেখযোগ্য। আমরা "বিবিধার্থ সংগ্রহ"র নবম পর্ব্বর ৬০ খণ্ড (১৭৮০ চৈত্র সংখ্যা) পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। বোধ হয় ইহার পর হইতে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত হয়।

যাহাই হউক, আমরা "মাসিক পত্রিকা" বর্ণনা করিতে গিয়া অনেকদূর আসিয়াছি। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"তে অনেক জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী দেশ, নগর, পশু-পক্ষীর বিবরণ আন্দোলন হইত কিন্তু মাসিক পত্রিকাতে সাধারণের শিক্ষার্থে চলিত ভাষায় প্রধানতঃ আখ্যায়িকাদি প্রকাশ হইত। উভয় পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হইবার পর ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের উদ্‌যোগে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পুনঃ প্রকাশ হইয়াছিল। "বেঙ্গল হরকরা" সংবাদপত্রে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইয়াছিল ও ১৭৮২ শক বৈশাখ মাস (৭ পর্ব্ব ৭৩ খণ্ড) হইতে ইহা নবকলেবরে প্রকাশ হইয়াছিল।

"মাসিক পত্রিকা" ১২৬১ সালের ভাদ্র মাস (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট) হইতে তিন বৎসর যাবৎ প্রকাশ হইয়াছিল।

বঙ্গললনাদিগের জ্ঞানোন্নতি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য কিরূপ ভাষায় "মাসিক পত্রিকা"য় প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইত তাহার নিদর্শন স্বরূপ আমরা ১২৬৩ সালের অগ্রহায়ণ ও ১২৬৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা হইতে দুইটি প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা ইহার বর্ণাশুদ্ধি বা ছেদ প্রভৃতির কোনও পরিবর্ত্তন করি নাই। তবে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper noun) শব্দগুলি বড় হরপে ছিল, পাঠকগণের পড়িতে অসুবিধা হইবে বলিয়া সমস্ত একরূপ দিয়াছি।

ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ।

ইংরাজী সন ১৭৮২ সালে, অর্থাৎ চোয়াত্তর বৎসর হইল, সিসিলি নামে এক উপদ্বীপে বড় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। সে ভূমিকম্প অনেকক্ষণ থাকে, তাহাতে প্রায় সকল বাড়ী ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, আর শত শত লোকও মারা পড়ে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে এমন সময়ে একজন ওমরার বিবী অত্যন্ত ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা যান। এইজন্য ওমরা তাঁহাকে আস্তে আস্তে কেল্লার ভিতর লইয়া গিয়া রাখেন। বিবীর জ্ঞান হইলে দেখেন,—চাকরেরা ভুলে কোলের ছেলেটিকে বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে দৌড়িয়া যান, গিয়া দেখেন, উপরের ঘরে দোলাতে ছেলেটি ঘুমচ্ছে। তিনি ছেলেটি কোলে করেন, ছেলেটি কোলে করিয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেছেন, এমন সময়ে ভূমিকম্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। মা আর নীচে আসিতে পারেন না। তিনি উপরের ঘরময় দৌড়াদৌড়ি করেন। ভূমিকম্পেতে উপরের সকল ঘর এক একটা করে পড়িয়া যায়, কেবল বারাণ্ডা পড়ে নাই, সে বারাণ্ডায় মা ছেলেটি কোলে করে যান, গিয়া কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক লোক জনকে ডাকিয়া বলেন, "আয়-রে, আমাকে নামাইয়া দে, তোরা যা চাইবি তাহাই দিব।" কিন্তু কেহই বারাণ্ডা থেকে ওমরার বিবীকে নামাইয়া লইতে পারে না। শেষে ভূমিকম্পেতে বারাণ্ডাটাও ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে মা ছেলে উভয়েই চাপা পড়িয়া মরিয়া যায়। (অগ্রহয়ণ, সাল ১২৬৩)

ভদ্রমেয়ে প্রাণ দিয়া ঈশ্বরের নিকটে বাপের মানত রক্ষা করেন।

ইহুদিরা কে তাহা আষাঢ় মাসের পত্রিকায় লিখিয়াছি। ইহুদিরা বড় প্রাচীন জাত, হিন্দুরা যেমন প্রাচীন জাত, ইহুদিরাও প্রায় তেমনি প্রাচীন। ইহুদিদিগের আচার ব্যবহার অনেক হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের মতন। এই সকল কথা পরে একদিবস বিস্তারিতরূপে বলিব। এ স্থানে ইহুদিদিগের দেশের একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার সংক্রান্ত একটি গল্প লিখি। সে গল্পটি দাতাকর্ণের মতন।

তিন হাজার বৎসর হইল ইহুদিদিগের মধ্যে জেপ্‌থা নামে একজন দেশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বড় এক লড়াইয়ে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে ছিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া মানত করেন,—পরমেশ্বর, আমি লড়াইয়ে যাইতেছি, যদি শত্রুদিগকে হারাইয়া দিয়া অধীনে আনিতে পারি, তবে দেশে ফিরে আসিবার সময়ে আমার বাড়ীর,—মনুষ্যই হউক, পশুই হউক, পক্ষীই হউক, যাহাকে প্রথম দেখিব, তাহাকে আপনার নিকটে নিবেদন করিয়া বলিদান করিব।

পরমেশ্বরের নিকটে এই কথা মানিয়া জেপ্‌থা লড়াইয়ে গমন করেন। জয়ী হইয়া দেশে ফিরে আসিতেছেন, এমন সময়ে পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক শাঁখ ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার মেয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। এই মেয়ে বই জেপ্‌থার কোন ছেলে ছিল না। মেয়েকে দেখিবামাত্র জেপ্‌থা দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলেন, "মা, কেন তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিলে, আমি মানত করিয়াছি, শত্রুদের উপর জয়ী হইয়া দেশে ফিরে আসিবার সময়ে যাহাকে প্রথম দেখিব, তাহাকে পরমেশ্বরে প্রদান করিব। পরমেশ্বরের নিকটে যে মানত করিয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করা মনুষ্য সাধ্য নয়। মা, কি করিব বল, তোমাকে দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।" এই সকল কথা বলিয়া ছেলেমানুষের মতন কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া জেপ্‌থা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মেয়ে উত্তর দেন,— 'বাবা, পরমেশ্বরের নিকটে যে মানত করিয়াছ, তাহা পালন কর, আমি মরিলাম বা, ক্ষতি কি, তুমি তো মানতের জোরে শত্রুদের উপর জয়ী হইয়া দেশে ফিরে আসিয়াছ, এই পরম আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু বাবা, আমার একটি নিবেদন আছে, তাহা বলি শুন, আমাকে দুই মাসের জন্য বনবাস দেও, সকল সহচরিগণকে সঙ্গে লইয়া দুইমাস বনবাস গিয়া খেদ করি, আমি আইবুড় মরিলাম, কোন ছেলে পিলে রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।

জেপ্‌থা মেয়ের কথায় সম্মত হন। মেয়ে দুইমাস বনবাস থাকিয়া ঘরে ফিরে আইসেন। পরে বাপ মেয়েকে পরমেশ্বরের মন্দিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে বলিদান করেন। রক্তটা মাল্‌সা করে লইয়া মন্দিরময় ছড়া দেন। পরে দেহটা খণ্ড খণ্ড করে কাটিয়া ধুইয়া জ্বালাইয়া ফেলেন।

ইহুদিরা বলে বলিদানের মাংস জ্বালাইলে যে গন্ধ হয়, তাহা পরমেশ্বর সুগন্ধ বোধ করেন, তাহার ঘ্রাণে তিনি বড় সন্তুষ্ট হন। (অগ্রহায়ণ, সাল ১২৬৩)

ভাব ও ভাষা।*

লেখক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র বি, এ।

আকৃতির সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।
উন্নত ললাট—সুন্দর মহিমাময়!
অসম্ভব, পাপ তথা করে অভিনয়।

ইহা কবিজনোচিত উক্তি হইলেও ইহার মূলে সত্য নিহিত আছে। আকৃতির সহিত প্রকৃতির যেরূপ সম্বন্ধ, ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ সেইরূপ! সকল সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম আছে। সুন্দর আকৃতির অন্তরালে ভীষণ প্রকৃতি যে কখন বাস করে না, তাহা নয়। কুসুমে কীট বাস করে, শ্যাম ধরিত্রীর দেহ-স্নেহ-কর জলধরপটলের মধ্যে বজ্র লুক্কায়িত থাকে। শ্রুতি-সুখকর ললিতপদবিন্যাস-মধুর ভাষারও মধ্যে দীন ভাব দৃষ্ট হয়। তথাপি ভাব ও ভাষার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার করা যায় না। যিনি ভাবুক, যাঁহার ভাব-সম্পদ্ প্রচুর, তিনি ভাষার সৌন্দর্য্যবিধানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হইতেও পারেন, কিন্তু ভাব উপযোগিনী ভাষার সখিত্ব লাভ করিয়া যে পরিপুষ্ট, উন্নত ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হয়, তাহা অবিসম্বাদী সত্য। মিলটনের Paradise Lost, কালিদাসের কুমারসম্ভব, কুমারসম্ভবের মধ্যে মদনভস্মের চিত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এক শ্রেণীর লেখক এই সত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, সচরাচর প্রচলিত কথিত ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিধানে সম্পূর্ণ সমর্থ এবং ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভাষারচনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহাদের রচনা লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে ইহাঁদের মতের ব্যতিক্রমই দৃষ্ট হইবে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। ভাষা যেমন ভাবকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়া তুলে, তেমনি উৎকৃষ্ট ও উন্নতভাব স্বভাবতঃ উপযোগিনী ভাষায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ভাব ও ভাষার এই প্রকৃতিগত সম্বন্ধ হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভাবুক, কবি ও সাহিত্যিক রচনার

* কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ৩।৩।৩৪।

শুদ্ধি, সৌন্দর্য্য—সর্ব্বোপরি ভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। কোমল অঙ্গুলিস্পর্শে তারযন্ত্র হইতে ধ্বনি উৎপন্ন হয়। স্বতন্ত্র ভাবে এক একটী ধ্বনির বিশেষ গৌরব নাই, কিন্তু যখন সুনিপুণ বাদকের ক্রীড়াকৌশলে বীণা যন্ত্র হইতে অবিরল প্রবাহে বৈচিত্রবহুল ধ্বনি বিগলিত হইতে থাকে, তখন সঙ্গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও হৃদয়তন্ত্রী স্ফূরিত ও মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। কবি ও সাহিত্যিকের হৃদয় ভাবের লীলাক্ষেত্র! তাঁহার হৃদয়োত্থ ভাব তাঁহারই বিশেষত্ব। কিন্তু কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার বিশেষ ভাবের ধারণা অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাব-আত্মা, ভাষা-দেহ। ভাব ও ভাষার পরস্পর মিলন হইলে কবি ও সাহিত্যিক-হৃদয়ের কল্পিত ও অনুভূত সৌন্দর্য্য লোকলোচনের প্রত্যক্ষ হয়। অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্য যেরূপ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন, অপর কোনও বঙ্গীয় সাহিত্যিক ততোধিক অনুভব করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান হইয়া চারিদিকে অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশি দেখিয়াছেন কি? তৎসহ উপরে অনন্ত প্রসারী নীলগগণ কেমন ক্রমে নমিত হইয়া অনন্ত দিগন্তে অনন্ত অম্বুরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে দেখিয়াছেন কি? সে কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের অননুভূত-পূর্ব্ব আস্বাদন! কে বলিবে সেই সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ কেবল সেই অনন্ত সমুদ্র অথবা কেবল অনন্ত আকাশ? সেই সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেমন অসম্ভব, বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্যরসগ্রাহী পাঠকের সেইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলা অসম্ভব সে সাহিত্য রস কি পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব হইতে—কি পরিমাণে তাঁহার ভাষা হইতে উদ্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা একই পদ্ধতি বা রচনার কঠিন নিয়মে গ্রথিত নয়। একস্রোতা ধীরগামিনী স্বচ্ছপ্রবাহিনী উহার তুলনাস্থল নয়। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল গঙ্গাম্বুর ন্যায় সত্য, কিন্তু ভাগীরথীর যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি উচ্ছ্বাস ও পতন আছে, ভাষারও সেইরূপ উচ্ছ্বাস ও অবতরণ আছে; নদী যেরূপ কখন কলনাদিনী, কখন তরঙ্গভঙ্গসমাকুলাবর্ষাবারিসমাগমজনিতকল্লোলিনী, কখনও মধুযামিনীর চন্দ্রকরপ্রতিঘাতে উজ্জ্বলবাহিনী - ভাষাও সেইরূপ কখন লঘুসঞ্চারিণী, কখন তীব্রবেগবতী, কখন বা সমৃদ্ধিশালিনী ও চাকচিক্যময়ী। নদীতে আবর্ত্ত আছে, সেই আবর্ত্তে জলরাশি সৌরকরসম্পাতে বিদ্যুৎস্ফূরিতবৎ ঝলসিত হইতে থাকে, ভাষাও সেইরূপ তীব্রশক্তিশালিনী ও জ্বালাময়ী। স্থূলতঃ বঙ্কিমবাবুর ভাষা সর্ব্বত্র বিষয়ের উপযোগিনী—বর্ণযোজনা, মাত্রা, সুর, পদবিন্যাস সকলই শোভন ও সুপ্রযুক্ত। পরস্পরশোভন অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত মনুষ্যের আকৃতি দর্শনে

যে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, বঙ্কিমবাবুর ভাষার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। এই স্থলে বঙ্কিমবাবুর রচনা হইতে কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত করিয়া এইক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আশা করি, উদ্ধৃত রচনা হইতে আমার বক্তব্য সকলে বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারিবেন।

"নগেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন—নদীর জল অবিরল চল চল চলিতেছে—ছুটিতেছে, বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষকেশ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোনও সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘষিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা অব্যক্তনাম্নী প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন। * * "

"মনোরমার রূপরাশি অতুল—কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার, সুকুমার কপোল, সুকুমার কেশ। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গিতে সৌকুমার্য্য, বাহুতে—বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার! গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার—নিশীথ সময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহসঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত শুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য। * * "

"১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ। লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পর কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল যোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল॥ তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ

করিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। * * "

"অন্ধকারময় পর্ব্বতগুহায় অবসন্ন শরীরে অবসন্নমনে একাগ্রচিত্তে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী দেখিল অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে চক্ষু চাহিয়া শৈবলিনী দেখিল - একি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমার লাবণ্যময় এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট, এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা? ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে,—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম?"

"গভীর জলকল্লোল নবকুমারের কর্ণপথে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেণিল, নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা। * যদি কখন এমন প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।" *

'ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের উপর স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে, সেখানে একটু চিকিমিকি, কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। নদীর উপর একখানি বজরাতে দেবী ছিলেন। ইহাঁর পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তা'তে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরামুক্তাখচিত কাঁচলি বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা পান্না মতি সোণায় সেই পরিপূর্ণদেহ মণ্ডিত, জ্যোৎস্নার আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন ঝিকি-মিকি, এ শরীরেও তাই।" *

ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন! মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন।

ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন "কালী"।

ব্রহ্ম। কালী – অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব—এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী! আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। হায় মা! * * তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এইপথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গাহিয়া উঠিল। দেখিলেন এক মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত; দিগ্‌ভুজা নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী-সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ; এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" * * *

অভেদ মুক্তি।

লেখক—শ্রীঅবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

১

জনৈক ভিক্ষুক শাক্তের বাড়ী
হরি নাম গুণ গায়।
গৃহস্বামী ক্রোধে কম্পিত কায়ে
জিজ্ঞাসা করে তায়॥

২

কে তোমারে হেথা ও গান গাইতে
আদেশ করিল, বল।
জান না কি তুমি, আমার বাড়ীতে
প্রতিষ্ঠা কালী করাল?

৩

রাম, হরি, কৃষ্ণ – চোরের সর্দ্দার,
ওদের নাম করে যে,
আমার বাড়ীতে বারণ আছে,
ভিক্ষা পায় না সে ॥

৩

হেসে কহে ভিক্ষুক, বল কি গোঁসাই!
ভেদ নীতি তুমি ধর?
যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী,
হেন, মনে বুঝে পূজা কর ॥

৫

ভেদ শূন্য বোধ নাহি হ'লে পরে
হিংসা বৃদ্ধি পায়।
ছাগ বলি দিয়ে, শুধু নাম গেয়ে,
মোক্ষ মেলে কি তায়?

৬

বল দেখি ভাই তিন বার তুমি
পুরুষ প্রকৃতি ক'রে।
দেখ, এবার মিলে যায় কিনা
দুয়ে, এক ঐ ব্রহ্মপুরে ॥

৭

পূজা, দান, ধ্যান; গভীর জ্ঞানের
ধারা যদি বহে প্রাণে।
ভক্তির ছবি আঁকিয়া বুকেতে
দ্বিধা নাহি থাকে মনে ॥

৮

তবে, দিব্য জ্ঞানের আলোক আসিয়া
আঁধার ঘুচায়ে দেয়।
তখন, সে লোক, জানিহ নিশ্চয়
অভেদ মুক্তি পায় ॥

৯

তখন বলে গৃহস্বামী, "ঠাকুর!
প্রণাম তোমার পদে।
আমার, শ্যামা শ্যামের ভেদ ঘুচায়ে
লয়ে চল মুক্তি মার্গপথে ॥"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲ প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা, স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে. পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮/১—১৯ ল্যোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত. হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, আষাঢ়, [৩য় সংখ্যা

১।	ভুল	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৪৩৭
২।	চোখের দেখা	শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মিত্র	৪৪০
৩।	চিত্ত জয়	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চৌধুরী	৪৪৫
৪।	পাণ্ডব নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	
৫।	ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ		৪৬২
৬।	গৃহস্থ মঙ্গল	ডাঃ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দত্ত এম-বি,	৪৬৫
৭।	বিয়ের বাজার	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৬৮
৮।	তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে—	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭০
৯।	সাধনা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় B L	৪৭৩

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 24 7-27

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B. মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শিবাজী ও রামদাস স্বামী।

(কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে)

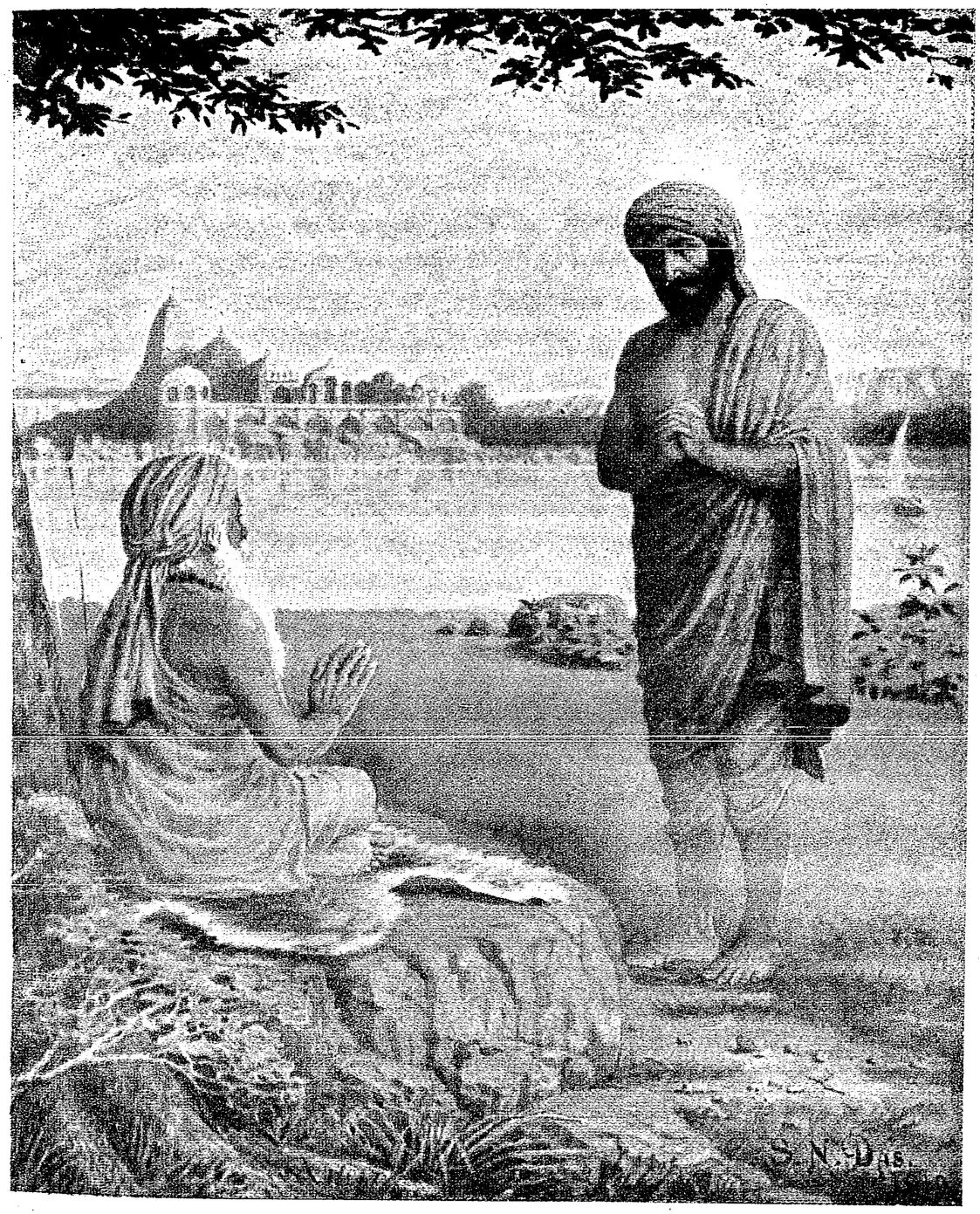

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
লেখ সং
কলিকাতা।

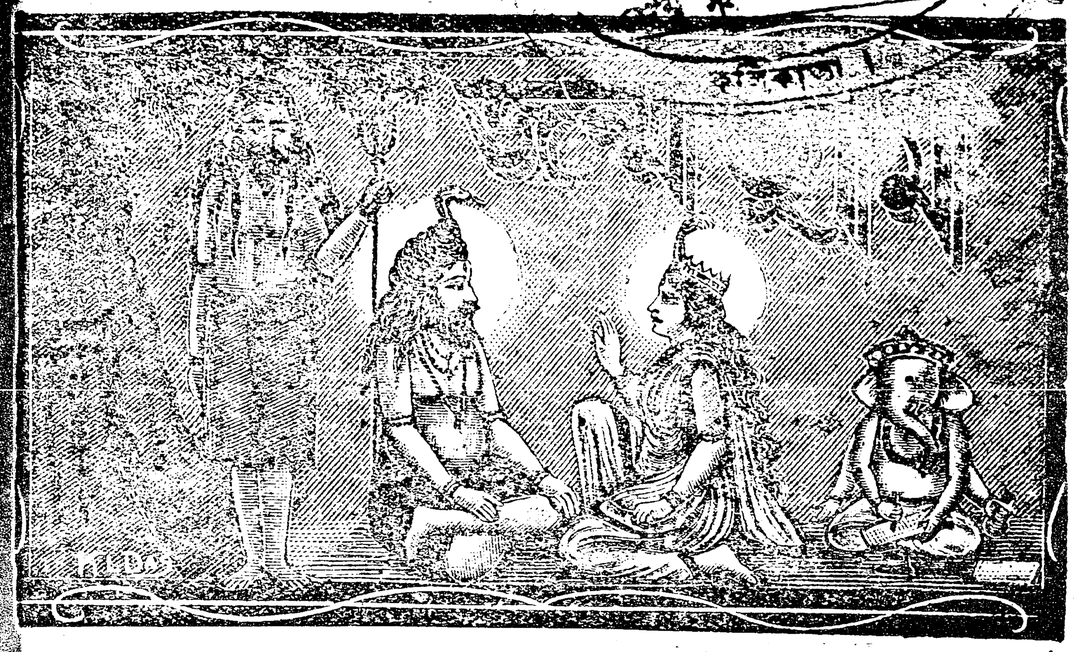

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, আষাঢ় | ৩য় সংখ্যা

ভুল।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

এই জগৎ এক মহাপ্রহেলিকাময়, অতিদুর্জ্ঞেয় ও অবক্তব্য। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও ইহার নিগূঢ় তথ্য নির্ণয় করিয়া সুমীমাংসায় সমুপস্থিত হইতে সক্ষম নহে। যাঁহার যতটা প্রতিভা, যাঁহার যতটা জ্ঞান, যাঁহার যতটা বুদ্ধির উন্মেষ, তিনি ততটা মীমাংসা নিজ নিজ দিক হইতে নির্ণয় করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। সার্ব্বজনীন মীমাংসা বা সার্ব্বভৌমিক সমতল ক্ষেত্রে কেহই সমুপনীত হইতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই তাহা বলা অতি কঠিন, কেহ পারিবেন কি না তাহা বলাও সহজ নহে। তবে মোটামুটীভাবে অনুশীলন বা আলোচনা করিলে সাধারণতঃ বুঝিতে পারা যায় যে একমাত্র ভ্রান্তি বা ভুল

সকল মীমাংসার অন্তরায়। এ ভুল আবহমানকাল হইতে চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিবে। ইহা বোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই, কারণ ইহা শক্তিরূপিণী জগন্মাতার শক্তির বিকাশ বিশেষ।

আমরা অনন্ত ভুলরাজ্যে বিচরণ করিতেছি, অনন্ত ভুল স্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসমান হইয়া চলিয়াছি। প্রতিনিয়ত ভুল প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি ফিরিতেছি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকে অসীম অনন্ত ভুল পরিদৃশ্যমান। অন্তর্যামী ভগবান হৃদ্‌বিহারী দীনবন্ধো! কি করিলে আমরা এই ভ্রান্তিডোর ছেদন করিতে পারি বলিয়া দাও প্রভো!

প্রথম ভুল জন্মের পূর্ব্বে, তারপর ভুল জন্মের পরে, তারপর মহাভুল বিবাহে; তারপর বিষম বিরাট ভুল কর্ম্মক্ষেত্রে। এইরূপ প্রতি বিষয়ে প্রতি ব্যাপারে কত শত ভুল আছে তাহা আমরা কোন সময় অনুসন্ধান করিনা বা অনুসন্ধানের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিনা। আমরা ক্রীড়ার সামগ্রী যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাতেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দে দিবা রজনী অতিবাহিত করিতেছি; সুতরাং ভুল বা ভ্রান্তি কি বা কোথায়, তাহার অনুশীলন বা চিন্তা করিবার অবসর নাই। তাই বলিতেছিলাম, যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মাতঃ জগন্মাতঃ! কৃপা করিয়া দীন হীন অধমসন্তান আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ উপলব্ধি যাহাতে করিতে পারি তাহার উপায় বিধান করিয়া দাও মা! কতদিন আমরা ঘোর ভ্রান্তি পঙ্কে নিমজ্জিত থাকিয়া সংসারের খেলায় ভুলিয়া তোমাকে ভুলিয়া ঘোরতর অজ্ঞানময় তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করিব? আমাদের কোন সাধন ভজন নাই, কোন জ্ঞান নাই, কোন বিদ্যা নাই, কোন বুদ্ধি নাই। আমাদিগকে তুমি পথ না দেখাইলে আর কে দেখাইবে মা? আমরা অতীব দীন হীন অধম অক্ষম সন্তান।

মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট বলিলে বাস্তবিকই লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু একটু নিভৃতে একান্ত মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে যদি কেহ অকপটে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে এ জগতে অল্প বিস্তর সকলেই পাগল। প্রকৃত প্রস্তাবে তন্ময়তা একাগ্রতা ও সত্য এই তিনের সমন্বয় যেখানে, সেখানে মানুষ পাগল না হইয়া পারে না।

যেখানে সরলতাশূন্য সংসারের গভীর জ্ঞান, স্বার্থের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহমান

সেখানে মানুষ পাগল নহে, সেখানে ঠিক্ লোক, বিচক্ষণ লোক, বিবেচক লোক, বিজ্ঞ লোক বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত।

এ সংসারে খাঁটী জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করা সাধারণ লোকের সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে সুতরাং যাঁহার ভগবৎপ্রেম লাভ হইয়াছে, যিনি ভগবান ভিন্ন আর কোন বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না, যাঁহার সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত, যাঁহার শয়নে স্বপনে ও জাগরণে ভগবান ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই, যাঁহার সুখ দুঃখে সমজ্ঞান, চন্দনে কর্দ্দমে সমদর্শন, পুত্র ও শত্রুতে সমভাব, যাঁহার পক্ষে গৃহে ও অরণ্যে প্রভেদ নাই, কাঞ্চনে ও তৃণে তুল্যভাব, সেইরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে প্রকৃত উন্নতির পথে, প্রকৃত ধর্ম্মের পথে, প্রকৃত ভগবানের সমীপবর্ত্তী ধর্ম্মে অগ্রসর হওয়া যায়। তখন মানুষকে ভ্রান্তিতে সমাচ্ছন্ন করিয়া বিভোর করিতে পারে না, তখন মানুষ অহরহঃ হৃদয়ের অন্তস্তলে অনন্ত আনন্দের উৎস দেখিতে পায়, তখন তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তখন প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার উপযুক্ত হয়। সংসারে থাকিয়াও তখন তাহার দুঃখ বা সুখ নাই। কাননে থাকিলেও তখন তাহার বিরক্তি নাই। ঘোরতর অভাব অভিযোগের মধ্যে থাকিয়াও বিষাদ নাই, সর্ব্বদা আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

এইরূপ খাঁটী মানুষ কি উপায়ে হইতে পারে তাহাই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ আমরা শৈশবকালে কি পাইলে সুখী হই, তারপর একটু বয়স বাড়িলে কিসে সুখী হই, তারপর আর একটু বড় হইলে কিসে উৎফুল্ল হই—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে অবস্থার পর অবস্থার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ইহাই তুলনা করিয়া দেখা উচিত যে, শৈশবের আদরের জিনিষ যৌবনে ভাল লাগে না কেন এবং যৌবনের প্রিয় জিনিষ বার্দ্ধক্যে মনোমত হয় না কেন এই সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া যিনি যতই অনুশীলন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তিনিই তত উন্নতিকর জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া ভগবৎদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

এই যে বিশাল দেহরাজ্য যাহার অধিপতি মন এবং ইন্দ্রিয়াদি অনুচরবর্গ প্রতিনিয়ত যাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান, সেই দেহরাজ্যের উন্নতিকল্পে কখন কোন সময়ে কোন প্রকার উপায় চেষ্টা করিয়াছি কি? সতত বাহিরের রাজ্য লইয়াই ব্যস্ত। কিসে অর্থাগম হইবে, কিসে সংসারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, কিসে স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গ সুখী হইবে, কিসে দশজনে ভাল বলিবে, কিসে

দশজনের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারা যাইবে—এই সকল চিন্তায় প্রতিনিয়ত মন চঞ্চল থাকে, সুতরাং দেহরাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা দূরের কথা, সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বাহিরের রাজ্য ও কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত। এখানেও সেই ভ্রান্তি রাজ্যের প্রবল পরাক্রম, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে না পারিলে আর পরিত্রাণ নাই।

মানুষ ভগবানকে খুঁজিয়া বেড়াইবার জন্য নানা স্থানে গমন করে, নানা স্থানে দেবদর্শন করে, নানা প্রকার তীর্থ পর্য্যটন করে, নানা লোকের সহিত নানা সময় অতিবাহিত করে কিন্তু নিজদেহের মধ্যে যে ভগবানের প্রতিনিয়ত অধিষ্ঠান তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার বা বুঝিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা যত্ন বা আগ্রহপ্রকাশ করে না ইহাই বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

হে অন্তর্যামী দীননাথ! প্রাণবন্ধো! প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! হৃদয়নাথ! একবার কৃপা করিয়া হৃদয়মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া স্বরূপ দেখাইয়া দিব্যজ্ঞানের বিকাশ করিয়া দাও দয়াময়! দেখিয়া বুঝিয়া জীবন জনম সফল করিয়া, অনন্ত অফুরন্ত আনন্দে আনন্দিত হইয়া, তুচ্ছ জাগতিক সম্পদ ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি। আর অনন্ত ভুলসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়া ক্ষুদ্র জীবকে লইয়া ক্রীড়া করিও না প্রভো! অনেক খেলা খেলিয়াছি, আর খেলিবার বাসনা নাই। মায়াজাল বিস্তার করিয়া ভ্রান্তির অতলস্পর্শ সলিলে নিমজ্জিত করিও না দয়াময়! অধম দীন হীন অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকণা বিতরণ করিয়া মরুভূমি সদৃশ শ্মশান হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন কর প্রভো!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

চোখের দেখা।

লেখক—শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মিত্র।

যৌবনে।

বিমল যখন দেনার দায়ে বসতবাড়ী বিক্রয় করিয়া ঘোষেদের বাড়ীর পার্শ্বে আস্তানা লইল, তখন হেমনলিনীর বয়স ষোল বৎসর।

ষোল বৎসর বয়স শুনিলে অনেকে অনেক কথা জানিবার ইচ্ছা করে—দেখিতে কেমন—কি করে—বিবাহ হইয়াছে কি না ইত্যাদি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে হেমনলিনীর নিটোল গড়ন থাকিলেও রূপের সেরূপ ছটা

ছিল না, তবে সে রূপে মাদকতা ছিল এটা স্বীকার করিতে হইবে। এক কথায় হেমনলিনীকে সুশ্রী শ্যামবর্ণা যুবতী বলা যায়। সে সুগায়িকাও বটে।

যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হেমনলিনীর হৃদয়খানি শৈশবের স্বাধীনত্ব হারাইল এবং যৌবন ধীরে ধীরে তাহাতে নিজের অধিকার বিস্তার করিবার চেষ্টা করিল। অল্প দিনের মধ্যেই শৈশবের চপলতা, তাহার নিকট পরাজিত হইয়া হেমনলিনীর হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গেল—তাহার হৃদয় প্রণয়-দেবতার লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতি অঙ্গে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল, ভাবে ও ভাষায় গাম্ভীর্য্য দেখা দিল; নিতম্বদেশের গুরুতা প্রতিপদ বিক্ষেপে বিজ্ঞাপিত হইল, বক্ষের স্থূলত্ব তাহাকে ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন করিয়া দিল।

তাহার মন প্রতি মূহুর্ত্তে লালায়িত। কি যেন একটা অজানিত, অযাচিত প্রেমের আশায় তাহার মন সদাই পিপাসিত—কণ্ঠাগত। তাহার মন সদাই ধরা দিবার জন্য ব্যস্ত। প্রভাতের তরুণ আলোকরশ্মির মতন তাহার তরুণ হৃদয়খানি বিশ্বব্যাপী মিলন গীতের প্রতিধ্বনি দিতেছিল, মৃদুপবনে দূরাগত কোকিলের কুহুতান তাহার হৃদয়ে একটা মায়া রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিত, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া তৃষিত হৃদয়খানিতে অনেক বেদনার কথা জাগাইয়া দিয়া তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিত—কি যেন একটা পাইবার আশায় সে যেন সদাই 'আনমনা' থাকিত।

এমনই নবীন যৌবনে সে একদিন পাশের বাড়ীর বিমলকে দেখিল—মজিল—সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করিল।

তখন সন্ধ্যা। সূর্য্য, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণের চুম্বনের আশায় তখনও 'যাই যাই' করিয়াও যাইতে পারিতেছিল না। পবন তখন একটা রোমাঞ্চ লইয়া মানবের হৃদয় রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল। সেই সময় বিমল উদাস প্রাণে একদৃষ্টে ঘোষেদের বাড়ীর পানে চাহিয়া নীরবে ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিল। হেমনলিনী কাপড় কাচিয়া আর্দ্র বসনে ছাদের উপর হইতে শুষ্ক বসন লইতে আসিয়া বিমলকে দেখিল—চারিচক্ষের মিলন হইল—উভয়েই দৃষ্টি বিনিময়ের পর অন্যত্র মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু বেশীক্ষণ কেহই কোনদিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' বিমলকে দেখিয়া হেমনলিনীর মন নীচে যাইতে চাহিল না।

তথাচ সেখানেও থাকিতে চাহিল না, পাছে কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া সে আর বিমলকে দেখিতে না পায়। সে একবার মাথার কাপড়খানি লইয়া নাড়া চাড়া করিল কিন্তু তখনই আবার সেটা ভিজা আছে এরূপ ভাণ দেখাইয়া সেই ভাবেই রাখিয়া দিল। নিজের কাপড়খানি লইল কিন্তু সেমিজটী সামান্য আর্দ্র থাকায় সে সেটিকে দুই একবার বাতাসে নাড়িল। আবার তখনই সে কি ভাবিয়া সেমিজটি পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আলিসার অন্তরালে নিজেকে গোপন করিয়া এক-দৃষ্টে বিমলকে দেখিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ সেই ভাবে থাকিতেও পারিল না। অবশেষে দুই একবার ছাদের উপর এদিক্ ওদিক্ করিয়া সে মাথার কাপড় ও সেমিজটি লইয়া ও দুই একবার চুরি করিয়া বিমলকে দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বিমল এতক্ষণ পদচারণ করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে লোভ সামলাইতে না পারিয়া হেমনলিনীর দিকে চাহিতেছিল। এখন হেমনলিনী নীচে নামিয়া যাওয়ায় তাহার আর ছাদে থাকিতে ভাল লাগিল না। সেও নীচে নামিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে – হেমনলিনীর বিবাহ হয় নাই। অর্থের টানাটানির দরুণ—তাহার মাতা ও ভ্রাতা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলেন না। উপস্থিত ভগবানের উপর দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন কিন্তু হেমনলিনীর মুখ দেখিলে তাহাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, পাছে বাড়ীতে এতবড় আইবুড়ো কন্যা দেখিয়া কেহ কোন কথা বলে।

বেশ ভূষা সমাপন করিয়া তাহার ছাদে যাইবার ইচ্ছাসত্ত্বেও সে ছাদে যাইতে পারিতেছিল না। কেবলই তাহার মনে হইতেছিল, যদি বিমল তাহার মনের ভাব বুঝিয়া থাকে? অথচ বিমলকে আর একবার দেখিবার লোভও সে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না। শেষে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে যখন ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল তখন বিমল ছাদ হইতে নামিয়া গিয়াছে। শূন্য ছাদ দেখিয়া তাহার হৃদয় আরো শূন্যময় হইয়া দাঁড়াইল। তৃষিত চোখ চারিদিকে কি যেন পাইবার আশায় অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু কোথাও বিমলকে দেখিতে না পাইয়া হেমনলিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

রাত্রে সে বিমলের কথা ভাবিল। বিমলের সঙ্গে যদি বিধি মিলন ঘটাইয়া দেন – তাহা হইলে তাহার জীবনের একটা সাধ পূর্ণ হয়। কিন্তু সম্বন্ধ করে কে? হেমনলিনী প্রাণ থাকিতে নিজের বিবাহের কথা বলিতে পারিবে না।

হেমনলিনী যতই বিমলের বিষয় ভাবিতে লাগিল ততই তাহার মন বিমলকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে সে পুনরায় ছাদে আর্দ্র বসন মেলাইতে আসিয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিল – কিন্তু কোথাও কাহারও পরিচিত সাড়া শব্দ না পাইয়া ব্যর্থ হৃদয়খানি লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। সমস্ত দুপুর বেলাটি সে উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যার অপেক্ষায় অতিবাহিত করিল।

আলোক ও আঁধারের সন্ধিস্থলে সান্ধ্য গগণের তারার মতন সে যখন ছাদে আসিল তখন বিমল কাহার দর্শন আশায় ছাদের উপর বসিয়াছিল তাহা সেই জানে। বিমলকে সেই ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া লজ্জায় হেমনলিনী অন্য দিকে চাহিল কিন্তু বেশীক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। 'আড়' নয়নে ঈষৎ বক্রভাবে চাহিল; দেখিল বিমল তাহার দিকে চাহিয়া আছে কি না। বিমল হেমনলিনীর অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু সেই হাসি হেমনলিনীর বুকে এত তীব্র ভাবে আঘাত করিল যে সে লজ্জায় ছাদ হইতে নামিয়া গিয়া ঘরে শুইয়া পড়িল। বিমলও সুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পূর্ব্বাভাষ।

হেমনলিনীর পিতা সমকারী আফিসে বড় চাকরী করিতেন; মোটা বেতন ছিল সুতরাং তাঁহার সংসার খুবই সচ্ছল ছিল। তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র বি-এ, পাস করিয়া কিছুদিন ওকালতি পড়িয়াছিল কিন্তু এখন সাংসারিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া চাকরী লইতে হইল। তবে দুঃখের বিষয় উপাধি অনুযায়ী তাহার বেতন হইল না।

হেমনলিনীর পিতা তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীকে বিবাহোপযুক্তা রাখিয়া মারা যান। সে আজ ছয়-সাত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। সেই সময় হইতে সংসারের সমস্ত ভার ক্ষিতীশচন্দ্রের উপর আসিয়া পড়ে। কিন্তু তখন সংসারের ভারী বোঝা বহন করিয়াও ক্ষিতীশচন্দ্র সরস্বতীর আরাধনায় বিরত হইলেন না। কিন্তু এখন অংশবিভাগে বাৎসরিক আয় কমিয়া যাওয়ায় তাহাকে চাকরী লইতে বাধ্য করিল।

আই-এ, পরীক্ষার পরই তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ হয়। সেই সময় টাকার

যোগাড় করিতে না পারিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মাতার অনুমতি লইয়া বাড়ীখানি বাৎসরিক বার টাকা হারে সুদের বন্দোবস্ত করিয়া কোন এক মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট বাঁধা রাখে। অংশ বিভাগে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হওয়ায় ও তত্ত্ব-তাবাসে ক্ষিতীশচন্দ্র আজ অবধি মহাজনকে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে নাই। মহাজনও বাড়ীখানি পাইবার আশায় এতদিন কোন কথাই বলে নাই।

সুদে আসলে এখন অনেক টাকা হইয়াছে এবং ঐ টাকা সুদ সমেত দেওয়া ক্ষিতীশচন্দ্রের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। ক্ষিতীশচন্দ্র এই বিষয় লইয়া তাহার মাতার সহিত পরামর্শ করিল এবং অনেক জল্পনা কল্পনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে যদি বাড়ীখানি এই সময় বিক্রয় করে তাহা হইলে হেমনলিনীর বিবাহের সময় তাহাদের আর ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে না। হেমনলিনীর বাড় ও গড়ন দেখিয়া তাহার মাতা ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবে আশা করিয়াছিল তাহা পাইল না। বাড়ীর দর তখন অনেক কমিয়া গিয়াছে, মাড়োয়ারী ক্রেতারা জমী বেশী টাকায় আর কিনিতে চাহে না, কারণ ছয় টাকা হারের কোম্পানীর কাগজ বাহির হওয়ায় তাহাদের সুদ হিসাবে কম হইয়া যায়, এই জন্য তাহারা আর এ বিষয়ে তত মনোযোগী নহে। ক্ষিতীশচন্দ্রও আর বেশী দেরী করিতে সাহস করিল না, পাছে বাড়ীর দর আরো পড়িয়া যায়।

বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র এক মাসের সময় লইয়া অপর বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইল, কিন্তু কোথাও তেমন মনোমত বাড়ী পাইল না। একে অনুসন্ধানের সময় কম, তাহার উপর আবার মাসিক চল্লিশ টাকার ঊর্দ্ধে যাইলে তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে, সুতরাং অনেক অনুসন্ধানের পর যখন তেমন বাড়ী আর পাওয়া গেল না তখন ক্ষিতীশচন্দ্র পুনরায় মহাজনকে রাজী করিয়া আরো একমাস সময় চাহিয়া লইল।

বসতবাড়ী ছাড়িয়া তাহার মাতার কোথাও যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন অবস্থা বিপর্য্যয় তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর পুরাতন ভিটা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল।

আজ আফিস হইতে আসিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মাতাকে বলিল, "মা! অনেক খোঁজ করে তেমন বাড়ী ত পেলুম না, তবে আমার মনে হচ্ছে যদি সহরের বাহিরে যাওয়া যায় তাহা হ'লে কম ভাড়ায় ভাল বাড়ী পাওয়া যেতে পারে।"

তাহার মাতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"তুই ত বাবা সহরের বাহিরে যেতে বল্‌ছিস্, কিন্তু নলিনী আর দুর্গার বে না হলে আমি কোথাও যেতে পারবো না।"

হেমনলিনীর বিবাহের কথা উঠিবামাত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সে মাতাকে বলিল, "মা! নলিনীর জন্য একটী সম্বন্ধ পাইয়াছি। কলিকাতা সহরে বাড়ী আছে; অবস্থা নেহাত মন্দ নয়। ছেলেটী আমার সঙ্গেই কাজ করে। যদি ওর সঙ্গে বিবাহ হয়, তা হ'লে মন্দ হয় না। তবে আপনি যদি মত দেন তা হ'লে ওদের সঙ্গে কথা কই।"

"আমি কি বল্‌বো বাবা? তুই যা ভাল বুঝবি তাই করবি। তবে বোন্‌টি যাতে ভাল ঘরে পড়ে সেটাই কেবল লক্ষ্য রাখিস।"

"সে ত ঠিক কথা। নলিনীকে ত জলে ফেলে দিতে পারি না।"

তাহার মাতা নলিনীকে ক্ষিতীশ চন্দ্রের জলখাবার দিবার জন্য ডাকিলেন। হেমনলিনী ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন এ বিবাহের সম্বন্ধে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে মাতার আজ্ঞানুযায়ী ভ্রাতার খাবার আনিতে নীচে নামিয়া গেল। মাতা পুত্রে পুনরায় সেইভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

চিত্ত-জয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চৌধুরী

কোর্ট থেকে আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরছি, দূর থেকে দেখি বাড়ীর গাড়ীখানা সোয়ারী নিয়ে কোথা বেরিয়ে গেল, বুঝলাম মা বৌদিদিদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলেন; ফটকের ভেতোর পা ফেলতেই দোতলায় আমারই ঘরের খড়খড়ীটা হঠাৎ খুলে গেল, চেয়ে দেখি দুটা ডাগর কালো চোখে রক্তরাঙা পাড়ের আঁচল চেপে তরুই জানলা খুল্লে, আমাকে দেখেই সে সরে গেল, মনে হ'ল তরু কাঁদছে; আমি ঘরে ঢোকবার আগেই সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে

গেল। তার চোখ দুটোর দিকে তাকালাম সে দুটো তখনও ছল্-ছল্ করছে। সত্যিই তো তবে সে কাঁদছিল, কিন্তু কেন—কেন সে কাঁদছিল? বেড়াতে সে তো ইচ্ছে করেই যায় না। শত সাধ্যসাধনা করেও তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারা যায় না, এ অভিযোগ বৌদিদিরা কত হাজার বারই না করেছেন। তখন আমি শুধু এইমাত্র বলেছি, "তা ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো লোকে কোন কাজ করে না," তাতে তাঁরা কত উপহাসের হাসিই না হাসতেন। আমি ভাবতাম যায় না তো যায় না, তার না যাওয়ার কারণও বেশ ভাল করে উপলব্ধি কর্ত্তেও আমি পারিনি এতদিনে। আজকাল কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন উঠে। তখন বৌদিদিদের যে সব জবাব দিয়েছি সেগুলা আজ সত্যিই নিজের কাছে বড় অগোছ মনে হয়। এই কদিন তরুর কথাবার্ত্তার কাছে আমার রুদ্ধমনের বন্ধদ্বারে স্পন্দন লেগেছে, আর সেই কঠিন দ্বার খোলবার শত সাধ্যসাধনায় শত ঠেলাঠেলিতে কোমল নারীর বক্ষে বেজেছে বড় ব্যথা, আর সেই ব্যথারই ছবি বুঝি দেখলাম আজ ঐ ছলছল পাতার ভেতোর? মনে পড়লো আর একদিন যখন কোর্ট থেকে ফিরে জলখাবারের পর নিজেই ঘরে খাটে বসে রয়েছি, সামনের জানলা দিয়ে চোখ দুটো গিয়ে পড়লো সামনের ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ীখানার উপরে। পূর্ণিমার সাদা জোছনায় জড়ানো-সেই বাড়ীখানা দেখে মনে হ'ল জোছনা যেন জমাট বেধে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারেক মাত্র, এখনি সে চলে যাবে কোন অজানার পথ ধরে কোন অসীম দেশের শুভযাত্রায়, শুধু আমারই মনে জাগিয়ে রেখে যাবে একখানি ব্যর্থতার ছবি। তখনি ফুটে উঠলো মনে কুসুমের বুক চেরা লালের আভায় রাঙা হয়ে ওঠা একগোছা সোণালী চাঁপা ফুলের মত একখানি মুখ, নির্ম্মেঘ সন্ধ্যাকাশের শুকতারার চতুঃপার্শ্বের নীলের মত দুটি ভাসা চোখের নীল, আর তাতে শান্ত সাগরের প্রশান্ত বুকের তিলেক উচ্ছ্বাসের মত ঈষৎ চকিত চাহনি, মনে বেজে উঠল সপ্তসুরের ঈষৎ ঝঙ্কার দোয়া আকাশের দীর্ঘপথ ধরে নামতে ক্লান্ত সপ্তলোকের জলতরঙ্গের মধুর উচ্ছ্বাসভরা ভীত প্রার্থনার মত ছোট একটি কণ্ঠের সুর অতি ক্ষীণ—

"মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদে বেদনায়
অর্পিনু হাতে তাঁর, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই—"

মমতারা যেদিন চলে যায় সেদিনকার ঐ গানটি এখনো আমার কানে ঠিক সেই সুরেই বাজে সারা দিবস রজনী। চোখে আমার বুঝি দু'ফোটা জল এসেছিল, তাই "না আর

ভাববো না" বলে মুখ ফেরাতেই সেই জানলারই পাশের দেওয়ালে টাঙ্গানো ফটোটার উপরে চোখ পড়লো, তাতে আমারই কাঁধে হাত দিয়ে তরু দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে ছবিখানা বিয়ের পরদিন গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থাতেই জোর করে বন্ধু আবীর তুলেছিল। কতখানি বিশ্বাস তরুর চোখে যে, নিরাশ্রয় সে আশ্রয় পেয়েছে বিপদের অতীত রাজ্যের রাজকুমারের পাশে। ভিজে চোখের পাতা ছাপিয়ে আমার জল এলো, পাশের আয়নায় চোখ পড়লো, দেখি তরু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি করুণ মুখ তার! আয়নার ভেতোর দিয়েই তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'বামাত্রই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অতি দ্রুত। তখন তাড়াতাড়ি একখানা কেসের কাগজ নিয়ে টেবিলের কাছে বসতেই বৌদি এসে বল্লেন "কি গো! খেতে হবে না? কি কেসের কথা অত ভাবা হচ্ছিল যে তরু আধ ঘণ্টা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফিরে গেল, যে কি ভাবচ, ডাকলে যদি রাগ করো। এস বাপু, খেয়ে নিয়ে তারপর যা হয় কর গিয়ে।"

সে দিন খেয়ে এসে ঘরে শুয়েছি, তরু ঘরে ঢুকে তার বিছানায় যাবার আগে বল্লুম "তরু এলে? খাওয়া দাওয়া চুকলো?" সে "হ্যাঁ" বলে বল্লে, "যাই আমি মার কাছে একটু বসিগে।" বলেই সে চ'লে গেল। তারপর কতক্ষণ বাদে আমি ঘুমিয়েছি, কিন্তু তখনো সে আসেনি।

এই রকমে কদিনে বেশ বুঝতে পারছি যে সে আমার সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু কেন যে, তাওতো একদিন ধরা পড়েছে—আমার ব্যথা কোথা তা সে বেশ বুঝেছে! কারণ আর একদিন আমি খাওয়া সেরে শুয়ে রয়েছি, সে দরজা বন্ধ করে শুতে এসে তার বিছানায় যাবার আগে আমার ঘুমন্ত মুখের দিকে কতক্ষণ যে তাকিয়ে ছিল আমি জানতে পেরে চোখ খুলতেই সে একটা কাজের অছিলা করে বেরিয়ে গেল "আসছি" বলে, সে দিনও তার আসার আগে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমার কথার জবাব দিতে গেলে সে যেন হাঁফিয়ে উঠে কত অগোছ করে ফেলে তার জবাব, কারণ এর আগে সে তো বিশেষ কথা কইতে পায়নি আমার সঙ্গে। তা' থেকে আমি যে নির্ম্মমভাবে তাকে বঞ্চিত করে রেখেছিলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে তবে কিসে তার সকল ব্যথা দূরে সরিয়ে রেখে আমি যে আনন্দময় আশার আবেগে বাইরের ভেঙ্গে যাবার আনন্দের পানে চেয়ে রয়েছি সেই আনন্দ দিয়েই আমায় ভরিয়ে রাখতে চায়। তার বক্ষকমলের সকল দল আমার পায়ের কাছে উজাড় করে দিয়ে সে আমায় পূজা কর্ত্তে

চায়, সে কমলের সৌগন্ধের ভার লুকিয়ে রেখে তার নিজেরই মাঝে ?

মমতাকে ভুলতে পারা কঠিন কিন্তু তাই বলে আমার বুক জড়িয়ে বেঁচে বিকশিত হবার অধিকার যে তরুলতাকে দিয়েছি, মা বাবার আদেশ মাথায় করে—ধর্ম্ম সাক্ষী মেনে,—তাকে ছিন্ন করবার অধিকার ত আমার কোন মতেই নেই। এমনি কত কি ভেবে যাচ্ছি, এমন সময় "কি এখনও পোষাক ছাড়া হয়নি ? জুতোও যে ছাড়া হয়নি", বলে দমকা হাওয়ার মত এসে সে জুতোর ফিতে খুলতে আরম্ভ করলে, পায়ের দিকেই নামিয়ে রেখে তার মুখখানা। তাকে মানা করবার সময় পেয়ে তার দিকে চাইতেই চোখ পড়লো তার ঘাড়ের উপর। মাথার কাপড়টা বুঝি তার অজান্তেই পড়ে গিয়েছিলো; জমাট সাদা ঘাড়ের উপর কয়েকগাছা এঁকাবেঁকা ভ্রমরকালো চুল গড়িয়ে পড়েছে কি ভীষণ রক্তরাঙা পাড় তার মিলের কাপড়ের! তখন মনের ভেতর আমার যে কথাটা বুকফাটা কান্নায় চীৎকার করে উঠছিলো, তাকে চোখ রাঙিয়ে ভুলিয়ে রাখবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অঙ্গুলি হেলন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠে তরুর দিকেই নির্দ্দেশ করে দিলে। ভাবনাগুলো আমার কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল; আনমনে তরুর ঘাড়ের কাছের চুলগুলোয় একবার খপ করে হাত পড়ে গেল। আমার হাতের স্পর্শে তার সারা শরীরে যা শিহরণ উঠেছে, আমিও তা স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার অঙ্গুলির ভেতর দিয়ে। কি ত্রস্ত সে চমক ! তাড়াতাড়ি মাথার ওপর কাপড়টা টেনে দিয়ে সে একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, কি কঠিন—করুণতাকে গলা টিপে মেরে কঠিন করা সে দৃষ্টি ! একটু আগে কিসের যেন সাড়ায় ঘুমন্ত চিত্ত আমার সজাগ হয়ে উঠেছিল; আর সকল তন্দ্রা ঘুচে গেল এখন। একি আচরণ এ নারীর! আমি বল্লুম "তুমি কাঁদছো কেন ?" জুতাটা পায়ের থেকে টেনে সে বল্লে "কই না ত,—ইজের খুলে মুখ ধুয়ে এস, আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলেই সে চোখের জল লুকিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি ডাকলাম "শোন তরু"। "আসছি আমি" বলে সে বেরিয়ে গেল। অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরে পড়লো তার আঁখি পথে।

চেয়ারের পরে বসে পড়লুম। বুকের পরতে পরতে কিসের যেন একটা ব্যথা বেজে উঠলো এই যে, এই নারীকে তার সকল ন্যায় দাবী থেকে বঞ্চিত করে রেখে দিয়েছি এই একটা বছর ধরে, একটা দিনও কিন্তু তার কণ্ঠে বেজে ওঠেনি কোন বাসনার সুর!—চোখে তার দেখিনে দৃষ্টি কোন আকাঙ্ক্ষার।

তার দাবীটাকে সে আমার দান বলে মাথা নুইয়ে এসেছে এতদিন. তাও সে গোপন রাখতে চেয়েছে কত বেদনার চেষ্টায়। তাই আজ মনে হচ্ছে তার কাছে যে অপরাধ করেছি বুঝি তার মার্জ্জনা নেই।

মমতাকে ত ভুলতেই হবে, তাতে তারও শুভ আর আমার তরুরও মঙ্গল, আর আমার ? তা যা হয় হোক। না, তাকে ভুলবো, তার শেষ চিঠি এসেছিল আমাদের বিয়ের পর. তাতে সে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেছে।

তরু! তোমার কাছে মস্ত বড় যাচিঞা নিয়ে দাঁড়াবো, তা তোমাকে মঞ্জুর করতে হবে! তুমি যে অনেক সহ্য করেছো—তাই আরও সহ্য করতে হবে তোমায়। আমার এ জীবন ধন্য করতে, মমতার জীবন পুণ্যপবিত্র করতে তোমারই পরশমণির প্রয়োজন।—দুয়ারটা ন'ড়ে উঠলো,—"এই যে মা ! কখন এলে ? আজ কোথা বেড়াতে গেছলে ?"

"আজ বৌমাদের নিয়ে একবার তোর মামার বাড়ী গিছলুম ; আচ্ছা নিতু ! দুঘণ্টা ধরে হাঁ ক'রে কি ভাবচিস, খাবার সময় হ'ল না ; ছোট বৌমা বল্লে দু'বার খাবার এনে ফিরে গিয়েছে। আজ কি কারো মকদ্দমা হারলি নাকি ?" আমি একটু হেসে বল্লুম "না মা আজ নিজের মকদ্দমা জিতলুম, নিজের চিত্ত'বাবুর কেসটা—বলেই উঠে তোয়ালে নিয়ে মুখ ধুতে গেলুম।

পাণ্ডব নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

তৃতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসভা।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও ধৌম্য।

যুধিষ্ঠির। ভাই ধনঞ্জয়! হেরি সব শূন্যময়,
বিনা পাণ্ডবআশ্রয় কৃষ্ণ নারায়ণ।
মম বাঞ্ছা নিরবধি ভক্তিডোরে বাঁধি,
রাখি ঘরে জনার্দ্দন বিপদ ভঞ্জন,—

শ্রীমধুসূদন যুগল চরণ ধরি—
যেই পদ স্মরি' ঘোর সংসার সাগরে
নিত্য তরি ত্রিপুরারি বাঞ্ছিত যে ধন ;
সেবি যায় প্রসবিলা মানস কমলে
বিশ্বস্রষ্টা পদ্মযোনি ক্ষীরোদবাসিনী,
জনমিলা যাতে দেবী কলুষনাশিনী
সুরধুনী ব্যোমকেশ-জটা-বিহারিণী।
আমি ক'রেছি কি পুণ্যকর্ম্ম, নিজপুরে
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে পূজিবারে নিরন্তর ?
এবে যজ্ঞেশ্বর হরি, যজ্ঞ পূর্ণ করি
দ্বারকায় করিলা প্রয়াণ ; মাত্র ধরি
যেন জড় দেহ, গেছে প্রাণ কৃষ্ণ সনে।
কতবার কেশবে বিদায় দিছি, কিন্তু
আজি না জানি কি হেতু কেমনে বিকার !
শুন ভাই ! সাম্রাজ্যপালন মহাভার
দিলা শিরে হরি ; কি শকতি ধরি আমি
একা, কি করিতে পারি ? সম্বল কেবল
সত্যে নারায়ণে মন, বল তোমা চারি
জন ; এ ভ্রাতৃরতন বহু পুণ্যফলে পাই।
ভাই ! ভাইরে অর্জ্জুন ! "শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন
অভেদ" কহেন পিতামহ ! ভীম মোর
দুষ্ট জন যম সদা শিষ্টের পালনে—
সাম্রাজ্য শাসনে দক্ষ, থাকি ন্যায় পক্ষ
দুরাচারে দণ্ডদানে কদাচ কুণ্ঠিত ;
সংসারে বিদিত যেই রাখিতে আশ্রিত,
চক্রধরে না ডরিল ; দণ্ডীরাজে কভু
না ত্যজিল, সবা হ'তে ভাবিল ক্ষত্রিয়-
ধর্ম্ম সার ; যৌবরাজ্য শাসিবার যোগ্য
একা বৃকোদর ; সদা তাহে হৌক দোসর,
নকুল সুদক্ষ তাহে প্রকৃতি রঞ্জনে।

সহদেব সর্ব্বগুণে মণ্ডিত পণ্ডিত,
ধর্ম্মজ্ঞ সুবীর রণে, নীতিজ্ঞানবৃদ্ধ
সিদ্ধি-বুদ্ধি-মন্ত্রণা-বিগ্রহে। সবে মিলি
কর হেন যাহে রহে চন্দ্র বংশমান।
আপন শক্তিতে আমি কত বলীয়ান ?

অর্জ্জুন। কেন দেব ! আপনারে হেন অল্পজ্ঞান ?
পাণ্ডবপ্রধান হর্ত্তা কর্ত্তা পাণ্ডবের—
উত্তমাঙ্গ যথা, যাহে আত্মা অধিষ্ঠান ;
হস্তপদ মোরা চারি, অবিরত আজ্ঞাকারী,
না বিচারি তব কর্ম্ম নাহি করি আন ;
তব বাক্য বেদের প্রমাণ, ধর্ম্মরাজ !
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি, তব ইচ্ছা ধর্ম্ম
বলি মানি, মহাজ্ঞানী ন্যায় মূর্ত্তিমান্ !
তব ধর্ম্ম বলে বলী দুর্গম দুস্তরে
তরি, ধরি করে হেলে ধরণীর ভার !
ইন্দুকুলে তুমি নাথ ! ধর্ম্ম অবতার
প্রচারিতে প্রপীড়িত ভারতে দ্বাপরে
ধর্ম্মের শাসন ! তব প্রেমের পালনে
নাহি নাথ ! নাহি আর দীনের বেদন,
দেব দ্বিজ গোধন হিংসন, বিনা দোষে
দুর্ব্বল পীড়ন, পরস্বহরণ নিত্য—
জিঘাংসা বিগ্রহ স্বেচ্ছাচার ; নাহি আর
অগ্নি ব্যাধি ভয়, সদা নিজগৃহ শঙ্কার
নিলয়, পৃথ্বীময় ভ্রমে খল ঈর্ষা
ভয়ঙ্করী, করি সাথে করাল বিগ্রহ ;
অত্যাচার নাহি আর, পরস্ত্রীহরণ
বলাৎকার ব্যাভিচার অকাল মরণ,
ইষ্টকে পোষণ বলে শুষ্ককে শোষণ
ফলে অন্ন বিনা হাহাকার ! সে দুর্দ্দিন
নাহি আর বসুমতী জীর্ণা শীর্ণা যেন

প্রাচীনা শ্রীহীনা ! হের এবে হাসে সতী
শ্যামলবসনা বহুপুণ্যা চিরধর্ম্ম-
সোহাগিনী-দিব্যাঙ্গনা দেব পাশে যেন।
যজ্ঞ ধূমে আচ্ছন্ন গগন, সাম গানে
পূত দিগঙ্গন, সদয় মেঘবাহন,
দিক্‌পাল সনে যেন অমৃত সিঞ্চনে
বাঁচাইলা বসুধারে সর্ব্ববস্ত্রে বিভূষিতা
যেন স্নেহের দুহিতা সমর্পিলা তব করে।
সপ্তমহাদ্বীপা অবনী উপরে, আজি
ঘরে ঘরে গহনে গহ্বরে আনন্দ
উৎসব, মুখে "জয় ধর্ম্মরাজ" রব,
সুখে ভাসে সর্ব্বজন ! দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য
শূদ্র আদি, ম্লেচ্ছ বনবাসী কিরাত অবধি
অভাব কেমন নাহি জানে ! হে পাণ্ডব—
নাথ ! তব দানে দরিদ্র না রহিল ভারতে,
শান্তি পূর্ণ সোণার সংসার ধনে ধান্যে
ন্যায় মান্যে অপূর্ব্ব মিলন, সুখে গায়
জগজ্জন, ধন্য ধন্য পাণ্ডুরনন্দন
ধর্ম্মবান যুধিষ্ঠির ভারত ঈশ্বর।
আমরাও ধন্য দেব ! তোমার কিঙ্কর।

(ইন্দ্রসেনের পশ্চাৎ ব্যাসের প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় ধর্ম্মরাজ !
দেব ! সমাগত সভায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন ! (প্রস্থান)

যুধির। পিতামহ ! ভাগ্য মানি হেরিনু চরণ !
নাহি জানি, কেমনে পূজিব, কোন্ ধনে,
পাণ্ডব বৈভব নহে তুল, পঞ্চজন
মোরা তব আপন সন্তান আজ্ঞাকারী।

ব্যাস। হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! তুমি ধর্ম্ম-অধিকারী
ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে। ভাগ্যক্রমে
লভিলা সাম্রাজ্য অসীম বিস্তার, কুরু-
অধিকার মহতী-উন্নতি-যুক্ত ; কুরু
নাম তোমা হ'তে হ'ল সমুজ্জ্বল !
আসিলাম হ'য়ে নিমন্ত্রিত ; তব পুণ্যে
পূর্ণ মহাযজ্ঞ, এবে যাই তোমা করি
আমন্ত্রণ, আশীর্ব্বাদ।

যুধি। ভগবন্ ! মাত্র তব চরণ প্রসাদে
অপ্রমাদে মহাক্রতু হইলাম পার।
কি পুণ্য আমার যার বলে তরি তায় ?

ব্যাস। বৎস ! তব পুণ্য কহনে না যায় ;
যজ্ঞেশ্বর হরি মহাচক্র ধরি'
ব্রতী বাসুদেব কৃষ্ণ যজ্ঞের রক্ষায় —
যাঁহার কৃপায় শতক্রতু পুরন্দর,
বিশ্বযজ্ঞে যে অচ্যুত একা অধিকারী,
মধুকৈটভারি হরি কেশব কংসারি
পাণ্ডব প্রেমেতে বাঁধা গোলোকবিহারী
দুষ্ট দর্পহারী জনার্দ্দন : যে নাম স্মরণে
ছাড়ে স্থান যজ্ঞ-ধর্ম্ম-হিংসাকারী জন,
বিশ্বহর বিশ্বের পালন যেই বিভু
আদি লক্ষ্য পুরুষ প্রকাশ পূর্ণ অংশে।
বৎস ! ইন্দুবংশে তব সম ভাগ্যবান
না হইল কেহ।

যুধি। পিতামহ ! যজ্ঞ সূচনায় ত্রিকালজ্ঞ
দেবর্ষি নারদ আসি' কহিলা আমায়—
দিব্য আন্তরীক্ষ পার্থিব ত্রিবিধ বিঘ্ন
প্রত্যক্ষ হইবে রাজসূয় আচরণে।
ভাবি তাই মনে শিশুপাল বধে কিবা
সর্ব্ববিঘ্ন হইল তিরোধান ? ভগবন্ !

একান্ত বাসনা জানিতে স্বরূপতত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্ব ঐশিকরহস্য বিশ্বলীলা
দৃশ্য বা অদৃশ্য সব তোমার গোচর।

ব্যাস। রাজর্ষিপ্রবর!
সন্দেহ তোমার সত্য! সেই
উপদ্রব ত্রয়োদশ বর্ষ স্থায়ী হবে,
তবে তদুদ্দেশে ভীমার্জ্জুন বাহুবলে,
কালে দুষ্ট ক্ষত্রকুলে হ বে সংহার।
ভূমি-ভার-বিমোচন এ যজ্ঞের ফল।
হে রাজেন্দ্র! স্বপ্নে তুমি হেরিবে মহেশে,
ত্রিপুরান্তকারী পিনাক-ত্রিশূলধারী,
মহাবৃষ পৃষ্ঠে একদৃষ্টে চাহিছেন
মৃত্যু-পতি-অধিষ্ঠিত দক্ষিণাভিমুখে।
ঈদৃশ দর্শনে বৎস! হ'ওনা বিমনা;
কেন না কেহ না পারে কালে নিবারিতে
সদা স্থির চিত্তে নীতিনির্দ্দিষ্ট নিয়মে
পালহ প্রকৃতিপুঞ্জে পুত্রের সমান।
বৎস! হৌক্ কল্যাণ সর্ব্বে!
যাব এবে কৈলাস-অচলে। (প্রস্থান

যুধি। ভাই!
সবে কি শুনিলে, কি বলিলা মহামুনি?
অলঙ্ঘ্য সে বাণী, মিথ্যা কভু না হইবে,
ফলিবে সে অদৃষ্টঘটন; কি কারণে
তবে ধরি এ জীবন! হতভাগ্য আমি
মাত্র নিমিত্ত কেবল হইলাম শেষে
ক্ষাত্রবংশধ্বংস মহাপাপে; ঘোর তাপে
দহে হৃদি; হায়, হায়! হব জ্ঞাতি বধী!
ধিক্ ধিক্—দেহভার দিব বিসর্জ্জন।

অর্জ্জুন। হে রাজন্! ভ্রংশ কর মহামোহে;
আচ্ছন্ন যে জন তার সদা হয় ভ্রম;

কদা মহান কর্ত্তব্য ধর্ম্ম না পারে বুঝিতে।
এ ভারতে ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে রাখানে,
স্থির চিত্তে রাজ ধর্ম্ম করহ পালন!

ভীম। হে রাজেন্দ্র! সত্য ধর্ম্মের হিংসন সদা
করে যেইজন, রাজা! হেন দুষ্ট জন
শত্রু মধ্যে গণি। ক্ষত্র ধর্ম্মে বৈরী হানি,
রাজ ধর্ম্মে দুষ্টে দমি' ধর্ম্মের রক্ষণ,
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। অপধর্ম্ম অন্য সেবা আর।
ভাল, হইনু কারণ হরিতে ভূমির ভার,
তোমায় যে হিংসে জানি শত্রু সে আমার।

যুধি। শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার, সাধ্য কার
কেবল পুরুষকারবলে বা কৌশলে,
লঙ্ঘিতে সে দৈব শক্তি? জানিও তথাপি,
আজি হ'তে জ্ঞাতি ভ্রাতৃপুত্র প্রজাগণ,
কি ভূপাল ভিক্ষুক্, কি মহৎ ইতর,
কারে কভু পরুষ বচন না কহিব;
সম-ব্যবহার করিব সবার প্রতি।
গুরু, বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সবার নির্দ্দেশ মতে
চলিব, করিব যোগ সাধন; তা হ'লে
ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না, সুহৃদ্ ভেদ
হ'তে জ্বলে রণানল; বিগ্রহ বর্জ্জিব
শান্তি নীরে, তুষিব সবারে প্রীতি দানে।
তবে সে সাম্রাজ্য স্থলে নিন্দার্হ নহিব।
এ নীতি পালিব ত্রয়োদশ বর্ষকাল।
কহি ভাই!
কল্যাণে সবার যদি ধর্ম্মে দৃঢ়মতি,
সত্য না লঙ্ঘিব কভু পাণ্ডব সন্ততি।

অর্জ্জুন। তব সত্য, সত্য পণ, পণ পাণ্ডবের
ধর্ম্মের চরণ বিনা নাহি অন্যগতি।

ভীম। ধর্ম্ম আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি!

নকুল। চিরদোসর কিঙ্কর হে পাণ্ডবপতি !
সহ। ধর্ম্মরাজ সেবা বিনা নাহি অন্য গতি।
যুধি। দেখ ভাই ! সম্প্রতি কৌরব সম্ভাষণ-
যোগ্য সুসজ্জিত হ'ল কিনা সর্ব্ব ঠাঁই।
বড় অভিমানি মানি ভাই দুর্য্যোধন,
রাজার লক্ষণ নীতি ব্যবহার জ্ঞানে
তার সম অন্য নাই। যেন কোনমতে
নাহি ঘটে হয় যাতে বিরাগ কারণ।
সহ। যোগ্য আয়োজন হইয়াছে বহুক্ষণ।
যুধি। চল তবে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ - তোরণ-দ্বার।

সহদেব ও ইন্দ্রসেন।

সহদেব। কৌরবের রাজ-সন্দর্শন সমাপন হইল।
অতঃপর আগুসার কর ইন্দ্রসেন !
যেন গীত, নাট্য, নর্ত্তন উৎসব—
যথারীতি হয় সব প্রধান কৌরব
মাতুল গান্ধার সনে বিহারিবে
সভাতলে, সতর্ক রহিবে সর্ব্বজনে।

(প্রস্থান)

ইন্দ্র। জয় ধর্ম্মরাজ, ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে !

(প্রস্থান)

(দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। আরে, তোরে বল্লুম, এরা ঝাড়বে আসি হাড়গিলে চীৎকার ! শুন্‌লিত, ও ছোঁড়াগুলো গাইছে কেমন মজার মজার ! চল ভাই, শুনিগে আবার !

২য়। আরে, তুইতো দেখ্‌চি ভারি হ্যাপাদার ! আজ যদি বা পেলেম ছুটী, মনে কল্লেম—একটু রস চড়িয়ে, বিছানায় শুয়ে মজা লুটি ! দেখে দেখে গেল চোক ফেটে, তবু করচেন মারকুটী !

১ম। বাবা ! তোমার সব তাজ্জব ব্যাপার ! ক'দিন খেটে খেটে, হাড়গুলো গিয়েছে ঘেটে ঘেটে, না হয় কেঁদে কেটে আর দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে ওখানে, শুনলেন একটু মোলাম সুরসার !

২য়। আরে, তোরত দেখচি ভারি আবদার ! বল্‌লেম, চল্ দেখি সোঁ সোঁ, তা কথাত শুন্‌লিনি, এখন নাকে মুখে ছোট, ঐ ডাকচে পিছে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—আসছে রাজা দুর্য্যোধন !

১ম। না, এইবার দেখছি বাবা পালাবার উপক্রম। এখন দাঁড়াই কোন্‌খানে ?

২য়। যম জানে।

১ম। দেখ বাবা, এ রাজার সরঞ্জামটা খুব জাঁকাল রকম।

২য়। আমাদের যেমন দয়াল প্রভু ! এর মেজাজটা সদাই গরম গরম।

১ম। হ্যাঁ খুড়ো। ওর সঙ্গে কেটা ও বুড়ো ?

২য়। আরে জানিস না ছোঁড়া, ও যে রাজার মামা, রাজপুত্র শকুনী।

১ম। রক্ষা কর মা, নাম কাজ নেই শুনি, দেখি সদাই বুড়োর ভিটির ভিটির বকুনি—সাচ্ ব'লব বাবা। অত-তত বুঝিনি ঃ—উনি চেপেছেন যার ঘরে, তার ভিটেয় শীগ্‌গির ঘুঘু চরে।

২য়। আরে চুপ ছোঁড়া, লাগবে আগুন একটু শুন্‌লে পরে।

১ম। বাবা ! নে যা আমায় ধ'রে, ওর সামনে বলব, সত্যি বলচি খুড়ো, না হয় শির যাবে, ভিক্ষে মেগে খাব। সত্য বলব, ওর চেহারা যে খোসখাৎ, শনির দৃষ্টে আছে পার, ওঁর দৃষ্টিতে সদ্য নিপাৎ। কাজ কি বাবা। আমরা গরীবের ছেলে তফাৎ—তফাৎ—

(উভয়ের প্রস্থান)

(পট-পরিবর্ত্তন)

বিভ্রম আগারের সম্মুখ।

(বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ)

(গীত)

গাও কৌরব-কীর্ত্তি-কুমুদ-পরকাশক
নায়ক শ্রীহস্তিনাধিপতি।
জয় অরাতি-গর্ব্ব-সতত খর্ব্বকারক,
প্রকৃতিপালক মহীপতি॥
জয় ভারতকুল-দীপ ধুরন্ধর,
প্রখর-কিরণ যথা দিবাপতি।
জয় ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধন নৃপবর,
নৃপতিনিকর করে যারে নতি॥

(বন্দীদ্বয়ের প্রস্থান)

(দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। দুর্য্যোধন!
কেন বাপু, বিরাগ লক্ষণ তব হেরি?
ধর্ম্ম-অধিকারী, বহুমান করি তোমা
(অন্যের দুর্ল্লভ) দিল উচ্চ আলিঙ্গন,
বসাইল সিংহাসনে আপন দক্ষিণে।

দুর্য্যো। হা মাতুল, দুঃখ—
সেইক্ষণে—যে আগুনে অন্তর দহিছে
কেননা উঠিনু জ্বলি অগ্নিস্তম্ভ সম?
স্পর্শে যেই—ভস্ম করি তায়, হই ভস্ম
আপনার তেজে। তুচ্ছ দক্ষিণ আসন!
চির বৈরী মাথে পদ না করি অর্পণ

ছার প্রাণ ধরে দুর্য্যোধন! অতঃপর
দাসাসন তার পক্ষে নহে তিরস্কার।
যেই বিষ ক'রেছি আহার,
যদি পারি শতগুণে করিতে উদ্গার
ভীষণ জিঘাংসা হলাহল,
দহিতে প্রবল শত্রু—
পুরী রাজ্যখণ্ড বন্ধু বান্ধব সংহতি,
তবে জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ!
হায়! হস্তীনার মান গেল আমা হ'তে!

শকুনি। দুর্য্যোধন! শুন সার হিতে—
চাহ যদি সেই মত উদ্গারিতে,—
জঠরে রাখিতে যত্ন কর কতকাল।
প্রথম উদ্যমে বিক্রম বিফল হ'লে,
বটে, ঘটে শেষে আপন সংহার।
মিত্র ব্যবহার কর রক্ষা শত্রুর সংহতি।
মহাজনবাক্য শাস্ত্রনীতি,
সম্প্রতি কর আশ্রয়:—
অতি ক্রোধে মন্ত্র নষ্ট হয়,
না রয় গোপন কথা শত্রুর গোচরে!
গুল্ম পাতা বৃথা যথা সতর্ক রক্ষিলে।

দুর্য্যো। রহিব এ হীনভাবে কতদিন তবে?

শকুনি। বাপু!
অচিরে না হয় পরলক্ষ্মী করতল—
একদিনে না আসে সে নারিকেলে জল
পশি চল রত্নময় বিভ্রম আগারে।
লেখাদ্বারে—
"ক্রূরমতি নষ্টগতি যদি প্রবেশিবে—
কদাচিৎ নির্গমের পথ নাহি পাবে।"
রত্ন পরীক্ষায় তব যোগ্য নাহি কেহ,—
যুধিষ্ঠির কহিলা সভায়,

প্রমাণ পাইবে তার।
চল দোঁহে ভাঙ্গিব রহস্য,
কহিবে সে তথ্য তুমি পাণ্ডবপ্রধানে,
প্রাণে তা'র সন্দেহ না রবে তব প্রতি।

দুর্য্যো। মাতুল! সম্প্রতি—
একা পাণ্ডব অতুল রহস্য
রহিল এ ভারতভুবনে।
না দেখিলে ভীমে হোথা? আমা দোঁহে চাহি
নকুলের সনে নয়নে নয়নে যেন
প্রকাশিল, জিনিল কৌরবে এতদিনে।
ততোধিক গর্ব্ব সে অর্জ্জুনে, দ্রোণ-প্রিয়-
শিষ্য-ভাণে সর্ব্বজনে তৃণ হেনভাবে।
যুধিষ্ঠির আর নহে চীরধারী
শত-শৃঙ্গ-চারী-তপস্বী-আচার, এবে
ধর্ম্ম অবতার দয়ার আধার।
সহাস্য আস্যে যবে আলিঙ্গন দিল, প্রকাশিল—
যেন পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমিল আমার।
হায় রে! সবার কৃপাপাত্র আমি দুর্য্যোধন!

(সহদেবের প্রবেশ)

শকুনি। হের হোথা মাদ্রীর নন্দন।
দুর্য্যো। কি সংবাদ পুনঃ কহ হে ধীমান্?
সহ। মহারাজ! আছি তব আজ্ঞা অপেক্ষায়,
অনুগামী ধর্ম্মের আদেশ মতে।
দুর্য্যো। ভাই! আছি আমি পরম পিরীতে, কহ তারে
নহে অন্যস্থান—সহ পাণ্ডবপ্রধান
তোমা সবে অন্য ভাবে নাহি করি মনে,
একসূত্রে গাঁথা সমুদয়।
শকু। সত্য বটে, কৌরব পাণ্ডব ভিন্ন ন...

এ ভারতময় আজি তোমা সবাকার
যশো-কীর্ত্তি-বাণী হ'লো অসীম বিস্তার।

সহ। একা যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্ম অবতার,
কীর্ত্তি তাঁ'র ত্রিলোক ব্যাপিল,
জানিল অমর মরে, স্থান কোথা মো সবার?
কার্য্য নীতি তাঁর আদর্শ ভারতে।
তবে হইনু বিদায়।

(প্রস্থান)

(রাখাল বেশে বালকগণের প্রবেশ ও

গীত।)

প্রেমের রাজা আমাদের কানাই,
প্রাণের কানাই বই আর জানি না—
মোরা প্রেমের প্রজা প্রেমের সেনা,
প্রেমের দানে আছি কেনা,
প্রেমে দিতে রাজি, বলে দেবরাজেরে মানিনা॥
প্রেমে রাখি ধেনুর পাল,
প্রেমে গো-পালে গোপাল,
কন সকাল বেলা রাখালরাজে গোঠের মাঝে হেরি না?
প্রাণের কানাই ব'লে ডাক্‌রে ভাই।

(গীতান্তে সকলের প্রস্থান)

(মায়াকন্যাগণের প্রবেশ ও
গীত।)

সুষমাধার যত সাকার মূরতি মায়ার
কি তার সার।
মোহিনী ফাঁদে পড়িয়ে সাধে সদাই কাঁদে
সে নিরাকার ॥
ভ্রম বিলাস যে করে আশ, হৃদি বিকাশ হয় কি তার।
বুঝে বুঝ না কি গুণপণা প্রাণ বাঁধ না দেখি আবার ॥

দুর্য্যো। গোপনাট্য নৃপতি সভায়! সঙ্গদোষ
কদাচ এড়ায় সাধুজন,
তাহে কুন্তীর নন্দন রাখাল সংসর্গে।
অথবা সে কুলশীল আচার বিচার
দোঁহার সমান। হা মাতুল! দহে প্রাণ,
কৃষ্ণপুত্রে লক্ষ্মী করিতে হ'ল দান!
কন্যার বয়ান হেরি নাই সেই হ'তে,
ভারতে অপমান অবশ রহিল মোর।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রীভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

প্রথম অঙ্ক।

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

অর্জ্জুন। (শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদস্বরে) হে দামোদর! এতদিন আমি তোমার সূক্ষ্মতম স্বরূপ জানিতে পারি নাই, তোমার

প্রসাদে অদ্য আমার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইল। তোমার নাম শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক পরমানন্দ লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মানবগণ তোমার আরাধনা করে, তাহার প্রকৃত কারণ অদ্য আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তুমি জগৎ সংসারের আদি পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মারও প্রপিতামহ। হে অনাদি! বিশ্বরূপ, তুমিই ত্রিলোকের একমাত্র আশ্রয়। হে কৃষ্ণ! অজ্ঞানে তোমাকে চিনিতে না পারিয়া কখন কখন আমি তোমাকে উপহাস করিয়াছি, কখন বা তিরস্কার করিয়াছি, সখাভাবে সদয় হইয়া আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে সর্ব্বেশ্বর! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজোময় বিশ্বরূপ অবলোকনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর বিরাটরূপ সম্বরণ কর; তোমার সেই শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম-হস্ত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কিরীটভূষিত চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।

কৃষ্ণ। হে পার্থ! যোগমায়া প্রভাবে আমি তোমাকে অনন্ত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলাম, তুমি ভিন্ন নরধামে এ বিরাট রূপ আর কেহ দর্শন করে নাই। নরগণ বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, যোগাচরণ ও অন্যান্য প্রকার কঠোর ব্রতাচরণেও আমার এই অনন্তরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তোমার অভিলাষ পূরণার্থ আমি আমার পার্থিব রূপ পরিগ্রহ করিব।

আকুলকণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সঞ্জয়! বিরাটরূপে কৃষ্ণ আমার বংশনাশের উপদেশ দিয়া অর্জ্জুনকে কি প্রকার রূপ দেখাইলেন, সে রূপ দর্শনে অর্জ্জুনই বা তাঁহাকে সে ক্ষেত্রে কি কি কথা বলিলেন, তাহা তুমি সবিস্তারে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয়। হে মহারাজ! অর্জ্জুনের শান্তি ও প্রীতি বিধানার্থ কৃষ্ণ তখন সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুনের অভিলাষ হইয়াছিল, সে অভিলাষ তখন পূর্ণ হইল না, দ্বিভুজ সারথি-রূপে কৃষ্ণ তখন রথোপরি উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বরণের পর অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

অর্জ্জুন। হে বাসুদেব! তোমার যোগমায়ার অতি আশ্চর্য্য প্রভাব! সংসারের

লোকে সাধারণী মায়ায় আবৃত থাকে, মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানের সেবা করে, তোমার এই তেজোময়ী মায়া অনুভব করিতেও সমর্থ হয় না। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, রুদ্র ও সিদ্ধচারণগণ যাহা বুঝিতে অক্ষম, সামান্য নরলোকে তাহা কিরূপে কল্পনায় আনয়ন করিবে? ভাগ্যবলে আমি তোমার কৃপা লাভ করিয়াছি, অতএব শত শত বার তোমায় নমস্কার করি।

কৃষ্ণ। হে কৌন্তেয়! যাহারা আমার পরম ভক্ত, যাহারা আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত আছে, যাহারা সংসারের মায়াবন্ধনবিমুক্ত, যাহারা পুত্র-কলত্রাদি পরিবারবর্গে আসক্তিশূন্য, তাহারাই আমার বিরাটরূপ দর্শন করিতে পায়, আমাতে অকপট ভক্তি স্থাপন করিয়া পরিণামে পরমাত্মায় প্রবেশ করিতে পারে।

অর্জ্জুন। হে জনার্দ্দন! যাহারা তোমার ভক্ত, তোমাতেই আত্মসমর্থন করিয়া নিয়ত একমনে তোমার উপাসনা করে, আর যাহারা অনাসক্ত চিত্তে অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের আরাধনায় নিযুক্ত থাকে, সেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাহারা সত্যনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যোগী?

কৃষ্ণ। ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা এবং তদ্গতচিত্তে পরব্রহ্মের উপাসনা, এই উভয় উপাসনার পরিণাম ফল একই প্রকার। আসক্তিশূন্য হইয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে পরমাত্মার প্রীতিসাধন করা হয়। সুখ দুঃখ, নিন্দা প্রশংসা, হর্ষ বিষাদ এবং বিপদ সম্পদে যাঁহার সমজ্ঞান, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। যিনি নিরহঙ্কার, মমতাশূন্য এবং কর্ম্মফলের কামনাত্যাগী, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, তিনিই আমার অধিক প্রিয়। হে অর্জ্জুন! তুমি কামনাশূন্য হইয়া স্থিরতররূপে আমাতেই চিত্ত বুদ্ধি সংযোজিত কর, তাহা হইলেই পরিণামে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি আমাতে চিত্ত স্থিরতর রাখিতে সমর্থ না হও, তবে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অভ্যাসযোগে নিরত হও। তাহাতেও যদি চিত্ত স্থির না হয়, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া ব্রত পূজা হোম ও যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেও মোক্ষ লাভ হইবে। যদি তাহাতেও অশক্ত হও, তবে একান্তে আমার শরণাপন্ন হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কর্ম্মফলের কামনা না রাখিয়া নিষ্ঠা সহকারে নিষ্কাম হও। কেননা বিবেকশূন্য

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কামনাত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মফলের কামনা পরিত্যাগ করিলে মায়া-মোহ বিদূরিত হয়, মানবে শান্তি লাভ হইয়া থাকে। যিনি অবিচলা ভক্তিপরায়ণ, যিনি সর্ব্বজীবে দয়াবান, যিনি ক্ষমাবান, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি সর্ব্বক্ষণ প্রসন্নচিত্ত, যিনি হিংসাদ্বেষপরিশূন্য, তিনিই আমার প্রিয়, তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী। শত্রু-মিত্রে যাঁহার সমজ্ঞান, আধিব্যাধিতে যিনি অবসন্ন না হন, যাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল, তিনিই ভক্তিরূপ অমৃত পান করিয়া পরমার্থ লাভ করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিলাম; যে প্রকার উপাসনা যোগে মানবের মুক্তি লাভ হয়, তাহাও শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই কয়েকটি তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, কৃপা করিয়া ঐ কয়েকটী তত্ত্ব সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। (ক্রমশঃ)

গৃহস্থ মঙ্গল।

লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দত্ত এম-বি।

যুগ মাহাত্ম্য বলে একটা জিনিষ চিরকাল আমাদের দেশে ও সমাজে চলে আস্‌ছে। আর সেটা আমাদের এতটা অস্থিমজ্জাগত যে, সেটা আমরা কোন রকমে ফেল্‌তে পারি না, হাজার চেষ্টা কল্লেও। অনেকে বলে থাকেন সেটা হাওয়ার গুণ। এক এক সময় এমন হাওয়া উঠে যে, কেউ তা থেকে বাদ যায় না। কথাটা সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারি না। তবে এক এক যুগে এক একটার প্রভাব বেশী হয় এবং আজ অবধি হয়ে এসেছে, সেটা পুরাণ পুঁথি পড়লেই বেশ বুঝা যায়।

ধর্ম্মের প্রভাব বেশী ছিল বলিয়া আমরা সৃষ্টির আদি ভাগকে ধর্ম্মযুগ বা সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। তখন মানুষের ধর্ম্মই ছিল একমাত্র জীবনের লক্ষণ। তারপর যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন। কর্ম্ম ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না, কর্ম্ম ছাড়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় না। এই রকম প্রত্যেক যুগে একটা একটা ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্য প্রচার হয়েছে। কিন্তু এই

কলির শেষ ভাগে কি মাহাত্ম্য প্রচার হচ্ছে সেটা যদি বল্‌তে হয়, তাহা হইলে অনেককে অনেক রকম মুস্কিলে পড়িতে হয়। তবে এক কথায় আমরা বলে থাকি, কলিযুগের স্বধর্ম্মই হচ্ছে পাপ এবং এই পাপ পূরণ করিবার জন্য মানুষে সব রকম করিয়া থাকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন, কি রকম? কলিতে জন্মগ্রহণ করিলেই পাপ কার্য্য করিতে হইবে ইহার কোন মানে নাই। মানে নাই বলিলেই যদি চলিত তাহা হইলে বোধ হয় এত রাশীকৃত গ্রন্থের সৃষ্টি হইত না। কলিযুগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থ! আবার এই অর্থ লইয়াই যত গোল। লোকের উদ্দেশ্য সাধু হউক, অসাধু হউক, তাহারা অর্থ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। এখনকার মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত ইষ্টদেবের উপাসনায় কামাই দিয়া কিসে অর্থের সমাগম হয় তাহার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু হায়! আমাদের নারীকুল বোধ হয় অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের কৃপার আশায় তাহাদের শরণাগত হয়।

কথাটা ভাবিবার কথা এবং দুঃখ করিবারও কথা। আজকাল এমন একটা তীর্থ স্থান নাই যেখানে পাপ কার্য্য হয় না, অর্থের আশায় সাধু সন্ন্যাসীরা ঘুরিয়া বেড়ায় না! আমরা সব সময়েই বলে থাকি, অর্থই যত অনিষ্টের মূল অথচ অর্থের আশায় অর্থ পাইবার জন্য কত না অন্যায় করিয়া থাকি। অর্থ যদি ঠিক নিয়মিত ভাবে খরচ করা যায়, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, সংসারে এতটা পাপের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আমরা তা পারি না। অর্থ হাতে আসিলে আমরা হয় সেটাকে বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া হাহাকারের শেষ সীমানায় আসিয়া দাঁড়াই এবং পূর্ব্বের অবস্থা বজায় রাখিবার জন্য যতদিন পারি জাল জুয়াচুরি করিয়া অর্থ সমাগমের চেষ্টা করি। কিম্বা কুবেরের ন্যায় জকের ধনের ন্যায় সেটা কোন রকমে বাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করি। সেই জন্য এই দুয়ের মাঝখানে যারা, তারা বরং সুখী এবং এইজন্য আজকাল আমরা প্রায়ই বলে থাকি, "গৃহস্থের সংসার, সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ কর্ত্তে হয়।" আজকাল বড় লোকের বাড়ী বল্লেই মনে হয়, তাহারা সব অভিশাপগ্রস্ত দেবতা। তাদের সবই আছে আবার সবই নেই।

থাক্—আর ভণিতা না করে যে গুলি আমার বলা উদ্দেশ্য সেইগুলি লইয়া পড়া যাক্। গৃহস্থের মঙ্গল কি কি করিলে হয়? আগেকার বেদ এবং সমাজ আমাদের যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণ করা এখন

নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহারা জীবনকে চারি অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের এক একটা কার্য্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে নিয়মে চলিতে গেলে তাকে সংসার ত্যাগী হয়ে দূরে কোথাও থাকিতে হয়।

তখনকার নিয়ম ছিল, শৈশবে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করা, যৌবনে বিবাহাদি করিয়া পুত্র-কলত্র লইয়া সংসারী হওয়া, প্রৌঢ় বয়সে দেশ ও সমাজের উন্নতি করা এবং বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জনের নিমিত্ত বনে গমন করা; কিন্তু এখন আমাদের পুত্রগণকে শৈশব হইতে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে সে পরে একটা ভাল অর্থসমাগমের কল হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই শিক্ষা উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে অর্দ্ধেক জীবন ভাবনায় ও তাড়নায় অতিবাহিত করিতে হয়। আমাদের বাড়ীর কর্ত্তারা কেহ কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন না ছেলেরা নিয়মিত আহার করিতেছে কি না, নিয়মিত ব্যায়াম করিতেছে কিনা? কেবল যদি দিনরাত্রি বই লইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ আমোদ অনুভব করেন। বার্দ্ধক্যে ইষ্টদেবকে লইয়া পড়িয়া থাকে না—যদি অর্থ সমাগমের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়! শৈশব হইতেই সকলেরই লক্ষ্য কিসে অর্থ আসে, কিসে সুখভোগ হয়।

কাজে কাজেই ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাই আসিতেছে, বিনা অর্থে আমাদের রেহাই নাই। আর যেখানে অর্থ সেখানে কোন কালেই গোল মেটে না। কিন্তু এই গোল মিটাইতে হইলে কি করা কর্ত্তব্য?

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, অর্থ যদি ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী খরচ হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে কষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। শৈশব হইতে আমরা আধুনিক লেখাপড়া শিখিবার জন্য যে, পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকি, উপযুক্ত বয়সে শতকরা নব্বই জন সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না। সুতরাং প্রথম হইতেই পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে পুত্রের সমস্ত গুণের পরিচয় লইয়া সেই মত ব্যবস্থা করা। নচেৎ শুধু শুধু অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে বি-এ, কিম্বা এম-এ, অবধি পড়াইয়া শেষে ত্রিশ টাকার কেরাণী করিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে মিছামিছি তিনি পুত্রের জন্য সময়, অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট করিলেন, যাহা একেবারেই দরকার ছিল না। সুতরাং প্রথম হইতেই বুঝিয়া সুঝিয়া খরচ করা উচিত। (ক্রমশঃ)

বিয়ের বাজার ।

অধোমুখে কাঁদে পিতা
মাটী পানে চেয়ে ।
"সুকুমারী" কন্যা তার—
বৃদ্ধ বরে দিয়ে ॥
হেন বরে কন্যা দান
করেনি স্বেচ্ছায় ।
তিন কন্যার বিয়ে দিতে
ভিটে যায় যায় ॥
তাই এক গ্রাম্য সভ্য
সহ যুক্তি করে ।
ভিটে টুকু উদ্ধারিতে
দিল বৃদ্ধ বরে ॥

হাসি মুখে বৃদ্ধ চলে,
কাঁদে সুকুমারী ।
বৃদ্ধ বলে "কেঁদো নাকো
দিব টাকা কড়ি ॥
গা ভরা গহনা দিব
কেঁদ নাকো গিন্নি ।
শ্রীবিষ্ণু, তাহা ত নহ ।
নববধূ তুমি ॥
এত বলি চলেবৃদ্ধ
লাঠিকরি ভর" ।
কন্যা চলে পিছে তার
আকুল অন্তর ॥

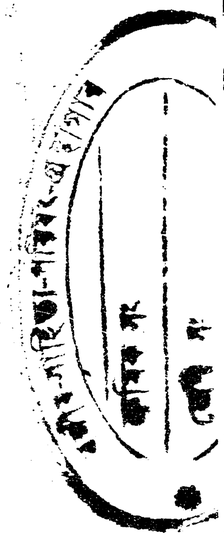

বিয়ের বাজার ।

"সুকুমারী" শ্যালিকা মোর
সে দিন হলো সে ।
সমাজ সভ্য হয়ে আপনি
দিলেন বুড়'য় বে ?"
"তোমার বিয়ের পণ দিতে
ভিটে বন্ধক পড়ে ।
বুড়া বরের টা চায় সেই
বন্ধক উদ্ধারে ॥"

"বটে ! ভিটা রক্ষা তরে
দিল বুড়ো বরে !
এই কি পিতার কাজ !
ধিক্ সে পিতারে !"
"তোমরা যদি পণ কর
পণ নাহি লবে ।
কোন্ পিতা ইচ্ছা করে
বৃদ্ধে কন্যা দিবে ?"

"তাই বলি শুন বাবা !
তোমাদেরি দোষ ।
মিছা কেন মোর প্রতি
কর তুমি রোষ ?"

শ্রীঅবনী ভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"—

লেখক — শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলেজষ্ট্রীট মার্কেটের একটা জুতোর দোকানে নির্ম্মল চাটুর্য্যে জুতো কিন্‌ছিল। ··· ২২শে আষাঢ় তার বিয়ের দিন হ'য়ে গেছে, খুব বড়-লোকের বাড়ীর মেয়ে, ··· ··· শ্বশুর টাকা কড়ি দিচ্ছে অঢেল!

নির্ম্মল বেলগেছে মেডিকেল কলেজে পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে মেসে থাকে। ··· নিজের জুতো খরিদ করার পর তার খাস খানসামার জন্যেও এক জোড়া কম দামী সেলিম কিনে, দোকান থেকে নেমে এসে, সে যখন রাস্তায় ট্রামের অপেক্ষা কর্‌ছিল, তখন ছোট একটী ছেলে একখানা দৈনিক কাগজ তার সুমুখে ধরে ব'ল্‌লে—"নিন্ না বাবু —খুব বড় খবর আছে"।

নির্ম্মল দু'পয়সা দিয়ে কাগজ কিন্‌লে কিন্তু পড়্‌লে না। ··· ··· ··· ··· বাসায় এসে বাড়ী যাবার জন্যে সুটকেশ বাক্স ইত্যাদি গুছিয়ে নিচ্ছিল। চাকরের জুতো জোড়াও বাক্সের এক কোণে রাখতে যাবে,—হঠাৎ জড়ানো কাগজটার এক জায়গায় নজর পড়লো—

"দুস্থ পঙ্গু দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া মরণে শান্তি দিতে পারে—এমন সুসন্তান কি বাঙ্‌লায় আজও জন্মগ্রহণ করে নাই? ··· ··· নবযুগের হাওয়ায়, নবীন মুক্ততার আলোয়, বাঙালীর রঙীন জীবনটা কি আজও দৃষ্টিশক্তিহারা?" ··· ··· নীচে ব্রাহ্মণের নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে।

নির্ম্মল কাগজখানার তারিখ দেখলে ১৩৩১ সালের শ্রাবণ। নিজের মনেই বল্‌লে—"এতদিনে যা হবার হ'য়ে গেছে; বুড়ো মরে বেঁচেছে, আর মেয়েটাও শ্বশুর ঘর কর্‌ছে। হয়তো দু'একটা ছেলে মেয়েও হ'য়ে গেছে। ··· যাক্‌গে—" ··· বাধা-ছাঁদা হ'য়ে গেলে, রাস্তার কেনা দৈনিক কাগজখানা হাতে করে তুলতেই, সর্ব্বপ্রথমে তার যে জায়গায় চোখ পড়লো সেখানে লেখা ছিল—

"হে বাঙলার যুবক সম্প্রদায়!

হাতে বাঁশী নিয়ে, গলায় হারমোনিয়া ঝুলিয়ে—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ"—ব'লে ষাঁড়ের ডাক ডাকলে—বঙ্গমাতার দুঃখ ঘোচানো যায় না। ··· কল্পনার রঙীন স্বপন ফুলের মালা পরিয়ে ফুলের বিছানায় নিমন্ত্রণ করে ফুল-শয্যার জন্য, কিন্তু বাস্তব তার লোহার হাত দুটো বাড়িয়ে ডাকে—কাজের

বিস্তীর্ণ আসরে! ··· ·· কল্পনার ঘুম ছেড়ে গেলে স্বপন বাতাসে মিশোয়, আর বাস্তবের কাজ বীরের মত শেষ করে দিলে, মনের মাঝে গানের রাগিণী বেজে ওঠে—ছন্দে ছন্দে—আসল তৃপ্তির সাফল্য নিয়ে।"

"ঘরের খেয়ে বনের মো'ষ তাড়াবার আগে, নিজের ঘরটার চার ধারে নজর দাও! ··· যার ভাতের হাঁড়ি কুকুরে উচ্ছিষ্ট করে দেয়, তার উপবনের কুঞ্জে ব'সে মালা গাঁথায় গৌরব নেই! ··· বড়র দিকে নিশানা রেখে আলাদীনের প্রদীপ ধ'রে ছুটেছ, কিন্তু মাঝপথে বিশ্রাম নিয়ে দেখ,—তোমার অতি চেনা ছোটদের দোর বেয়ে আজ হাজার দরিয়ার কল্লোল ছুটছে।"

"এক অন্ধ পঙ্গু গরীব ব্রাহ্মণ মরণাপন্ন। তাঁর সপ্তদশী কন্যাকে বরণ করে ঘরে আনবার লোক নেই আজ। হে যুবক! হে বাঙলার ভবিষ্য মুখোজ্জ্বলকারী তরুণ! তোমরা যে মেষ নও—মানুষ, তার প্রমাণ দাও।"

"সপ্তকোটী কণ্ঠ মিলে যে মাতার দুঃখ ঘোচাতে বসেছ, সেই মাতার অন্তরের ক্ষত যে কত গভীর হয়ে বেজেছে,—দুচোখ দিয়ে দেখ, প্রতিকার কর।"

"কবি গান গেয়েছিলেন—মানুষকে কাজের বিস্তীর্ণতায় জাগিয়ে তুলতে, সুরে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে নয়, আমোদে মাতাল করে দিতেও নয়। * * *" নির্ম্মলের মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো। কিন্তু তখনই খেয়াল হল—২টা ৪ মিনিটে তার গাড়ী এবং ২২শে তার বিয়ে। ··· বাড়ী যেতেই হবে! ··· কিন্তু তিন বছর আগের সেই বৃদ্ধ বামুনের আইবুড়া মেয়েটার এখনও যে গতি হল না কেন, এ চিন্তাটাও তাকে কম ভোগান্তি দিচ্ছিল না।

হয়তো কর্ত্তব্যের অতি বড় টানটুকু নির্ম্মলকে বাড়ী যাওয়ায় বাধা এনে দিচ্ছিল। তাই সে ২টা ৪ মিনিটের গাড়ী ছেড়ে দিলে।

ঠিক হ'ল—বিকেলে কালী সিংহীর গলিটার খবর নিয়ে, রাত্রি ৯টা ৩৪ মিনিটে রওনা হবে। * * * খুঁজে খুঁজে আসল বাড়ীখানা বের করতে যে সময় লাগলো, তাতে দিনের আলোয় সেই ছোট অন্নচওড়া পথে ঢোক্‌বার ফুরসৎ মিল্‌লো না। খোলার লম্বা বস্তিটার শেষের এক প্রান্তে সব চেয়ে ভাঙা বাড়ীটার বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে নির্ম্মল ডাকাডাকি করলে—অনেকক্ষণ। কিন্তু সাড়া নেই। ···

ভাঙা দরজা ধাক্কায় ধাক্কায় খুলে গেল। উঃ কি বিশ্রী দুর্গন্ধ!

নির্ম্মল বাড়ী ঢুকেই ভয়েই আঁৎকে উঠ্‌লো।

বাড়ীর ছোট রোয়াকটায় আগাগোড়া একটা ময়লা চাদর মুড়ি দিয়ে কে পড়ে রয়েছে।

নির্ম্মল ভাবলে—সেই গরীব বামুন। ... আহা! বেচারী! ... পকেট থেকে দেশলাই বের করে, এক সঙ্গে অনেকগুলো কাঠি জেলে, যে শুয়েছিল তার মুখখানার পানে চাইতেই, নির্ম্মলের মূক কণ্ঠ হইতে একটা অস্বাভাবিক অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো—"এ যে মড়া!"

... "কিন্তু মেয়েটা গেল কোথা?"

... আবার দেশলাই জ্বাল্‌লে। "তাইতো!—বুড়ো তো মরে বেঁচেছে কিন্তু যার জন্যে মোলো সে গেল কোথা?—মেয়েটা?"

সুমুখের ঘরখানার পানে চেয়ে দেখলে—দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলে—ভিতরে খিল আঁটা। ... এমনি একটা উৎকট গন্ধ তার নাকে ঢুক্‌ছিল, যে দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্য।

... বাড়ীটার সকল দিক ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে যেন।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌লে।

বিস্ময়ের উপর লক্ষগুণ বিস্ময় আর আশঙ্কা—নির্ম্মলের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটাকে কেড়ে নিচ্ছিল। ... দেখ্‌লে—ঘরেও কে একটা মরে রয়েছে! অনুমান হল—এই বটে! মেয়েটিই বটে!

ছেঁড়া লেপ তোষক সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সে কেরোসিন ঢেলেছিল। ... তার আশাকল্পনাময় পরিপূর্ণ-যৌবন ছড়ানো দেহটায় অগ্নির আক্রমণ তখন অলস মন্থরে!... কিন্তু অনেকক্ষণ মরে গেছে।

নির্ম্মল পর হলেও, শোকার্ত্ত হয়েছিল। পুলিশ ডেকে, যথাকর্ত্তব্য শেষ করে, বৃদ্ধের সৎকার করবার অনুমতি পেলে যখন, তখন রাত্রি বারোটা। কিন্তু মৃতদেহ খাটে তুলতে গিয়েই চোখে পড়লো মৃত বৃদ্ধের গলার কাছে একখানা মস্ত বড় কাগজ। ... তাতে মেয়েলি ছাঁদে লেখা রয়েছে—

"আমার বাবার মৃত্যুর পর, আধ ঘণ্টা অতীত হয়েছে, এইবার আমার মৃত্যুর ক্ষণ নীরবে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে,—হয়তো সে আমাকে অশান্ত জগত থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে শান্তি দিতে পারে! সুতরাং আমি আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে যাচ্ছি!—কিন্তু আমার এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী আমাদের দেশের লোক—যারা শিক্ষার আলো পেয়ে নিজেদের

মনে ক'রে অহঙ্কারে মাটীতে পা দেয় না, তারাই! যারা সভাসমিতিতে লেক্‌চার দেয় কিন্তু নিজে তার মান্য রাখে না, তারাই!!" ...

"শুনেছি অতৃপ্তি বুকে নিয়ে জীবন গেলে, পরজন্মে সূক্ষ্ম আত্মার গতি হয় না। ... আজ স্বেচ্ছা মরণের আগে, ঈশ্বরের কাছে আমি দু'হাত যোড় করে এই বর চাই,—আমারও যেন গতি না হোক্! আমার এই সূক্ষ্ম আত্মাটা বিশাল স্থূলত্ব নিয়ে সহস্র শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, যেন এ দেশের অকর্ম্মণ্য স্বার্থসর্ব্বস্ব লোকগুলোর অযুত উৎসাহে বাধা এনে দেয়! কুম্ভীপাকের জ্বালায় জ্বালায় যেন তাদের মনের সবখানি জায়গায় অশান্তি অক্ষমতার গভীর আঘাত করে—শত্রুর মতন ... নৃশংসের মতন!"

সাধনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল।

জীব দুঃখ চাহে না, সুখ চাহে, পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার। লোকে সুখের জন্য লালায়িত, দুঃখ চাহে না, কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী নয়, সুখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। আজ যাহা সুখ বলিয়া গৃহীত, দুদিন উপভোগের পর আর তাহা তত ভাল লাগিবে না; তখন অন্য সুখের অভাব বোধ হইতে থাকিবে, পূর্ব্বভুক্ত সুখ যেন দুঃখ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাই পাপ, যাহা হইতে সুখ উৎপন্ন হয় তাহাই পুণ্য। এই সুখ দুঃখ ও পাপ পুণ্যের অতীত অবস্থাই শান্তির অবস্থা। শুভাশুভ ভালমন্দ লইয়াই জগৎ, বাসনাই সংসার—ইহাই বন্ধনের মূল। এই শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে পারিলেই মুক্তি—এই অবস্থা লাভের জন্যই সাধনা। সাধনা দ্বারা লব্ধ ইচ্ছারহিত অবস্থাই সিদ্ধি। আসক্তিহীন ও ইচ্ছারহিত অবস্থাই শান্তি। এই শান্তি বা সিদ্ধি লাভের অন্তরায় অনেক, প্রধানতঃ ছয় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য। কাম দুষ্পূরণীয় অনলের ন্যায়, যত থাকে তত চায় ('কামঃ কামভোগেন ন শাম্যতি') কাম অর্থে কামনা—গ্রহণের ইচ্ছা, ধন-রত্ন স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি পাইবার বা

গ্রহণের ইচ্ছা ; লোভ ইহার প্রবর্ত্তক, গ্রহণের জন্য কামনার বস্তু দেখাইয়া দেয়। গ্রহণের বাধা পাইলেই ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই তিনটীই নরকের দ্বারস্বরূপ—(গীতা ১৬শ অধ্যায় ২১শ শ্লোক। যতই কামনার বস্তু লাভ হইতে থাকে ততই মদ বা অহঙ্কার বাড়িতে লাগিল আমার কত টাকা! আমার কত লোকবল! আমার চেয়ে কে বড় ? তখন মোহ—ভ্রান্তি বা অজ্ঞান (অহঙ্কার জনিত) আসিয়া উপস্থিত হয়। মোহান্ধ জীব নিজের সত্ত্বা ভুলিয়া যায়। তার পর মাৎসর্য্য—অন্যের নিকট নিজের আধিপত্য প্রকাশ বা ঘৃণাপ্রদর্শন—যথা তুই ছোট, আমি বড় ইত্যাদি ; কিন্তু ভ্রান্ত জীব বুঝে না বা মনে করে না যে কটাক্ষের মধ্যে তাহার সমস্ত ধ্বংস হইতে পারে ও হইয়া যাইবে ধন জন মান কিছুই তাহাকে ধ্বংস বা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, কেহই তাহাকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারিবে না। "এই গেল, এই গেল"—এই ভয়েই তাহার জীবলীলা শেষ হইবে। মূঢ় মানব এই নশ্বর দেহকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করে, দেহ সম্বন্ধীয় জীব ও বস্তুই তাহার আত্মীয় বলিয়া মনে করে, ইহাদিগকে লইয়াই তাহার সত্ত্বা বিবেচনা করে। আপনার একমাত্র আত্মীয় ভগবানকে ত্যাগ করিয়া পরকে আত্মীয় করাতেই তাহার এত দুঃখ ও অশান্তি। মানব যখন জগতে আসিয়াছে, তখন একাই আসিয়াছে ; যাঁহার কৃপায় সে উপরিকথিতরূপ আত্মীয়গণকে পাইয়াছে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকাতেই এত দুঃখ, এত অশান্তি। এই আত্মীয়েরা কেহই তাহার প্রকৃত আত্মীয় নহে, মোহরূপ সয়তানের অনুচর। জীবের প্রকৃত আত্মীয়কে ভুলাইয়া, মোহ তাহার প্রেরিত অনুচরদিগকে আত্মীয় বুঝাইয়া দিয়া, ভ্রান্ত জীবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু গুরু-ভগবান দেহ—প্রাণ—কূটস্থ - তাঁহার সৃষ্ট জীবের ধ্বংস দেখিতে চাহেন না, তাই আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত ও রক্ষা করিতেছেন, শাস্তি ও বিপদ দ্বারা সাবধান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাহি না, তাঁহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিয়া উঠি, কারণ তাঁহাকে পাইতে হইলে ত্যাগ করিতে হইবে। কি ত্যাগ ? সর্ব্বস্ব ত্যাগ—বিষয়, ইন্দ্রিয়, সংসার-সুখ-সঙ্গ ত্যাগ ; ভ্রান্ত জীব বুঝে না, তাঁহাকে পাইলে কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। তাঁহা হইতেই সুখের উৎপত্তি, তাঁহাকে পাইলেই সব পাওয়া হইল ; তিনিই সর্ব্বসুখের আকর, আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াই এত দুঃখ, এত অশান্তি ভোগ করিতেছি। ইহারাই তাহাকে মরণের পথে লইয়া যাইতেছে।

এই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থা অর্থাৎ শান্তি পাইবার একমাত্র উপায় সাধনা ; সদ্‌গুরুপদিষ্ট সাধনা বা যোগ দ্বারা উক্ত অবস্থা লাভ হইবে। "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্"—(গীতা)। এই সাধনা দ্বারা ভগবানের জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান - ভগবানের দর্শন লাভ হইবে। ক্রমশঃ তাঁহাকে ধ্যান অর্থাৎ তাঁহাতে স্থিতি হইবে। তখন জগতের অসাধুতা দর্শন বা উপলব্ধি দ্বারা বৈরাগ্য অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ হইবে, বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমনের আবশ্যকতা হইবে না—তাহারা আপনিই চলিয়া যাইবে অর্থাৎ বশীভূত হইবে—তাহার পরই শান্তি, তখন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া জ্ঞান হইবে। তখন তাহার চাহিবার বা পাইবার দ্রব্য কিছুই রহিবে না—কাজেই তাহার শত্রু, মিত্র ভাল, মন্দ, কিছুই রহিল না—সকলই সমান। এই অবস্থা লাভই সাধনার উদ্দেশ্য, "ত্যাগাৎ শান্তি অনন্তরম্"—(গীতা)। এই অবস্থা লাভ হইলেই জীব স্বাধীন হইল, জীব বীর হইল ('বীরাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ ধীরাঃ')। যে সুকৌশল কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়-জয়—স্বাধীনতালাভ বা আত্মায় স্থিতিলাভ করা যায় তাহাই যোগ বা সাধনা, তাহা সদ্‌গুরুর নিকট জানা যায়। ভ্রান্ত জীব ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগে বাধা না পাইলেই আপনাকে স্বাধীন মনে করে ; মোহবশে সে বুঝিতে পারে না যে সে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছে—সে ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞায় সব করিতেছে—কোথায় তাহার স্বাধীনতা ? এই দাসত্ব হইতে উদ্ধারের সহজ উপায় ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—"সব ছাড়িয়া আমার ধর অর্থাৎ আমায় অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্য করিয়া যাও—ফলাফলের ভার আমার উপর রহিল, তোমার তাহা দেখিবার আবশ্যকতা নাই।" ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে অতি সুকৌশলে দেখান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুনের প্রতিকার্য্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শাসিত, প্রতিবাণ নিক্ষেপেই সারথি বা রথচালক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি অর্থাৎ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত। সেইরূপ আমাদের এই দেহ রথেরও একজন সারথি বা চালক আছেন, যিনি না থাকিলে এক মুহূর্ত্ত এ রথ চলে না, তিনি আমাদের প্রাণ, গুরু, আত্মা, কূটস্থব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ। সাধন সমরে তাঁহাকে সারথি করিয়া কার্য্য করিয়া যাও, অর্জ্জুনের মত বিজয়ী হইবে। তাঁহাতে মন রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাও, তাঁহারই কার্য্য করিতে এ জগতে আসিয়াছ বা তিনি তাঁহারই কার্য্য করাইতে এ জগতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহারই কার্য্য করিতেছি—আমার নিজের বলিতে কোন কার্য্য নাই, কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া

তাঁহারই নিকট (যাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি) ফিরিয়া যাইতে হইবে— ইহা মনে করিয়া এই সংসারে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাতে নিজের কোন লাভালাভ নাই, সুতরাং সুখ দুঃখেরও কারণ নাই। ইহাই যোগ বা সাধনা ("সমত্বং যোগ উচ্যতে"—গীতা)। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি লাভের জন্য কতকগুলি সদ্গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া করা আবশ্যক। ঐ সকল ক্রিয়াই বা সাধনপ্রণালীই সাধারণতঃ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত, উহারই ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা উক্ত শক্তি লাভ হয়। বিপথগামী মনকে অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ স্বপথে আনিতে হইবে। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া মনকে অস্থির করিতেছে—অভ্যাস দ্বারা তাহাকে চিন্তাশূন্য করিতে হইবে। দর্পণস্থিত ময়লা অপসৃত হইলে যেমন তাহাতে নিজ প্রতিমূর্ত্তি সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ মন হইতে চিন্তারূপ ময়লা অপসারিত হইলে স্বরূপের—আত্মার—ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ইহারই অভাবে মানবের এত অধঃপতন এত দুঃখ। 'আমার দেহই আমি' এই জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে। দেহাতিরিক্ত একটী পদার্থ আছে তাহাই 'আমি', দেহ 'আমি' নয়। এই দেহ তাঁহার বাসস্থান, এই দেহের কার্য্য ফুরাইলে তিনি চলিয়া যাইবেন ; সেই তিনিই 'আমি'—ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে দেখিতে দিতেছে না, এই দেহ ও তৎসম্বন্ধীয় জীব ও দ্রব্যাদি লইয়াই, স্ত্রীপুত্র ধনরত্ন লইয়াই আমার সত্ত্বা এইরূপ বুঝাইয়া দিতেছে ; কিন্তু এই দেহ প্রভৃতি সমস্তই গুরুর প্রদত্ত, তাঁহারই জিনিষ তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিতে হইবে, সকলই রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে—তাহা বুঝিতে দিতেছে না। অতএব এই ইন্দ্রিয়গণের দমনই সাধনার প্রথম কর্ম্ম। ইন্দ্রিয় দমন হইলে চিত্ত বহির্বিষয় হইতে অন্তর্মুখী হইবে, তখন আত্মার স্বরূপ দর্শন হইবে, সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ হইবে।

মোহান্ধ জীব মনে করে মৃত্যু সময়ে একবার ভগবানের নাম করিলেই বা তাঁহার ধ্যান করিলেই মুক্তি পাইবে। সে জানে না যে সংসারে তাহার আসক্তিসকল সংস্কাররূপে তাহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে ; মৃত্যুসময়ে—তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তা ও কষ্টে সে অভিভূত থাকিবে ; ইহাই মৃত্যু যন্ত্রণা। তখন ভগবানের কথা মনে আসিবে না, কাজেই পূর্ব্ব হইতেই অভ্যাস দ্বারা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, সর্ব্বদা তাঁহার ধ্যানে থাকিতে হইবে। মৃত্যুসময়ে যে চিন্তা বলবতী থাকিবে সেইভাবে ভাবিত হইয়া পুনর্জন্ম হইবে—অতএব পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরণ লইতে হইবে ও তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। যুবতী স্ত্রী যেমন সর্ব্বদা স্বামীধ্যানে থাকে, স্বামী যেমন তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বিরাজমান থাকে, স্বামীকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া যেমন সে সুখী হয়, সেইরূপে সর্ব্বদা ভগবানকে ধ্যান কর, তোমার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান কর, নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইবে। এ অবস্থা লাভ একদিনে হয় না—দীর্ঘকাল অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তীব্র ইচ্ছা দ্বারা উক্ত শক্তি ও অবস্থা লাভের জন্য সদ্গুরূপদিষ্ট ক্রিয়ার অভ্যাসই সাধনা।

বটকৃষ্ণ পালের এড্ওয়ার্ডস টনিক বা

য্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্।

কলিকাতার হেল্থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এ[illegible] কো[illegible] কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ ন[illegible]ন ফিল্ড লেন, কলিকাতা

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতধারা কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ ল্যোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

LIBRARY

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪. শ্রাবণ, [৪র্থ সংখ্যা

১।	সাহিত্যে গলদ	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবভিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ,	৪৭৭
২।	বিরহে	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৪৮১
৩।	ধর্ম্মদাস	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৪৮৩
৪।	এসো	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু	৪৮৬
৫।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর	W. C. Bonnerjee	
		শ্রীযুক্তকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	৪৮৬
৬।	ধর্ষিতা	শ্রীযুক্ত যোগানন্দ রায়	৪৮৯
৭।	পাণ্ডব নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৪৯৩
৮।	ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ		৫০২
৯।	কন্যা দেখা	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫০৬
১০।	দায়িত্ব	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি, এল,	৫০৭
১১।	মিনতি	শ্রীমতী আভাবতী	৫০৮
১২।	সমালোচনা	... ...	৫০৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়। 28.8.27
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

কদ্দিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B. মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিখ্যাত চিকিৎসকগণের
সুপ্রশংসিত হাউখোলা
দত্তবাটীর ভুবন
বিখ্যাত

পদ্মমধু

চক্ষু উঠা, ছানী, দৃষ্টিহীনতা, রাতকাণা, ঝাপসা দেখা, জলপড়া, চক্ষু কর্ কর্ করা, লাল হওয়া, পাতায় পাতায় জুড়িয়া যাওয়া, জ্বালা ও অর্দ্ধদৃষ্টি, অদূর দর্শন প্রভৃতি চক্ষের যাবতীয় পীড়া আরোগ্য হয় এবং চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল রাখে এবং জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৷০ আনা, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স।
জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম ইং ১৮৪৪—মৃত্যু ইং ১৯০৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

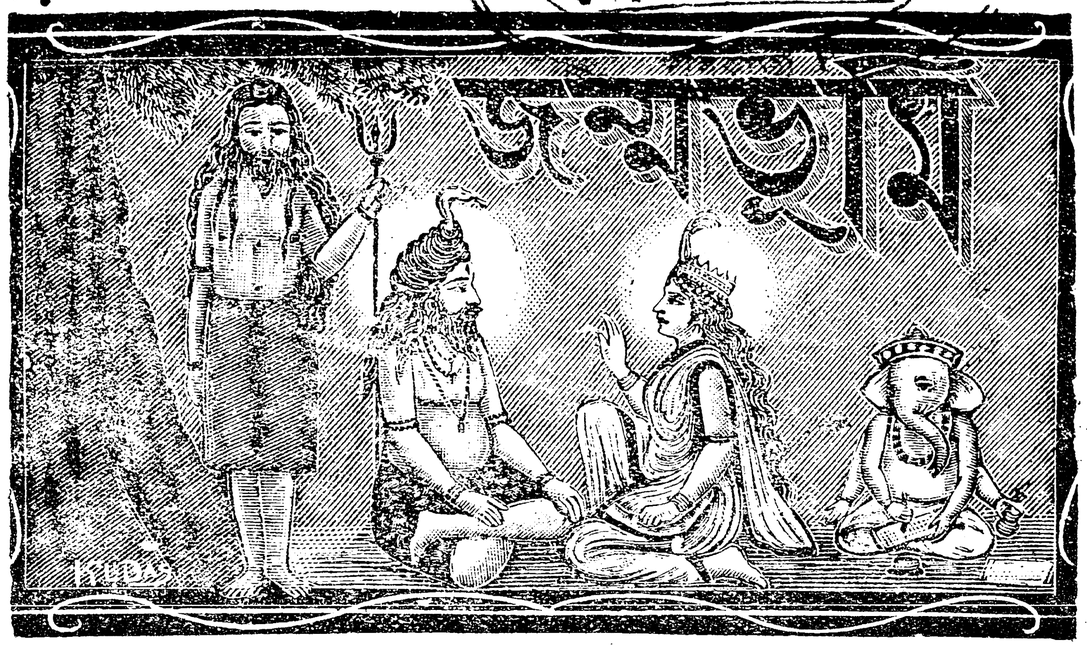

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, শ্রাবণ | ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্যে গলদ *

লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ।

গ্রন্থাগার সম্মিলনের সম্মুখে আমার প্রথম নিবেদন এই যে, দেশের সমস্ত গ্রন্থাগার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই নিয়মে অনুশাসিত হইলে—আমাদের সাহিত্যের একটা উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। যে সমস্ত পুস্তক অশ্লীলতা—ব্যভিচার বা প্রেমের নামে কামের প্রশ্রয় দিয়া থাকে, সেইগুলিকে দেশের পুস্তকালয় সমূহে না উঠাইতে দিলেই লেখকগণ সংযত হইয়া যাইবে।

আমাদের সাহিত্য সাধনায় গলদ ঢুকিয়াছে। সাহিত্যানুশীলন যেন বিপথে বিভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণের বিষম রুচিবিকার ঘটিয়াছে। গল্প ও উপাখ্যান পাইলে গভীর বিষয়ক প্রবন্ধ তাঁহারা পড়িতেই চাহেন না, ধর্ম্মের কথা ত নহেই—"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" এইজন্য অনেক মাসিকপত্র

* হুগলী জিলা গ্রন্থাগার সম্মিলনে পঠিত। হিঃ ২৭।২।৩৪।

লোকরঞ্জনার্থ গল্প, উপন্যাস, রঙ্গরস ইত্যাদি দ্বারা প্রায়ই পূর্ণ থাকে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ইত্যাদি গভীরার্থক নিবন্ধ উপেক্ষিত ও অপঠিত অবস্থায় রহিয়া যায়। যে লেখার আদর নাই, তাহার লেখকও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। গল্প, ফষ্টিনষ্টির লেখকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এইরূপ হালকা আবহাওয়ায় সাহিত্যের পুষ্টি কখনই হইতে পারে না। ইহার উপর আর এক জঞ্জাল জুটিয়াছে—এক শ্রেণীর লেখক অবতীর্ণ হইয়াছেন—যাঁহারা সাহিত্যের পুণ্য ত্রিধারা অবাধে অশ্লীলতা দ্বারা পঙ্কিল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর্টের নামে অশ্লীলতা প্রচার করিতেছেন। পিতা-পুত্র বা শিক্ষক-ছাত্র একসঙ্গে বসিয়া দেখিতে পারেন না—এমন কদর্য্য অশ্লীল চিত্র অনেক মাসিকের মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সকল কলাজ্ঞ ব্যক্তি—রমণীর নগ্নমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছুতেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না। যে নারীজাতি সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু"—বলিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে নারীজাতি জগজ্জননীর রূপভেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি কলুষ লালসা জাগরিত করিলে, মাতৃত্বের উচ্চকোটীতে বিদ্যমান সেই জাতির উপর কিরূপ অবমাননা করা হয়, তাহা সুধীমাত্রই বিবেচনা করিবেন। শ্রীভগবানের রাজ্যে সৌন্দর্য্যের অপূর্ণতা কি কোথাও আছে? প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গেই ত সৌন্দর্য্য বিকসিত উচ্ছলিত। তেজোভাস্বর জটিল ব্রহ্মচারীর প্রোজ্জ্বল মুখকান্তি কত সুন্দর—অথবা বলদৃপ্ত বিজয়ী সেনানীর মহিমামণ্ডিত মুখমণ্ডল কেমন চিত্তাকর্ষক, তাহা কি কলাভিজ্ঞগণ চোখ মেলিয়া দেখিবেন না এবং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যিক ও পাঠকগণ দৃষ্টিপাত করিবেন না? আবার স্ত্রীমূর্ত্তি যখন মাতা, ভগিনী, আর্ত্তত্রাণপরায়ণা—রোগী ও বিপন্নের শুশ্রূষাকারিণী, তাহা কত মধুময়!

কিন্তু এই সকল মঙ্গলময় উপজীব্য ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল নগ্ন যুবতীমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কুত্রাপি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান না—তাঁহাদের রুচি কিরূপ বিকৃত—তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। তাঁহারা এই বিকৃত রুচি সমাজে সংক্রামিত করিয়া অবাধে পাপের স্রোত প্রবাহিত করতঃ যে অপরাধ করিতেছেন, তাহা অমার্জ্জনীয়। চিত্রেই পাপের শেষ নহে, নূতন নূতন লেখক বিলাতী প্রেমের অনুকরণে সমাজ-ধ্বংসী অবাধ প্রেমের যেরূপ কলুষ চিত্র স্ব স্ব উপন্যাসে অঙ্কিত করিতেছেন তাহাতে সামাজিক মাত্রেরই যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। তাঁহাদের নিজেদের কলুষ রুচি অনুসারে নারীজাতির চিরপূত সতীত্ব ধর্ম্মকে sex tyranny

বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। এইজন্য স্ত্রী-শিক্ষা বা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে দেবর ভাজ ইত্যাদি পবিত্র সম্বন্ধ বিচার ছাড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমের নামে কামের অবাধ চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। কাম সমস্ত পাপের মূল। অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মানুষ কিসের প্ররোচনায় পাপে প্রবৃত্ত হয়?"—(অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ?) তদুত্তরে ভগবান কহিলেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ"—কাম ও ক্রোধই সমুদয় পাপের প্রবর্ত্তক। এই কাম নিরোধের জন্য আমাদের শাস্ত্রে কত প্রক্রিয়ার না ব্যবস্থা রহিয়াছে! শ্রীভগবান যে 'কামের' কথা বলিলেন, তাহা লোভ সাধারণকে মাত্র বুঝাইতেছে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন ঘটিত যে কাম তাহা কত অহিত ও নিকৃষ্ট, তাহা সহজেই অনুমেয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ব্রহ্মচর্য্য পালন, আহারসংযম, প্রাণায়ামাদি কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা ইহার দমনের উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন। "বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" বলিয়া দুষ্পূর কামের দুর্দ্ধর্ষতাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু সেই নিখিল পাপের আকর লালসাবৃত্তির অবাধ প্রসারে ও প্রশ্রয়দানে সমাজে যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা অদূরদর্শী লেখকগণ বুঝিবেন কিরূপে?

এই বাস্তব (material) জগৎটার শৃঙ্খলা যে নৈতিক (moral) নিয়মের অধীন এবং ঐ নৈতিক নিয়মের একটুখানিও বিচ্যুতি যে উহার বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে, তাহা সাহিত্যিক ও সামাজিক মাত্রেরই বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

উপন্যাস আমাদের দেশে নূতন নহে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য, নাটক, উপাখ্যান উপন্যাসের অভাব ছিল না। নবীন ও প্রাচীন অন্য কোনও সাহিত্যে নাটকাদি সম্পদ্ এমন পরিপুষ্ট হইয়াছে কি না জানি না। সেই সংস্কৃত কাব্যের মূল আদর্শ ছিল "রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবৎ।" সৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠাই এই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল উপন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রায়ই নায়িকা কুমারী কন্যা এবং তাঁহার সহিত নায়কের প্রণয় ও পরে বিবাহ এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নায়ক পক্ষে কোনও কোনও স্থলে অবিনয় বা প্রগল্‌ভতা পরিদৃষ্ট হইলেও নায়িকা পক্ষে সতীত্ব বা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। নায়ক পক্ষে যে অবিনয়, তাহাও অনেক স্থলে বীরত্ব-গরিমা-মণ্ডিত। অর্জ্জুন ও সুভদ্রা, ঊষা ও অনিরুদ্ধ, হুষ্মন্ত ও শকুন্তলা, পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা, উদয়ন ও রত্নাবলী, দশকুমার

চরিত্রের উপাখ্যানাবলী. এমন কি বেতাল পঞ্চবিংশতি কথাগুলি দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। ইহাদের একটীতেও পরস্ত্রী সম্ভোগের কলুষ চিত্র নাই; নায়িকার কলঙ্কিত অসতীত্ব বর্ণন করিয়া পাঠক পাঠিকার মানসে লালসা উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই। অথচ রোমান্স পুরাদস্তরই আছে। অকলঙ্ক প্রেমই উহাদের আলোচ্য বিষয়। দশাননের সীতাহরণ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক কৃষ্ণার ধর্ষণ চেষ্টার ফলে উহাদের সবংশে নিধন, জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হইয়া পাপের প্রতি পাঠক ও পাঠিকাগণের একটা ঘোর আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণাই জন্মাইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু অপরপক্ষে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে বর্ত্তমানে যে সকল উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে লিখিত হইতেছে, তাহাতে পবিত্র প্রেমের পরিবর্ত্তে কামের কলুষমূর্ত্তি রাক্ষসীমায়া বিস্তার করতঃ তরুণ যুবকগণকে বিভ্রান্ত করিয়া ক্রমশঃ বিপথে পরিচালিত করিতেছে। এই সকল উপন্যাস পাঠের ফলে পাপের ভয় ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। ব্যভিচার, পরস্ত্রীর সহিত অবাধে মিশ্রণ, নির্জ্জনে একত্র, এক কক্ষে ও এক শয্যায় শয়ন, আলাপন ইত্যাদি বর্ত্তমান উপন্যাসগুলির অঙ্গের আভরণ। মহর্ষি মনু কাম প্রবৃত্তির বলবত্তা অবগত হইয়া তাহার দমনের জন্য পুরুষের সহিত তাহার মাতা, ভগিনী এমন কি বয়স্থা কন্যার পর্য্যন্ত এককক্ষে শয়ন ইত্যাদি নিষেধ করিয়া যে কঠোরতা পালনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অল্পপ্রজ্ঞ বর্ত্তমান লেখকগণ তাহা যথেচ্ছভাবে শিথিল করিয়া natural propensity (বা মনের স্বাভাবিক প্রবণতা) ইত্যাদি অজুহাতে কামভাব সমাজে বিসর্পিত করিতেছেন। মহাত্মা মুনিঋষিগণ কামোপভোগ বিষয়ে natural propensity কি তাহা খুবই জানিতেন। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ একস্যাপি পর্য্যাপ্তম্'—পৃথিবীতে যত ধন, যত স্ত্রী আছে, প্রতি কামীর ইচ্ছা যে সবগুলি তাহার উপভোগের জন্য হয়। কিন্তু এই natural propensity বা স্বাভাবিক প্রবণতায় যদি গা ঢালিয়া দিতে হয়, তা'হলে সমাজ থাকে কিরূপে? সমাজ রক্ষার জন্য চাই সংযম, পরস্ত্রীতে মাতৃত্ব বুদ্ধি অথবা স্ত্রীমাত্রেই শ্রীভগবতীর স্বরূপজ্ঞান; এবং এই সৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার্থ কাব্যাদিতে সতীশিরোমণি একাকিনী দময়ন্তীকে ধর্ষণার্থ আক্রমণকারী ব্যাধের ভগ্নস্তূপে পরিণতিরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা সতীত্বের প্রোজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকাই কঠিন। সতীত্বটাকে ন'কড়া, ছ'কড়া করিলে সমাজ ছারেখারে যাইবে।

দেশের গ্রন্থাগার সমূহের সঙ্ঘ দ্বারা এই দিক দিয়া সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন

পূর্ব্বক দেশের অশেষ কল্যাণ হইতে পারে। যে সকল পুস্তক, কাব্য, উপন্যাস, বা মাসিকপত্র সংযমের বিরোধী সামাজিক সদাদর্শ প্রদর্শন না করিয়া কাম প্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহা কোনও পুস্তকাগারে উঠান হইবে না—এইরূপ নিয়ম করিলে লেখকগণ ঢিট হইয়া যাইবেন, সদুপন্যাসের প্রচলন হইবে, অশ্লীলচিত্র বিলুপ্ত হইবে, সৎসাহিত্যের প্রচার দ্বারা প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সূচিত হইবে।

বিরহে।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

(১)

দুরন্ত মাঘের শীতে, কোথায় প্রাণের প্রিয়া?
একাকী রয়েছি হেথা, কে মোর জুড়াবে হিয়া?
কোকিলের কলতান রসালের শাখে শুনি
তোমার কোমল স্বর মনে হেন অনুমানি।
তুমি আজি কোথা হায়!
বারেক হের আমায়
শূন্য আজি গেহ দেহ কোথা তুমি গুণমণি!

(২)

এ শীতে বলিতে নিত্য "পিঠে পালো করি?"
"ভালবাস ভাজা পুলি" কত রঙ্গ করি—
পায়স পিষ্টক আদি করিতে যতনে
আর কি আদর স্নেহ পাব হে জীবনে?
সে সব সুখের দিন
গিয়েছে আমার, মীন—
জলাশয় হ'তে তুলে বাঁচে কতক্ষণ?
জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ, ভঙ্গুর জীবন।

(৩)

কোথায় প্রাণের প্রিয়ে! রয়েছ এখন গো!
শুনিছ কি বিলাপ আমার?
তোমার কোমল প্রাণে মোর ব্যথা সহে না ত,
এস হৃদাধার!
অমর রমণীগণে—
তুষিছে কি মিষ্ট ভাষে
অন্তর তোমার?
শোকতাপদিগ্ধ প্রাণে
সান্ত্বনার লেপ দাও
হে প্রিয়া আমার!

(৪)

যেদিন গিয়েছ চলি, এ মোর ভবন—
শূন্যময়, শবস্থান ভীতিনিকেতন।
কর্ম্ম-সূত্রে টানি লয়,
কলের পুতুল প্রায়
আসি যাই হেথা।
কে মোর ঘুচাবে প্রিয়ে! হৃদয়ের ব্যথা?

(৫)

দুরন্ত কৃতান্ত হায়! নিঠুর এমন রে,
কহিব কাহারে?
সাজান উদ্যান মোর, শুকাইল একেবারে
কালের কুঠারে।
এস গো প্রেয়সি, রাণি!
হের একবার গো!
যেরূপে মানস।
সেইরূপে তৃপ্ত হব জুড়াবে
বিরহানল—হইব সরস।

ধর্ম্মদাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত রসময় ঘোষ।

ধর্ম্মদাস অতি ধার্ম্মিক সজ্জন ব্রাহ্মণ, বাস হুগলী জেলার অন্তঃপাতী নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। অতুল সম্পদের অধিকারী হইলেও সে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী ছিল। তার প্রকৃতিই ছিল অনাসক্ত—নির্লিপ্ত—জলস্থিত পদ্মপত্রের মত, যদিও বড়লোকের-ধনবানের যা যা থাকা উচিত তা সবই তার ছিল। শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণপঙ্কজ ছাড়া এ সংসারে সে কিছুই জানিত না। সকল কর্ম্মের মধ্যেও রাতদিন সে কেবল তাঁর সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিত। জগতের আর কোন কাজই তাকে এমন করে আপন কোলে টানিতে পারে নাই।

সুখে এইরূপে বহুকাল কাটিল। ভক্তবৎসল জগৎপতি নিজ ভক্তকে কঠোর পরীক্ষানলের ভিতর দিয়ে তার বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, অচল অটল বিশ্বাস দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা মাত্রই কাজ।

দিবাপগমে অমানিশার অন্ধকারের মত অকস্মাৎ কল্পনাতীত ভীষণ বিপদ আজ ধর্ম্মদাসের বাড়ীতে। বিশ্বাস হয় না। যে ভক্ত ধর্ম্মদাস নামেও ধর্ম্মদাস, কাজেও ধর্ম্মদাস. তার বাড়ীতে বিপদ! মিথ্যা কথা, সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। না, না, মিথ্যা কথা নয়; ঐ দেখ, আজ সত্য সত্যই তাদের নয়নের আনন্দ কুলপ্রদীপ একমাত্র পুত্র কলেরায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহলীলা শেষ করিয়া হতভাগ্য পিতামাতাকে কাঁদাইয়া চিরদিনের মত মায়ের স্নেহাঞ্চল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মা শোকে উন্মাদিনী, কিন্তু পিতা ধর্ম্মদাসের ভ্রূক্ষেপও নাই। নিয়মিত পূজা কার্য্যে অন্যান্য দিনেরই মত সে আজও রত। এদিকে দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই সেই দুর্নিবার্য্য সংক্রামক ব্যাধি শোকাকুলা পাগলিনী জননীর দেহ আশ্রয় করিয়া তাহার অসহ্য পুত্রশোক অল্পক্ষণের মধ্যে ভুলাইয়া পুত্রের মহাপথের সহযাত্রী করিল। এইরূপে একে একে নিমকের পুরাতন দাসদাসী, ততোধিক পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ, পুত্রবৎ সযত্নে প্রতিপালিত গরু-ঘোড়া, সকলেই অজানা দেশের অচেনা পথের পথিক হইল। তিন দিনের মধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। এখন বাকী কেবল ব্রাহ্মণ একা। ব্রাহ্মণ দেখিলেন সকলেই মরিয়াছে অথচ কাহারও সৎকার হয় নাই। সৎকার করিবার লোক ছিলও না এবং এখনও নাই। কারণ কে কাহার সৎকার করিবে? যাহারা

অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, তাহারা পীড়িতের সেবাতেই ব্যস্ত। এখন ব্রাহ্মণ একা কিরূপেই বা এসব শব সৎকার করিবে? সুতরাং ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ সব শব বস্ত্রাচ্ছাদিত করিল, ধীরে ধীরে প্রাণের ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে আসিল। পরে করযোড়ে মনে মনে বলিল, "প্রভো! তোমার দেওয়া যে সকল জঞ্জালের মধ্যে আমায় রেখেছিলে, তুমি আপনিই সে সব জঞ্জাল মুক্ত করে দিলে, এত দয়া তোমার দয়ালনাথ! ঠাকুর, তোমায় সংসারের কাজে ভুলে প্রাণমন ভরে ডাকতে পেতাম না, তাই প্রাণমন ভরে ডাকবার সুযোগ আজ তুমি করে দিয়েছ। চল এখন, এ দাসকে তোমার অভীষ্ট পথে নিয়ে চল। আমি ত কিছুই জানি না নাথ!" ব্রাহ্মণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। মুখে বিষাদের রেখামাত্র নাই, আনন্দভাতিতে মুখখানি উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, অম্লান। পথে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তির সহিত তার সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইবামাত্র সে ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, শুনলাম তোমার বাড়ীতে ভারী বিপদ, সকলেই—।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হাঁ, বিপদ আর কি, মালিকের কাছ থেকে তাঁদের ডাক এসেছিল তাই তাঁরা ডাকে গেছেন, তবে তাঁদের ভৌতিক দেহগুলোর সৎকার হয়নি। সৎকার করিবে কে? আমি একা, এ ত একার কাজ নয়! তাই সেগুলো কাপড় চোপড় চাপা দিয়ে রেখে চলে এসেছি, এখন আমার প্রভু যে পথে আমায় নিয়ে চলেছেন সেই পথেই আমি চলেছি।"

লোকটী বলিল,—"আহা, তুমি বড় আনাড়ি, এতগুলো লোক টপাটপ মরে গেল, একটু তদ্বির তদারকও করলে না! হায়, হায়! কি পরিতাপের বিষয়!"

ব্রাহ্মণ। "পরিতাপ! কেন পরিতাপ কিসে ভাই? যাঁর ধন তাঁর কাছে গেছে এতে আর পরিতাপের কি আছে? আর তদ্বির তদারকের কথা বলছো, তার কসুর বিন্দুমাত্র হয় নাই। তবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি ভাই! তোমার সঙ্গে আমার কখনো আলাপ নাই, অথচ তবু যেন তুমি আমার কত পরিচিত, কত আপনার। তুমি আমার সকল সংবাদই রাখ দেখছি। যাহোক তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণে বড় শান্তি হচ্ছে। তোমার নিবাস কোথা ভাই।

লোক। এতগুলো কথা পটাপট্ বলে ফেল্লে, কোন্‌টার আগে আর কোন্‌টারই বা পরে উত্তর দিব বল দেখি। বলি তুমি আমায় চেন না? তা চিনেও যদি চিনি না বল, তাহলে তার উপর আর কোন কথাই নেই। তামি কিন্তু সকলেরই খবর রাখি, সকলকেই চিনি, বিশেষ তোমাদের সকলকে; আর থাকি আমি এই নিকটেই। এখন চল দেখি তোমার বাড়ীতে, লোকগুলো দেখাশুনার অভাবে মড়ার মত পড়ে রয়েছে, দেখি তাদের যদি কিছু কিনারা করতে পারি। (কিনারার মালিক ভক্তের সঙ্গে তোমার একি শঠতা!)

ব্রাহ্মণ। তা তুমি বৈদ্যই হও আর যাই-ই হও, বাপু! আরোগ্য আর তোমাকে করতে হচ্ছে না তারা এতক্ষণ চিত্রগুপ্তের এজলাসে। বৃথা সে চেষ্টা, তারা তিনদিনের বাসিমড়া। বাজে বৃথা কাজ ছেড়ে চল চল, কথা বল্‌তে বল্‌তে আপনাপন গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাক্।

লোক। তুমি নিদারুণ নির্ম্মম হতে পারো, তা বলে আমি তো পারি না। (তা পারবে কেন প্রভু! ভক্তের চোখের জলের বাণ বহাইতে তোমার মত আর কে আছে নাথ!) যেতেই হবে তোমাকে সেখানে; এই আমি চল্লুম, দেখি তুমি না এসে কেমন থাকতে পার!

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা পাগল দেখছি। বল্‌ছো যখন, চল যাওয়া যাক।

উভয়ে বাড়ী পৌঁছিল। তাদের আগমন মাত্র মহাশ্মশানে পরিণত বাড়ী যেন হাসিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে বাহিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে গৃহে যাইয়া সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ ভিতরে কি হইতেছে, সে কি করিতেছে, জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ভিতরে আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে স্তম্ভিত বিস্মিত পুলকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রেমানন্দভরে অবিরলধারে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ছলনাময় প্রভো! ভক্তের সঙ্গে এত ছলনা, এত চাতুরী খেলা কেন নাথ! হৃদয়বল্লভ! এত ঘোরাঘুরি করিলে, কিন্তু কৈ? সাক্ষাৎ ভাবে ধরা ত দিলে না! সাক্ষাৎ-ভাবে ধরা দাও আর নাই দাও, ক্ষতি নাই। কারণ হে হৃদ্‌বিহারি! হৃদয়নিকুঞ্জে এই যে তোমায় অচ্ছেদ্য ভক্তিডোরে বেঁধে রেখেছি। ছলনাময় ঠাকুর! কেমন পালাবে পালাও দেখি!" অমানিশার অন্ধকার কাটিয়া গেল। পূর্ণিমার প্রফুল্ল কুমুদিনীনাথ আবার গগনে উদয় হইল, নিষ্কাম নির্লিপ্ত ভক্ত ব্রাহ্মণের সংসার আবার পূর্ব্ববৎ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। তাই বলি আসুন! সকলে হৃদয়ের নিষ্কাম অহৈতুকী সরল বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে ধর্ম্মদাসের মত ধর্ম্মদাস হতে চেষ্টা করি।

এসো।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু।

এস হৃদয়-কুসুম-বনে মম মানস-ভৃঙ্গারী !
এস নীল-যমুনা-সম মানস-কাকলী শৃঙ্গারী !
এস প্রভাতা-রজনী অনুরাগী !
এস নব-পরিমলযুক্ত ফুলরাগী !
এস উদ্যান মাঝে চির মরমের রসবিহারী !
এস শ্যামল-মধুমাস-বিলাসী !
এস শ্বেত-পুণ্ডরীক-অভিলাষী !
এস মোহন শোভন মধুচোরা মন-তুষকারী !
এস কোরক সদৃশ চারু-আঁখি !
এস গুঞ্জন-সুধা স্বরগ পাখি !
এস ছত্রিশ সুর সুমধুর মহু-মধু উজাড়ি ! !

স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার প্রবর W. C. Bonnerjee.

[লেখক,—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,]

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রগণ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(১৫)

প্রথম পুত্র গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আপিসে আসিতে দেরী করিতেন বলিয়া এটর্ণি অ্যালেন সাহেব বলিলেন গিরীশচন্দ্রকে প্রত্যহ সকালে আপিসে আসিতে হইবে। [illegible] তিনি সকালে গিয়াছিলেন। কিন্তু মাসিক [illegible] টাকায় গিরীশচন্দ্রের সাংসারিক খরচ নির্ব্বাহ হইত না, সে কারণ তাঁহাকে প্রাতে ও বৈকালে অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হইত, তজ্জন্য তিনি সময়ে আপিসে যাইতে পারিতেন না। অবশেষে অ্যালেন সাহেব স্থির করিলেন যে

মাসিক ৪০০৲ চারিশত টাকা বেতন পাইলে গিরীশচন্দ্র সকালের অতিরিক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে আপিসে যাইতে পারিবে। এটর্ণি অ্যালেন সাহেব তাহার মাহিনা ৪০০৲ টাকা মাসিক করিয়া দিলেন, এবং এটর্ণি লণ্ডমুয়ার সাহেবের অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত উক্ত মাহিনা গিরীশচন্দ্র পাইতেন। পরে তিনি উক্ত আপিসের অংশীদার হন। গিরীশচন্দ্র ৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত আপিসের অংশীদার হন. তখন উক্ত আপিসের নাম Allen Judge and Bonnerjee হয়।

যখন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হয় তখন এইরূপ জনশ্রুতি রটিল যে এটর্ণিগণকে Appellate Side-এ দাঁড়াইয়া সওয়াল জবাব করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে অ্যালেন সাহেব এটর্ণি নাম ঘুচাইয়া উকিল বলিয়া Appellate Side (আপিল বিভাগে) পসার বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অংশ মিঃ W, J, Judge এবং গিরীশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আপিস Judge and Bonnerjee নামে খ্যাত ছিল।

গিরীশচন্দ্র কলিকাতা High Courtএর আদিম বিভাগে বাঙ্গালী এটর্ণি-গণের অগ্রণী ও মহারথী ছিলেন। যখন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উচ্চ ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত করিতে ইংরেজগণ আপত্তি করিয়াছিলেন. তখন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ও গিরীশচন্দ্রের নিকট প্রশংসাপত্র পাইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তিনি একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন ; বাটীতে দোল দুর্গোৎসব পূজাদি করিতেন। বাটীতে শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত জিউ ঠাকুরের নিত্যসেবা হইত। যখন তাঁহার অমতে তাঁহার পুত্র উমেশচন্দ্র বিলাত গমন করেন, তাহাতে তিনি বিরক্ত হন এবং উমেশচন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে পত্র পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন। উমেশচন্দ্র বৃত্তি পাইয়া বিলাতে গমন করেন, তাহা পাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটে, তাহাতে অর্থের জন্য চিঠি লিখিতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি চিঠির জবাব দিতে দেরী করেন, তাহাতে উমেশচন্দ্র তাঁহার পিতাকে লিখিলেন যদ্যপি তিনি টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তিনি খবর পাইবেন যে তাঁহার পুত্র বিদেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উক্ত চিঠি পাইয়া তিনি টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্র প্রাণপণে পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং তাহাতে কৃত-কার্য্য হন। গিরীশচন্দ্র ক্রমশঃ এটর্ণিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। কোন ইংরেজ এটর্ণি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। Wellington

Streetএর অক্রূর দত্তের বংশধর ৺যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বর্ত্তমান লেখকের সহিত কথাবার্ত্তায় গিরীশচন্দ্রের সম্বন্ধে বলেন :—"আমাদের যখন Partition Suit হাইকোর্টে চলিতে থাকে তখন Commission of Partitionএর বৈঠক আমাদের বাটীতে হইত। অন্যান্য অংশীদারগণের সাহেব attorney ছিল কিন্তু আমাদের attorney গিরীশচন্দ্র ছিলেন। গিরীশচন্দ্রের আগমনের পূর্ব্বে উক্ত ইংরেজ এটর্ণি নানাবিধ আইনের তর্ক উপস্থাপিত করিতেন কিন্তু যখন গিরীশচন্দ্র বৈঠকে আসিতেন, তখন ইংরেজ এটর্ণির বাক্‌রোধ হইত, কারণ ইতিপূর্ব্বে দুই তিনবার তিনি তর্কে পরাস্ত হইয়া অতিশয় অপমানিত হইয়াছিলেন। গিরীশচন্দ্র একজন সূক্ষ্মদর্শী আইনজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার মুসবিদা সকলে প্রশংসা করিত। একদিবস বর্ত্তমান লেখকের সমক্ষে কথায় কথায় উমেশচন্দ্র তাঁহার পিতার মুসবিদা ক্ষমতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—"এক্ষণে লোকে আমার মুসবিদা সুখ্যাতি করে কিন্তু বাবার ন্যায় আমার মুসবিদা কিছুতেই উৎকৃষ্ট হয় না। যদ্যপি আমি একের চৌষট্টি অংশ মুসবিদা কৌশল শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ মনে করি। গিরীশচন্দ্র দয়াশীল, ধীরপ্রকৃতি, মিষ্টভাষী লোক ছিলেন।

তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (বর্ত্তমান লেখকের পিতাকে) বড় ভালবাসিতেন। তিনি আইন পুস্তক পাঠে নিমগ্ন থাকিবেন, কিন্তু বাটীতে ক্রিয়াকলাপ হইলে তিনি তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করিতেন।

তিনি এরূপ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন যে তাঁহার অপর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ ওরফে পণ্ডিত যখন বি-এ পাশ করেন, তখন তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন—"শম্ভু, আমাদের বংশে পণ্ডিত প্রথম বি-এ পাশ করিয়াছে এক্ষণে সে বি-এল অর্থাৎ আইন পড়িবে, তজ্জন্য তাহার পড়ার সাহায্যের জন্য কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের জজ রামবাগানের রসময় দত্তের Law Libray আমি ১০০০৲ টাকায় কিনিয়াছি, আমি উহাকে তাহা দান করিলাম"।

(ক্রমশঃ)

ধর্ষিতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত যোগানন্দ রায়।

(ক)

"কেমন আছ ?"

"ভাল নাই !"

"আবার কি জ্বর এসেছে ?"

"হা, গা-টা শীত শীত করছে।"

"তবে বসে আছ কেন ? শোওগে যাও।"

"দিনরাত্রি শুতে পারছি না।"

পরিমলের শেষ কথাটা শুনে যোগজীবন তার সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বেদনা যেন মন্ত্রবলে টেনে ফেলে, পরির পাশে বসে তার ক্ষীণ হাত দুটি ধরে বললে "পরি ! চল তোমায় নিয়ে একবার পুরী যাই। যদি সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার জ্বরের কিছু উপশম হয়। আর দেরী করতে পারি না, যাব যাব করে আজ প্রায় দুই মাস হ'য়ে গেল।"

"না আর কোথাও যাব না ; আর তুমি নিয়েই বা যাবে কি করে ? তুমি আমার চিকিৎসার জন্য দিন দিন বাজারে দেনাদার হয়ে পড়্‌চ। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম কর্‌চ। আর দেরী করে আমায় কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। যা হবার তা এইখানেই হবে।" এই বলে পরিমল তার উদাস করুণ দৃষ্টি নিয়ে যোগজীবনের দিকে চাইল।

সর্ব্বস্বহারা যোগজীবন অনেকদিন হতেই পরিমলের কাছে এইরূপ উত্তর পাবে বলে প্রস্তুত ছিল। সে আর বেশী কথা না বলিয়া বলিল,—"আচ্ছা ভেবে দেখি। এখন তুমি এস ; মনে হচ্ছে আজ তোমার জ্বর খুব বেশী।"

"না তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সারাদিন খেটে-খুটে এসে এইখানে একটু বস, তারপর হাত মুখ ধোও। আমি চা-টা করে দিই, হালুয়া করে রেখেছি। বেশী দেরী হবে না।"

"পরি ! তুমি কি আমায় আর বাড়ী আসতে দেবে না ? আমি মানুষ না পশু ?"

"ছি ! ছি ! ওকি কথা বলছ ? আমার রোজ রোজ জ্বর হবে, আমি রোগ ভোগ করব, আর তুমি না খেয়ে, খেটেখুটে এনে, লোকের বাড়ী দেনা-

করে আমার খাবার যোগাড় করবে! তুমি সুস্থ শরীরকে না খেয়ে আমার জন্য অসুস্থ করবে! যদি (ঈশ্বর না করুন) তোমার কিছু হয়, তবে যাকে বাঁচাবার জন্য মান ইজ্জৎ শরীর সব খোয়াতে বসচ, তার দশা কি হবে?"

"তা সত্য পরি! তাই বলে আশা ত্যাগ করতে পারি না। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন চেষ্টা কর্ত্তব্য, শুধু কর্ত্তব্য বলে নয়, প্রাণের মধ্যে যে সাড়া জেগে আছে, তাকে ত আর মুছে ফেলতে পারিনে—তা ত আর যাবার নয়। যেমন করে হোক, আগামী শুক্রবার আমরা পুরী যাব, তারপর যা হয় হবে।" এই বলিয়া যোগজীবন পরিমলের অবিন্যস্ত চূর্ণ কুন্তলগুলিকে টানিয়া সমান করিয়া দিতে লাগিল।

(খ)

যোগজীবন কোন এক সুদূর পল্লীগ্রামে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছিল। কিন্তু সে সাবালক হবার পূর্ব্বেই পৈতৃক বিষয়-আশয় সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঐ গ্রামেরই এক গরীব ব্রাহ্মণকন্যার সহিত যোগজীবনের বিবাহ হয়েছিল।

যোগজীবনের শ্বশুর অতি দীন ব্রাহ্মণ ছিলেন. একমাত্র কন্যার বিবাহের জন্য তিনি সমাজে এমনি লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন যাতে বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণকে এ পাপ সংসার ছেড়ে কোন অজানা রাজ্যে চলে যেতে হয়েছিল। পরিমলের মা কুন্তলা দেবীও অনেকদিনই পরপারে চলে গিয়েছিলেন। থাকবার মধ্যে এক বিধবা পিসিমা ছাড়া কেহ ছিল না। বিধবার আকুল ক্রন্দন ও পরিমলের বেদনাকাতর মলিন মুখ দেখিয়া সমাজের প্রাণ টলিল না। এ করুণ দৃশ্যে যোগজীবনের প্রাণে আঘাত লাগিল বটে কিন্তু পিতার বিনা অনুমতিতে সে কোন সাহস করিতে পারিল না। তবু সে নিভৃতে পরির পিসিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"পিসি মা! আপনি ভাববেন না, পরিকে যদি কেউ বিবাহ না করে, তবে আপনি যদি মত করেন আমি পরিকে বিবাহ করব।" যোগজীবনের কথায় যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে পরির পিসিমা চোখে অন্ধকার দেখলেন. সমস্ত পৃথিবী তাঁর চক্ষে নূতন রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তিনি লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়া পরিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পরি! পরি! শিগ্‌গীর এদিকে আয়, মা! আজ বুঝি ভগবান সদয় হয়েছেন! তোর জন্য এতদিনে

নিশ্চিন্ত হলাম। বাবা যোগজীবন! তোমাকে আর কি বলব এ বৃদ্ধা যদি কোনদিন পুণ্য সঞ্চয় করে থাকে, তবে আশীর্ব্বাদ করচি জন্মজন্ম সুখী হবে। বাবা! দুঃখিনীর অবস্থা সমস্তই বুঝেছ, বল বাবা! আমায় কি করতে হবে!"

"যেমন আছেন তেমনি থাকুন, আমি বাবার মত করিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করব।" এই বলিয়া যোগজীবন তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তারপর যোগজীবনের পিতার হঠাৎ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় যোগজীবন বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিল না। পিতার সেবাশুশ্রূষা কালীন তিনি তাহাকে বৈষয়িক উপদেশ দিতেন। এই রকম দুই মাস থাকার পর যোগজীবনের পিতা যোগজীবনকে নানা বিপদে ফেলিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন।

যোগজীবন নানা সাধ্যসাধনা করিয়াও বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। তবু সে এ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়াও বিবাহের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া পরিকে বিবাহ করেছিল।

পরিমলের দিগন্ত ব্যাপ্ত সৌরভে যোগজীবনের সমস্ত চিন্তা ডুবে থাকত। অপরূপ রূপমাধুর্য্য, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অমিয় ব্যবহার দিয়ে বিশ্ব-শিল্পী পরিকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরি স্বামীকে সুখী করবার জন্য একটি দণ্ডও বিশ্রাম করিত না।

দিন যায়, দিন আসে। যোগজীবনের দিন দিন অচল হইয়া দাঁড়াইল। তারপর পরিরই পরামর্শ নিয়ে কলিকাতায় একখানা ঘর ভাড়া করে কোন সওদাগরি আপিসে চাকরিতে আসে। সে আজ তিন বৎসরের কথা।

(গ)

আজ প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হয়ে গিয়েছে, পরিমলকে পুরী চক্রতীর্থে যোগজীবন আনিয়াছে। পুরীতে আসার পর হইতে পরিমলের জ্বর বন্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব লাবণ্য অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যহ সকাল বিকালে যোগজীবন পরিমলকে লইয়া সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যায়, আর সমুদ্রের উপর সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখিয়া, বিশ্ববিভুর রচনাকৌশলের সমালোচনা করিতে করিতে বাসায় ফেরে। নবীন উৎসাহে যোগজীবন পরিমলের প্রত্যেক আশাটিকে পরিপূরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে, আর পরি স্বামীর এ

উৎসাহে বাধা দেয়। তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহ দিন দিন সুখময় হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়াইয়া থাকিল।

চক্রতীর্থে বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়েরা চেঞ্জে আসিয়াছেন, তাঁদের সহিত পরির বেশ আড্ডা জমিয়া গিয়াছে, যোগজীবনেরও বন্ধুর দল দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। মেয়েরা দল বাঁধিয়া বেড়াইতে যায় পরিকেও ডাকিতে আসে, কিন্তু পরি সে ডাক মোটেই পছন্দ কর্ত্তো না। তার ইচ্ছা নিজের জিনিষটী তার কাছ ছাড়া না হয়, কিন্তু সঙ্গিনীগণ কিছুতেই তাকে ছাড়ত না, তাই বাধ্য হয়ে দুজনকে কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এমনই আরও ১৫ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, পরির পূর্ব্ব স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তার সেই রক্তিম গোলাপ নিন্দিতবর্ণ শত সহস্র আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার লাবণ্য রাশি শ্রাবণের প্লাবনের মত দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। যোগজীবনের সে রূপ, সে মাধুর্য্য দেখিয়া আর মিটিত না—অপলক নয়নে চেয়ে তার চোখ ঝল্‌সে যেত। পরিও স্বামীর সোহাগে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌তো।

(ঘ)

সে দিন পুরীতে জগন্নাথ দেবের কি একটা পর্ব্ব ছিল। তাই পরি তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সারিয়া যোগজীবনকে বলিল, —"আজ সকালে একটু মন্দিরে যাব।" যোগজীবনের সেদিন অসুখ হওয়ায় বলিল, "তুমি যাও পরি ওদের সঙ্গে, আমি আজ আর যাব না—পেটটা ভাল নেই, তবে সন্ধ্যার দিকে যেতে পারি।" পরি যে সোহাগ নিয়ে এসেছিল, যোগজীবনের কথা শুনিয়া বলিল "কি অসুখ করেছে. তোমার? কই আমাকে বলনি ত!"

"ও এমন কিছু নয়. যদি রাস্তায় বেশী হয় তাই বল্‌ছিলাম।"

"তবে আর আমি যাব না।"

"না তা হবে না, তুমি যাও, আমি পারি ত যাচ্ছি, তবে একটু দেরী হবে." এই বলিয়া যোগজীবন পরির দিকে সহাস্যে চাহিল।

পরি আর কোন কথা না বলিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া পুরীর মন্দিরের দিকে রওনা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ২।১ বার দাস্ত হওয়ায় যোগজীবন আর মন্দিরের দিকে যাইতে পারে নাই। রাত্রি ৭॥০ টা বাজিয়া গেল এখনও নানা জনে নানা কথা বলিতে সুরু করিয়া দিল, কেহ বলিল "হিন্দু মুসলমানের

প্যাক্টের ফলে এই শোচনীয় পরিণাম। কেহ বলিল "এ সাম্প্রদায়িক বিরোধে আর হিন্দুর জাত থাকে না।" কেহ বলিল "মন্দির মধ্যে যখন এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে তখন আর ধর্ম্ম থাকে না" ইত্যাদি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
গ্রন্থের সং
সং

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন*

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা—সম্মুখে দৃশ্যমান নাট্যশালায় গোপিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

—*—

কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ভাসিয়ে দেহ, সই!
এখন কুল কিনারা পাই লো কই?
হরি বলে একধ্যানেতে রই।
উঠ্‌ছে সদা আতঙ্ক তুফান,
ডুবে গেছে কুলমান, বুঝি যায় লো শেষে প্রাণ!
পারের কে জানে সন্ধান
সেই অকূলের কাণ্ডারী বই?

(গোপিনীগণের প্রস্থান)

(পট-পরিবর্ত্তন)

রাজসভার অপর পার্শ্ব।

(ভীম ও নকুলের প্রবেশ)

ভীম। নকুল!
বুঝিলা কেমন আজি কৌরব মিলন?

* সত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নকুল। অস্থির সর্ব্বথা যথা মানব জীবন।
শুভ দর্শন লক্ষণ কোথাও দেখিনি।
মানি—
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মরাজ দয়া অবতার ;
কিন্তু জানি, গান্ধারীকুমার – হৃদে তা'র
নাহি ক্ষমালেশ কভু, বিশেষ মায়াবী—
শকুনি মাতুল মন্ত্রদাতা ; মৈত্র-সূত্র
মিটিবে যে কোথা, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে না জানি !

ভীম। মায়া মোহ মন্ত্র, শত্রু মিত্র নাহি মানি ;
মাত্র জানি, মম প্রচণ্ড অশনি সম
গদাঘাতে, সবংশে সে যাইবে নিপাতে
পাণ্ডবে হিংসিবে যেই জন।

নকুল। হের আর্য্য !
দুর্য্যোধন পশিল সে বিভ্রম-আগারে।
হোথা লেখা পড়ি দ্বারে, আমা দোঁহে চাহি
শকুনিরে কি বলিল ; হের পুনঃ দোঁহে
হাসিল, মিলিল যেন পাপ কলি সনে !

ভীম। খল কভু স্বভাব না ছাড়িবে জীবনে !
বুঝিলা কি হাসিয়া কহিল ?—"মোরে ঠকাইল !"
যেন নাহি চিনি শঠ-শ্রেষ্ঠ দুইজনে,
কিবা তা'র পশুবুদ্ধি ভ্রাতা দুঃশাসনে,
সখা সুতপুত্র কর্ণে, পিতা অন্ধরাজে,
কিম্বা সেই গান্ধারী মাতারে, ধর্ম্মরাজ
যা'রে মাতা হতে অধিক শ্রদ্ধায় পূজে !

নকুল। মোর মতে গান্ধারী মাতার নাহি দোষ !
পরম সন্তোষ তাঁর উভয় কল্যাণে।

ভীম। তাই বুঝি, যবে পুত্র বাহুবলে মোরে
না আঁটিল, মাতা নয়নে বসন বান্ধি
কৈল তপ কতদিন—যদি ভীম পায়
পরাজয় ? হে নকুল ! বাহুদ্বয় মোর,

শঙ্কার নিলয় সদা গান্ধারী কুমারগণে।

নকুল। কিন্তু দেব ! মোর মনে লয় এইমত,
কৈলা তপ মাতা পুত্রের কল্যাণ আশে।

ভীম। সত্য ! সর্পবিষ নাশ তরে নাগমাতা
কদ্রু যথা তপ করে। বিদিত সংসারে
বিশ্বশ্রবা মুনিপুত্র লঙ্কার রাবণ
ব্রাহ্মণ, রাক্ষস হ'ল মাতামহ দোষে।
হে নকুল ! কহ ভাই, এ হেন দুর্জ্জন
কুরুবংশে কে কবে জন্মিল ? খাদ্যে বিষ,
গৃহে অগ্নি দিল, নিল কাড়ি রাজ্যখণ্ড
পুরী সিংহাসন, পিতৃহীন মোরা ব'লে ;
ম'লে এই দুঃখ নাহি যায় ! কহ এবে—
গান্ধারীর অভিপ্রায় নাহি ছিল তায়।
ভ্রাতা-ভগ্নী গান্ধারী-শকুনি, চিরদিন
জানি শুনি দোঁহে ভালমতে, মাত্র
নারিনু বুঝাতে তবু পাণ্ডবপ্রধানে,
তাহে পুনঃ অর্জ্জুন শুনিয়া নাহি শুনে !

নকুল। আর্য্য ! কিন্তু বৃথা মোরা গান্ধারীরে দোষি,
মৈত্র-অভিলাষী কৌরব কপটী সনে
একা ধর্ম্মরাজ, মোরা জ্যেষ্ঠ অনুগামী।

ভীম। রে নকুল ! মনদুঃখ কব কায় ? ভাই !
নিজ তরে কভু চিন্তি নাই, যমে না ডরাই কভু।
যবে দুষ্ট মোরে বিষপান করাইয়া
হস্ত-পদ-মস্তক বাঁধিয়া, ভাসাইয়া দিল জলে,
অচেতন গেনু চলি অতল পাতালে।
শুধু—
ধর্ম্মবলে সর্পদংশে মরিয়া বাঁচিনু ;
খাইনু অমৃতকুণ্ড জীবন সুসার ;
ধরি হাজার হাজার মত্তহস্তীবল,
হেয় বজ্রসার হৈল দেহ মোর তায়।

কিন্তু জতুগৃহদাহ কথা, চিরদিন
অন্তরে আছে রে গাঁথা, সে ব্যথা ভুলিতে
কই পারি ? আজি ইন্দ্রপ্রস্থ সিংহাসনে—
পড়ে মনে, যবে ফুলসম সুকুমার
তোরা, সাথে স্বর্ণলতা জননী আমার,
করি—
সমস্ত রজনী বনপথে আগুসার,
সবে তৃষাতুর পড়িলি শাল্মলী তলে
শ্রমে অচেতন ! এই দুর্য্যোধন সেই
পড়েছিল মনে ! কই ভুলিনি কখন,
ভুলিব না, ভুলিব না ! তবে যদি কভু
পাই দ্বন্দ্বে, চির আশা মনের আনন্দে
ভুলিব রে পূর্ণশোধ দিব যেইকালে।

নকুল। আর্য্য ! হের দুষ্ট পড়িল সে ভ্রমজালে,
আর পথ না পাইবে।

ভীম। অপূর্ব্ব মায়ায়
নির্ম্মিলা আগার ময়দানব আপনি ;
শত্রু চিনি মাত্র প্রবেশিলে একবার ;
হের
দুরাচার না দেখে নয়নে হিংসা বশে,
বদ্ধ পাশে হতাশে লজ্জায় না ডাকিবে
কা'রে তাহে পুনঃপুনঃ বিভ্রমে পড়িবে,
রঙ্গ দেখি এইবার !

নকুল। হোঃ হোঃ কোথা দ্বার !—আবার ফিরিল।

ভীম। চল ! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজসভা।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

যুধিষ্ঠির। সহদেব !
ফিরিলা কি হেতু ভাই ? সুযোধন সঙ্গে
কেহ নাই মো সবার মাঝে, হেন নাহি
সাজে রে কখন।

সহ। হে রাজন ! তব আজ্ঞামতে
এইমাত্র দুর্য্যোধন সাথে ছিনু আমি,
মাতুল সহিতে কিবা মন্ত্রণা-মগন
না বুঝিনু, প্রবেশিলা বিভ্রম আগারে,
দিলা অগ্রে বিদায় আমারে।
গান্ধারকুমারে হেরিলাম সপ্রতিভ,
কত মত উল্লাসিত মন। দুর্য্যোধন
অতি বিচঞ্চল, ঈর্ষা-বিরক্তি-রঞ্জিত
বিবর্ণ বদন তা'র না লাগিল ভাল।

ভীম। হের, হোথা কৃত্রিম-স্ফটিক-বাপী-তটে,
খল-বুদ্ধি চাহে চারিভিতে ! হের রঙ্গ,
দুর্য্যোধন তুলিল বসন জল জানি !
ধন্য বলি মানি,—
কৌরব প্রবীন হেন রত্ন পরীক্ষায়।

নকুল। তবু অহঙ্কারে নাহি জিজ্ঞাসিবে কায় !

অর্জ্জুন। বারে বারে যাইছে কৃত্রিম দ্বারে,
পুনঃপুনঃ ফিরে !

সহ। হের খলমতি শকুনিরে,
সদা সতর্ক কৌরব পিছে যায় ধীরে !

ভীম। হোঃ—হোঃ !
এইবার সত্য নিমজ্জন বাপীনীরে !

তীরে স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত, মিলিত সে
সুস্বচ্ছ-সলিলে, তায় বুঝিবে কি করে ?

যুধি। ওহো নকুল ! ধাওরে সত্বরে, কৌরবে
দেহ নব সুযোগ্য পিন্ধন পরিচ্ছদ।
ওহো ! কি বিষাদ, প্রমোদে প্রমাদ হ'ল !

ভীম। রাজা !
খল বুদ্ধিদোষে নিজে বিপাকে পড়িল।
হইল প্রকাশ ভাল দুষ্ট অভিপ্রায়। (নকুলের প্রতি)
পশিবে আসিবে অলক্ষিতে, কোনমতে
যেন দুষ্ট দ্বার নাহি পায়।

অর্জ্জুন। হের, উঠিল চলিল রোষভরে,
দিবে দোষ শিল্পিরে বা আমা সবাকারে,
কেবা জানে ?

ভীম। হ'য়ে উন্মত্ত ঈর্ষায়—
প্রাকারে মস্তক লাগি গেল পড়ি ভূমে !

যুধি। সহদেব ! সত্বর দেখায়ে পথ আন দুর্য্যোধনে।
(সহদেবের প্রস্থান)
মহামানী অতি, কতেক অপ্রীতি
হইছে সম্প্রতি নাহি জানি।
উপহাস ত্যজ বৃকোদর !
কৌরব ঈশ্বর—নহে সে প্রাকৃত ক্ষুদ্রজন !

ভীম। মহাশত্রু গান্ধারীনন্দন !
নহে ধর্ম্মরাজ মন কেমনে ভুলাতে হয় শক্ত ?—
বৈরতা প্রত্যক্ষ ব্যক্ত হইল মায়াগারে।
সাগর শুষিবে রাজা ! সূর্য্য নিবে যাবে,
বহ্নি না জ্বলিবে, হবে হেন তবু জেন
খল জন পরহিংসা কভু না ছাড়িবে।

যুধি। শুন ভাই ! সংশয় বিচারে,
সত্যাসত্য করিতে নির্ণয়, কভু
মায়াগৃহ নয় প্রকৃষ্ট পরীক্ষা স্থল !

ভীম। রাজন !
বিনা মায়া, মায়া ভেদ হয় বা কেমনে ?
যেমন দর্পণে নিজ মুখ ছায়া পাই।
কহি তাই,
দুষ্টজনে অধিক বিশ্বাস নহে ভাল।

যুধি। হে ভাম, নিশ্চয় ! সন্দেহাকুলিত চিত্ত—
উঠে যায় সংশয় কুতর্ক নিত্য, মাত্র
অশুভ নিমিত্ত, ঘটে তায় বিষম জঞ্জাল ;
ক্ষণকাল শান্তি নাহি পায়।

ভীম। রাজা হ'য়ে শান্তি সদা চায়, রাজ্য হতে
শাসন পলায়, মঙ্গল কোথায় তা'র ?
প্রজার রক্ষণ-ধর্ম্ম পালিতে অক্ষম।
মিত্রজন বিশ্বাস না যায়, শত্রু তা'র
রন্ধ্র পায়, ক্ষমায় কদাচ আঁটি থলে।
দম বিনা দুষ্ট নাহি ডরে, শান্তি স্থলে
অশান্তি বিহরে, হয় পরে ভেদ ছলে,
কৌশলে বিফল বল, উপায় সম্বল
হারা হয়। আত্মছিদ্র ঢাকা নাহি থাকে,
গুপ্তমন্ত্র চর চক্ষে দেখে, পরপক্ষে
নিত্য বল বাড়ে, বিনা দণ্ড আচরণ
বশ নহে বৈরিজন ; ক্ষত্র ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় লক্ষণ
বলি তারে—বাহুবলে সবারে রাখিবে
করতলে। শান্তিগুণ ব্রাহ্মণের শোভে।

যুধি। ভাই !
ক্ষমা কভু ত্যজিব না প্রতিহিংসা লোভে।
লোভ হ'তে জন্মে ক্রোধ হিংসা সহবাসে
(দোঁহে দোঁহা চির সহচর সহচরী)
উদয় দুরন্ত কলি কলুষিত কায়া—
ভগিনী হরিল কামে, সেই সমাগমে
করিল উৎপত্তি পুত্র মহাময়,—

মৃত্যুকন্যা—সেও পুনঃ ভ্রাতা সহযোগে
প্রসবিলা অক্ষয় নিরয়, যেই নামে
কম্পিত হৃদয়। ভাই! এ ভারতকুলে
মোরা পাণ্ডুর তনয় লোভে ভুলি
অধর্ম্ম আচরি, পিতৃ পিতামহ নামে
কলঙ্ক লেপিব কোন্ লাজে?

অর্জ্জুন। কনিষ্ঠ যে,
জ্যেষ্ঠ অনুগামী সদা পাণ্ডবের মাঝে।

ভীম। কভু ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা না করি হেলন,
কিন্তু সেই খল জ্ঞাতি-শত্রুর কৌশল
জাগে মোর হৃদয়ে সদাই, কহি ভাই!

যুধি। শুন ভাই!
সেই শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী,
মুরারী চরণতরী আশ্রয়ী যে জন,
এ ভব পাথারে কদাচিত হয় সে মগন।
শ্রীমধুসূদন আপনি কাণ্ডারী হরি,—
কৃপাকরি হেলায় তরায় সর্ব্বজনে।
সদা সত্য সনাতন ধর্ম্মপদে মতি,
কুটনীতি না করি অনুসরণ কভু!
স্থির জানি, দয়া, ক্ষমা—ধর্ম্ম সাধারণ,
কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র আদি জন,
স্বধর্ম্ম হেলনে নরের নিস্তার নাহি
কভু! অন্য যুক্তি নাহি মানি।

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম অবতার তুমি পাণ্ডবের প্রভু,
বেদের প্রমাণ বাক্য তব।

ভীম। কি আর কহিব?
রণে, বনে, ধর্ম্মের রহিব অনুচর,
কিন্তু জানি, পর যেই সদা রবে পর।

(ইন্দ্রসেনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় ধর্ম্মরাজ!
দেব! কৌরব ঈশ্বর আদেশিলা
সাজিতে স্বগণে—যাইতে হস্তিনা এবে।

যুধি। আর না রহিবে? ভাল, তোমা সবে রহ
তবে সতর্ক তৎপর।

(ইন্দ্রসেনের প্রস্থান ও নকুলের প্রবেশ)

কহ ভাই! কি সংবাদ তব। দেখিলা কি
সুযোধন অপ্রসন্ন অথবা অধীর?

নকুল। স্থির—যথা অগ্নিগর্ভ গিরিবর;
অন্তর জ্বলিছে, কিন্তু বাহ্য দৃশ্যে
বিভিন্ন বিস্তর!
সুন্দর নীরদকান্তি ভ্রান্তি হয় তায়।

(সহদেব, দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রবেশ)

সহদেব। জয় ধর্ম্মরাজ! সমাগত হেথা
মাতুল শকুনি সনে কৌরব-প্রধান।

যুধি। একি ভাই! এবে হস্তিনা যাইবে শুনি!
বাড়িল রজনী, মানি বড় দুঃখ হৃদে,
ছিল ভাল বিশ্রাম লভিলে আজি হেথা।

দুর্য্যো। হে রাজন! কিবা বড় কথা! কিন্তু,
সে পুর নহে ত বহুদূর, যাব ক্ষণে;
বহুদিন ত্যজেছি হস্তিনা।

শকুনি। হে রাজেন্দ্র! এ ভারতে,
তব সম নহিল, নহিবে অন্যজনা—
পুণ্যকর্ম্মা সত্যধর্ম্মা আত্মীয়বৎসল।
পাইনু পরম প্রীতি তব সমাগমে।
প্রীতমনে এবে সবে দেহ হে বিদায়!

যুধি। হে মাতুল! ভাগ্য মোর, করি পদার্পণ

ইন্দ্রপ্রস্থধামে, ভ্রাতৃগণ সনে মোরে
করিলা সন্তোষ ! (দুর্য্যোধনের প্রতি)
শুন ভাই, অধিক না কহিব তোমায়,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি, নীতিজ্ঞানী ;
রাজগুণে তুলনে কে আছে তোমা সম ?
কৌরব সনাথ আজি তোমার পালনে।
দণ্ডাদি চালনে কিম্বা প্রজার শাসনে,
সাগরান্ত ব্যাপ্ত তব দীপ্তি খ্যাতি যত,
তত যশ রাখ ক্ষমা দয়া সত্য গুণে।
যেই গুণে পাবে হরি ব্রহ্ম সনাতনে ;
হেন প্রেমে জিনি শত্রু কিবা চিন্তা তার ?
প্রেমের সাম্রাজ্য রাজা, করহ বিস্তার,
প্রেমে কুরু অধিকার করহ পালন।
শুন, ভাই মোরা পঞ্চজন, তোমা শত
সহোদর, পঞ্চোত্তর শতভাই, অন্য
কভু ভাবি নাই, প্রীতি পাই তোমার মিলনে ;
কি বলিব, ভাই বলি রেখ ভাই মনে।

দুর্য্যো। সবে সদা সন্তোষ আমার ; তবে
বিদায় এখন, হে রাজন !

যুধি। হে নকুল ! সহদেব ! হওরে দোসর দুইজনে।

(সহদেব, নকুল, দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রস্থান)

চল ভাই ! পুরী প্রবেশিব এইক্ষণে।

তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণ। হে পার্থ ! যে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে তাহা পরম তত্ত্ব বলিয়া কথিত। প্রকৃতি পুরুষের মিলিত শক্তিতে

জগতের স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি। শরীরের নাম ক্ষেত্র ; এই জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। সংসারের যাবতীয় ক্ষেত্রই আমার বিদিত ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের যে শক্তি, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। ক্ষেত্র বিশেষের ধর্ম্ম কি প্রকার, কোন্ ক্ষেত্র কিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, সৃষ্টি প্রকরণের কিরূপ প্রণালী, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ! তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ উৎপত্তির হেতু, বিবিধ বেদ এবং তাহার প্রকৃত অর্থ যেরূপে নিরূপণ করিয়াছেন, তটস্থ লক্ষণে ও স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছেন, সমাহিতচিত্তে তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকাশক্তি, মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, এইগুলি ক্ষেত্রধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত। আত্মাবমাননা, অদাম্ভিকতা, নিরহঙ্কারিতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জ্জব, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও অজ্ঞান কৃত কার্য্যের বারম্বার আন্দোলন, প্রীতিত্যাগ পুত্র কলত্রাদির প্রতি অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্টে সমজ্ঞান, মৎপ্রতি অকপট ভক্তি, নির্জ্জন বাস, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগ, ইহাই জ্ঞান ; এই জ্ঞানের অভাবেই অজ্ঞান। এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই লোকে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অনাদি অক্ষয় পরব্রহ্মই জ্ঞেয় ; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ, মস্তক ও বদন বিরাজিত আছে ; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন ; বিশ্বসংসারের সমস্ত পদার্থ আবৃত করিয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন ; তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়াও রূপ রস গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তিনি আসক্তিশূন্য অথচ সমস্ত সৃষ্টবস্তুর আধার ; তিনি নির্গুণ অথচ সর্ব্বগুণের আশ্রয় ; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ; তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, অতি সন্নিকৃষ্ট হইয়াও অতি দূরবর্ত্তী ; ভূত মধ্যে অবিভক্তরূপে বাস করিয়াও তিনি সর্ব্বাংশে বিভক্ত ; ভূতগণের প্রতিপালক হইয়াও তিনি প্রলয়কালে সর্ব্বভূত গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি

কালে নানারূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক উৎপন্ন হন ; জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিতে ও তমোরাশির ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করা যায় না, অতএব তিনি অজ্ঞেয় ; কেবল জ্ঞান যোগেই তিনি জ্ঞেয় ; তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তগণ এই মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া সেই পরাৎপর পরমপুরুষের অচিন্ত্যভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে, তন্নিমিত্ত এই পরমগুহ্য বিষয় আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই অনাদি ; দেহ, ইন্দ্রিয় ও সুখদুঃখাদি সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন ; প্রকৃতিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, সুখ দুঃখ ভোগের কারণ হন পুরুষ। ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহে অবস্থান করিয়াও পুরুষ সর্ব্বদা দেহ হইতে বিভিন্ন ; তিনি ভোগী নহেন, কেবল সাক্ষী-স্বরূপ। যিনি এইরূপে পুরুষ প্রকৃতিকে অবগত হইতে পারেন, তিনি শাস্ত্রমতের অমর্য্যাদা করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবলে কেহ কেহ ধ্যানে ও মননে আত্মার দর্শনলাভ করেন, কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বিভিন্ন গুণ যোগে ও কর্ম্মযোগে আত্মদর্শনে অধিকারী হন, কেহ কেহ বা আত্মজ্ঞান বিরহে অপরের উপদেশে পরমাত্মার উপাসনা করেন। এই ত্রিবিধ শ্রুতিপরায়ণ উপাসক মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন। আত্মা অবিনাশী, লোকে অবিদ্যার দ্বারা আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। যোগবলে এবং উপাসনা প্রভাবে যাঁহারা আত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহারা মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি মানবদেহে অবস্থান করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু আত্মা কোন কর্ম্মই করেন না। আত্মাকে অবগত হইতে পারিলে প্রকৃতির প্রসন্নতা লাভ হয়, প্রকৃতি প্রসন্না হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পরমাত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, কোন প্রকার কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না ; বায়ু যেমন সমস্ত পদার্থে অবস্থান করিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত নহে, সমস্ত জীবদেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা তদ্রূপ নির্লিপ্ত ; একমাত্র সূর্য্য যেমন সমস্ত বিশ্ব প্রভাসিত করেন, একমাত্র আত্মাও সেইরূপ বিশ্বমণ্ডলের সমস্ত দেহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষী থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান

প্রভাবে যাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধ এবং ভৌতিক প্রকৃতি হইতে নিত্যতত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অর্জ্জুন। হে বাসুদেব! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পুরুষ ও প্রকৃতি, এতৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা তুমি বলিলে, তাহার সূক্ষ্মমর্ম্ম পরিগ্রহে আমি পূর্ণাংশে সমর্থ হইলাম না, আর কিছু সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ জন্মিতেছে।

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! পুরুষ প্রকৃতির মিলিত শক্তিতে জগৎ উৎপন্ন, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি! গর্ভাধান স্থানকে মহৎ প্রকৃতি বলে, সেই প্রকৃতিতে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে জীবের উৎপত্তি হয়। জীবদেহ সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের আধার। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, ভাস্বর ও নিরুপদ্রব ; তন্নিমিত্ত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানব বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে। রজোগুণ আসক্তি ও অভিলাষ হইতে উৎপন্ন, তন্নিমিত্ত দেহীকে কর্ম্মপাশে নিবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত ; যাহাদের দেহে তমোগুণের আধিক্য, তাহারা আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ ও মোহে অভিভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে আবৃত করে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমঃকে আচ্ছন্ন করে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশ পায়, রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে লোভ, কর্ম্মাসক্তি, প্রবৃত্তি, স্পৃহা ও অশান্তি উৎপন্ন হয় ; তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে মোহাধিক্যে বুদ্ধিভ্রংশ, বিবেকনাশ, অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি ও ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপ্রাবল্যে মানবের মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, রজোগুণাধিক্যে মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মানবযোনিতে পুনঃ জন্মলাভ হয় এবং তমোগুণাধিক্যে মৃত্যু হইলে মানব পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল বিমল সুখ শান্তিলাভ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখভোগ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞানজনিত যন্ত্রণা ভোগ! সত্ত্বগুণে জ্ঞান, রজোগুণে লোভ এবং তমোগুণে মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোকে ঊর্দ্ধগামী, রাজসিক লোকে মধ্যগামী ও তামসিক লোকে অধোগামী হয়। বিবেকী পুরুষেরা এই ত্রিবিধ গুণকে সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, সর্ব্বগুণাতীত জগদীশ্বরকে পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন। এই ত্রিবিধগুণ অতিক্রম করিয়া যে জ্ঞানবান পুরুষ একমাত্র পরমাত্মায় চিত্ত সংযত করেন, তিনি মোক্ষপদ লাভে অধিকারী হন। (ক্রমশঃ)

কন্যা দেখা।

"কে বলেছে আমার মেয়ের
বৈধব্য লেখা ?"
"তাই তো মশাই গ্ল্যাস দিয়ে
এত করে দেখা। (১)
"পত্নী-ভাগ্যে স্বামী বাঁচে
শাস্ত্রে লেখা আছে।
অলক্ষণা লয়ে গিয়ে
কেন মর্‌বো পিছে ? (২)
একে আমার বয়স বেশী,
কি জানি কি হয়!
এয়োতির জোর থাকে যদি
যমে করি না ভয়॥" (৩)

শ্রীঅবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়

দায়িত্ব

লেখক — শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু, বি, এল।

আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের একটি ফল আছে। কর্ম্মফল আদিকাল হইতে ভারতীয় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক কর্ম্মফলের জন্য আমরা দায়ী কি না, একটু বিচার্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

ভগবান আমাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন সত্য এবং তাঁহার অপ্রতিহত ইচ্ছানুযায়ী আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি। সেই ভগবৎ শক্তি আমাদের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত।

সেই শক্তিবলে আমরা সদসৎ ভালমন্দ কর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারি, সুতরাং আমাদের কৃত কর্ম্মের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আমরা যদি সৎকর্ম্ম ছাড়িয়া অসৎ কর্ম্মানুসরণ করিয়া থাকি, তবে মনে করিতে হইবে আমরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়াছি, এবং আমাদের কৃত অসৎ কর্ম্মের জন্য আমরা স্বয়ং দায়ী।

কর্ম্মফল বিচার করা বড়ই সুকঠিন। কি প্রকার কর্ম্মের কিরূপ ফল হইবে তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি না। অনেক সময় নিতান্ত ক্ষুদ্র কর্ম্মেরও অনেক বৃহৎ ফল হইয়া থাকে। রামায়ণের রাজা দশরথ রাজরাণী কৈকেয়ীর সেবা শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া তিনটী বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ঘটনাটি অতি সহজ ও সামান্য। কিন্তু উহা হইতেই রামায়ণের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

এইরূপ অকস্মাৎ পরাশর ও ধীবরকন্যা সত্যবতীর সংযোগ হইল, তাহাতেই মহাভারতের বিরাট কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় দেখা যায় বৃহৎ কর্ম্মেরও পরিণাম ফল লঘু ও সামান্য; মহাদেব সমুদ্র মন্থনে কেবল গরল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বালী বধ করিয়া বৃথা গঞ্জনাভাগী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল বধ করিয়া বৃথা নিন্দনীয় হইয়াছিলেন।

কাজেই কর্ম্মফল যখন নির্ণয় করা কঠিন তখন সকল সময় ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাশ্রিত কর্ম্মের সুফল অবশ্যম্ভাবী।

মিনতি।

লেখিকা—শ্রীমতী আভাবতী।

আমি অকূল সাগর যাত্রী ;
(আমায়) ভেসে যেতে দাও অকূলে।
(আমি) নিরাশ হৃদয় করিয়াছি সাথী,
নীরবতা শুধু ব্যাকুলে॥
(ওগো) চাইনি তাই চাঁদের আলো,
পা'বনা বলে সে খুঁজিনি।
সুন্দর তাই লাগে না ভাল
চোখ দিয়ে সে যে দেখিনি॥
(আমি) নিশীথ করেছি আলোর আধার
জীবন করেছি শূন্যময়।
(তুমি) করো না বদ্ধ মোর চারিধার,
করিয়া দৃটি বিনিময়॥
রেখো না বাঁধিয়া নয়নের কোণে
দুর্ব্বল এ হিয়া খা
দিও না পরশ শয়নে স্বপনে
ব্যাকুল করিয়া মণি॥
(আমি) পারিব না করিতে কিছুই প্রদান
কিছুই যে মোর নাই।
পারি দিতে শুধু শূন্য পরাণ,
মিটিবে কি তাহা তায়॥

সমালোচনা।

শ্যামসুন্দর।—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাণিকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

এই উপন্যাসে ভাষা ও ভাবের অভাব নাই ; চরিত্রচিত্রে ঘটনা বৈচিত্রে "শ্যামসুন্দর" একখানি সুরুচি সঙ্গত আদর্শ উপন্যাস বলিলেও বলা যাইতে পারে। আধুনিক ঔপন্যাসিকের মত লেখক এই উপন্যাসে ধর্ম্মনীতি সমাজ সংস্কারের তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষণ ও দুর্ব্বলী দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা, ৬ শিশি ৪৷৷০ টাকা, মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তি-হীনতা, উত্তেজনারাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য

এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা,

তিন শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলার আনন্দ ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, এক সের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন ও কবিরাজ
নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের—

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

কবিরাজ শ্রীকালী ভূষণ সেন কবিরত্ন।

৩ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কবিরাজ মহাশয়দিগের বংশপরম্পরা হইতে এই ঔষধালয় পরিচালিত হইয়া যে সাধারণের মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র সাধারণের অবগতির জন্য স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত দুই একটী ঔষধের নাম দেওয়া গেল।

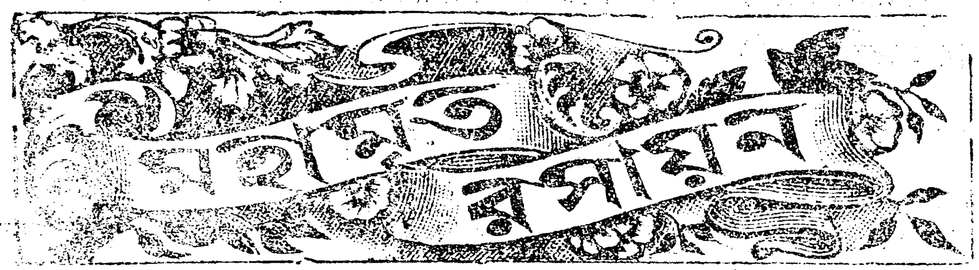

মূল্য প্রতিশিশি ১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। ডজন ১৫ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

(উপদংশ জনিত বা অন্য কোন কারণে রক্তদুষ্টির মহৌষধ।)

দারুণ উপদংশ পীড়ার ও তজ্জনিত পারা সেবনের ফলে বা অন্য কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া গাত্রে চুলকানি, দাগপড়া, স্ফোটোৎপত্তি বা কুষ্ঠ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

২৪ ঘণ্টায় জ্বালা আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

(সপূঁয মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহা প্রমেহ, শুক্রমেহ, রক্তমেহ, সপূঁয মেহ রোগের মহৌষধ এবং তজ্জনিত জ্বালা যন্ত্রণাদির পক্ষে আশুফলপ্রদ।

এতদ্ভিন্ন বিষম জ্বরারিষ্ট—সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক। কনকাসব—হাঁপানী কাসের মহৌষধ। ভৃঙ্গরাজ তৈল—মহোপকারী কেশতৈল। শুক্রবল্লভ বটিকা—ধারণা-শক্তি-হীনতার ধন্বন্তরি। বাধকারি বটিকা—বাধক রোগের মহৌষধ।

স্থানাভাবে অন্যান্য ঔষধের তালিকা দেওয়া হইল না। বিস্তারিত ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ৵০ এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড মার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রূপদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39, MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, আশ্বিন, [৬ষ্ঠ সংখ্যা

১।	ব্রহ্মের পরিণামবাদ	শ্রীযুক্ত বিহারিলাল দত্ত তত্ত্ববিনোদ	৫৪১
২।	ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদ		৫৪৭
৩।	পাণ্ডব-নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৫৫১
৪।	আগমনীগীত	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৫৫৯
৫।	বন্দনা	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	৫৬০
৬।	মিলন	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫৬১
৭।	গঙ্গার বন্দনা	শ্রীযুক্ত রাজবিহারী ভট্টাচার্য্য	ঐ
৮।	মহিমার—মহিমা	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৫৬২
৯।	মাতৃ-আবাহন		৫৬৬
১০।	স্বাধীনতাপ্রিয় পতির প্রতি পত্নী	শ্রীযুক্ত	৫৬৯
১১।	কেন	শ্রীমতি শৈলরাণী বসু বি, এ	৫৭২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

13-10-27

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! প ... তিকার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী ...।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
৪২।B, মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্ট পুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ ল্যোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাতা

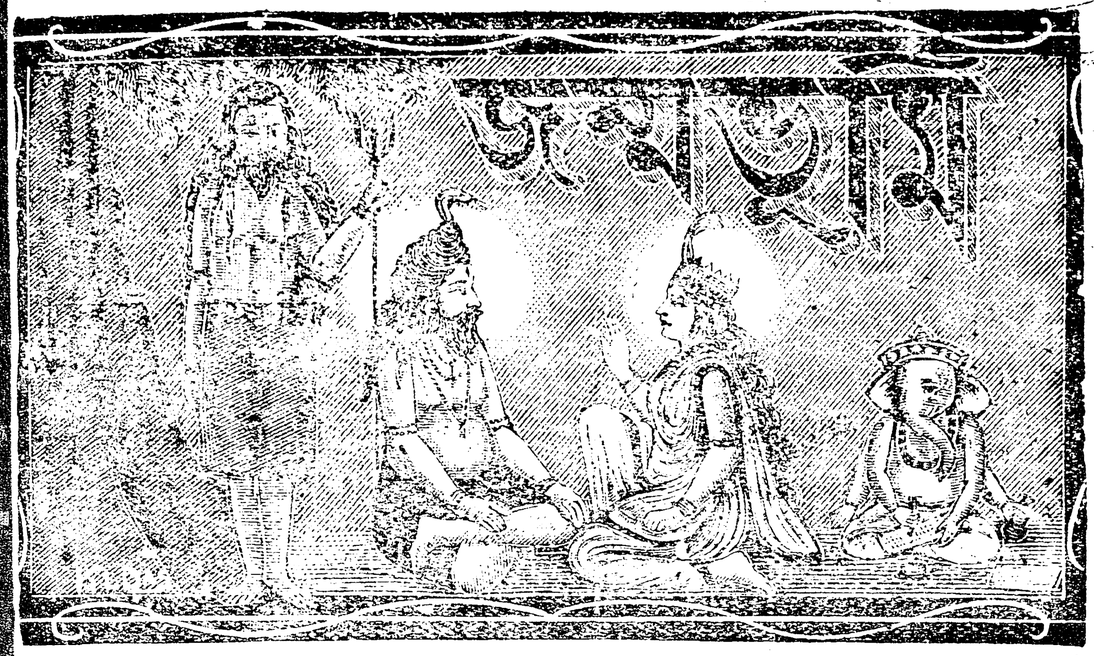

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, আশ্বিন | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্রহ্মের পরিণামবাদ।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিহারিলাল দত্ত তত্ত্ববিনোদ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ব্রহ্মের ক্রমবিকাশের নাম জগৎসৃষ্টি।

ক্রমবিকাশই ব্রহ্মের স্বভাব, স্ব—স্বকীয় যে ভাব তাহাকে স্বভাব কহে, সৃষ্টি ও লয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব তাঁহার কার্য্য।

ব্রহ্ম নিত্য ও এক, জগৎ নিত্য ও এক, জীবও নিত্য এবং এক।

ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ব্যাপক নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, তাঁহার স্বরূপের কখন কোনকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব মধ্য বা প্রলয়ের পর ব্যভিচার হয় না, তিনি নিত্য ও সদাই একরূপ।

জগৎ নিত্য হইলেও তাহার উৎপত্তি ও লয় আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনিত্য ও মিথ্যা বস্তু, কিন্তু আকাশ কুসুমের ন্যায় অত্যন্ত অভাব বা মিথ্যা বস্তু নহে। যে হেতু জগৎ ও জীব প্রত্যক্ষমূলক দৃশ্যমান পদার্থ। জগতের উৎপত্তি ও লয় হয় বলিয়া জগৎকে প্রবাহ রূপে নিত্য বলে।

সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিবস, এইরূপ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয় সর্ব্বা প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈব অব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥
ভূতগ্রাম স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ইতি গীতা।

ব্রহ্মার দিবসাগমে অব্যক্ত কারণ হইতে চরাচরাত্মক জগতের উৎপত্তি হয় ও ব্রহ্মার প্রলয়রাত্রি উপস্থিত হইলে সমস্ত চরাচরাত্মক জগৎ অব্যক্ত কারণে লয় হইয়া থাকে। হে পার্থ ! এই চরাচরাত্মক জগৎ জীবের কর্ম্মবশে বারম্বার ব্রহ্মার দিবাগমে উৎপত্তি ও রাত্র্যাগমে প্রলয় হইয়া থাকে।

এইরূপে বারম্বার জগতের উৎপত্তি ও লয়কে প্রবাহ কহে। জগৎ যদি প্রবাহ রূপে নিত্য হইল তাহা হইলে প্রলয়সময়ে জগৎ কোথায় ও কি অবস্থায় থাকে ?

উত্তর—যেমন এক খণ্ড সৈন্ধব লবণকে কিছুক্ষণ জলে ফেলিয়া রাখিলে ঐ লবণ জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তখন ঐ লবণের আকার কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় না, অব্যক্ত অবস্থায় জলের সহিত মিশ্রিত থাকে; সেই প্রকার মহাপ্রলয়ে বিশ্বসংসার অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় সংস্কাররূপে ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন থাকে, তখন জগৎ বলিয়া কোন দ্বিতীয় পদার্থ থাকে না।

যেমন তৈলের সহিত জল মিশ্রিত হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, নির্গুণ, নিরাকার, ব্যাপক ও অসঙ্গ। জগৎ সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন, অনিত্য, জড় ও অনিত্যগুণ। অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া প্রলয়-কালীন ব্রহ্মের সহিত অভেদে কি প্রকারে বিলীন থাকে ?

উত্তর—ব্রহ্ম জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু নহে, ব্রহ্মের রূপান্তর জগৎ।

উদাহরণ—"যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—বাচারম্ভনং বিকার নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" ছান্দোগ্য শ্রুতি। ৬।১।৪

হে সৌম্য ! যেমন একমাত্র মৃত্তিকাকে জ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃত্তিকানির্ম্মিত

বস্তুকে জ্ঞাত হওয়া যায়, কারণ পদার্থমাত্রেই বিকারি কতকগুলি নামরূপ-বিশিষ্ট ব্যবহারিক বাক্যমাত্র, ইহারা যখন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কারণ মৃত্তিকারূপে অবস্থান করে, তখন মৃত্তিকাকেই সত্য বলিয়া জানিবে। সেই প্রকার নামরূপাত্মক অনিত্য জগৎ প্রলয়কালীন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অব্যক্ত কারণে ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন থাকে।

যেমন প্রবাহমান গঙ্গা যমুনাদি নদী সকল আপন আপন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তখন তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপ প্রভৃতির প্রভেদ থাকে না, সেই প্রকার নামরূপবিশিষ্ট জগৎ প্রলয়কালীন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে একীভূত হয়।

ব্রহ্মই মহাসমুদ্র সদৃশ। নামরূপাত্মক জগৎ সমুদ্রের লহরীসদৃশ, যেমন সমুদ্র হইতে নানাবিধ ছোট বড় ঢেউ উঠে, আবার সমুদ্র মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়, সেই রূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপ সমুদ্র হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই লয় হইয়া থাকে। সে কারণ ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ কহে। এই উপাদান কারণকে জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

"আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং নিরবয়বং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপং" শ্রুতি ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরবয়ব অর্থাৎ হস্তপদমস্তকাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রহিত আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও স্বপ্রকাশ জ্যোতিস্বরূপ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি আকাশের ন্যায় নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপক ও নিষ্ক্রিয় হন তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে সক্রিয় জড় জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন ?

স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক ও নিরবয়ব। ব্যাপক বস্তু মাত্রেই নিরবয়ব অর্থাৎ হস্তপদমস্তকাদি শূন্য হইলেও তাহার আকার আছে। বায়ু একটী নিরবয়ব সূক্ষ্ম ও ব্যাপক বস্তু, দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত। বস্তু থাকিলেই তাহার একটী আকার থাকিবে, আকার ব্যতীত বস্তু থাকিতে পারে না। আকাশ বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম-তর, দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত না হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। শব্দ আকাশের গুণ, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায়। শব্দ আকাশকে অবলম্বন করিয়া থাকে, আকাশই বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, ইহারা আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় ও আকাশ মধ্যেই অবস্থান করে। আকাশের যদি কোন আকার না থাকে, কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহারা থাকিবে ? বিজ্ঞান-বিদ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন, আকাশ ও বায়ুর সংঘর্ষে আকাশ হইতে

তাড়িৎ তেজ আলোক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, অতএব এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় আকাশ বায়ু প্রভৃতি ব্যাপক বস্তুর অতি সূক্ষ্ম আকার আছে যাহা সাধারণ বুদ্ধির বিষয় নহে, কিন্তু জ্ঞানমার্জ্জিত সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকে। অতএব যিনি এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের আধার তাঁহার কোন আকার থাকিবে না ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে এইমাত্র বিশেষ যে আকাশাদি প্রাকৃত বস্তুর একটী সূক্ষ্ম পরিচ্ছিন্ন অবয়ব আছে, ব্রহ্ম প্রকৃতির অতীত, তাঁহার কোন প্রাকৃতিক অবয়ব নাই কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বব্যাপক আকার আছে। শ্রুতিও উপদেশ করিয়াছেন, আনন্দস্বরূপ হইতে এই জগতের উৎপত্তি, আনন্দস্বরূপেই স্থিতি ও আনন্দস্বরূপেই জগতের লয় হইয়া থাকে। "শব্দ ব্রহ্ম অধিগম্যেন পরব্রহ্ম অধিগম্যতে"। ইতি শ্রুতি।

শব্দ ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ, বেদ অধ্যয়ন করিলে পরব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্র বেদকে ব্রহ্মসদৃশ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু ঋগ্বেদাদিশাস্ত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ শব্দমূলক, বাক্য দ্বারাই বেদ উচ্চারিত হয়। সৃষ্টিও শব্দমূলক অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যত সংখ্যায় যত পরিমাণে যত রূপে বিভক্ত হইয়া জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, শব্দও তত প্রকারের আছে। যেমন শব্দ ও বেদ নিত্য পদার্থ, সেই প্রকার বেদ প্রতিপাদ্য আকারও নিত্য পদার্থ। আকারের সহিত শব্দের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। গো একটী শব্দ, এই শব্দের সহিত গলকম্বল-লাঙ্গুল-শৃঙ্গচতুষ্পদাদি যুক্ত একটী পশুকে বুঝাইল। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ইহারা প্রত্যেকে ব্যক্তি বা বস্তু রূপে উৎপন্ন হয়, কিন্তু আকারের উৎপত্তি হয় না। আকৃতির সহিত শব্দের নিত্যসম্বন্ধ, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নাই, আকার নিত্য বস্তু বলিয়া বস্তু বা ব্যক্তি যখন যে কোন আকার বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে তখনই সেই সেই নামে অভিহিত হয়। যেমন মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি। আকার একটী জাতি বাচক শব্দ, বস্তু বা ব্যক্তিবাচক নহে। যেমন জগতে যাবতীয় মনুষ্যজাতি একপ্রকার আকারবিশিষ্ট, এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিবে।

বেদান্তসার গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মকে বস্তু বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। বস্তু কখন আকারকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকিতে পারে না। শ্রুতি ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মের যদি কোন আকার না থাকে, তবে এই বিশেষণদ্বয় কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? গুণ ও কর্ম্ম দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, নিরাধারে থাকিতে পারে না। অতএব তাঁহার

একটী অনাদি অনির্ব্বচনীয় আকার আছে, যাহা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, কিন্তু বিশুদ্ধ মন ও বুদ্ধির গোচরীভূত।

শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, "দৃশ্যতে তগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ'

"মনসা এব ইদমাপ্তব্যম্" ইত্যাদি কঠশ্রুতি।

সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীগণ শাস্ত্রমার্জ্জিত বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার স্বরূপকে অবগত হন। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা অর্থাৎ বাসনা বিহীন নির্ম্মল মনের দ্বারা তাঁহার স্বরূপকে অবগত হওয়া যায়।

গীতায় বর্ণিত আছে —"সূক্ষ্মত্বাৎতদ্ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ"।

তিনি সূক্ষ্মরূপে জীবগণের হৃদয় মধ্যে থাকিলেও জীবগণ তাহাকে জানিতে পারে না. অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে অর্থাৎ তাঁহাকে দূর হইতে দূরে মনে করিয়া থাকে, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই তাঁহাকে আপন হৃদয় মধ্যে অভেদ রূপে দর্শন করেন।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনভাষ্যে উপদেশ করিয়াছেন, "অস্মৎ প্রত্যয় গোচরত্বাৎ অপরোক্ষত্বাৎ চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধে" যেহেতু তিনি অহং জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ আমি আছি ইহা প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করিয়া থাকেন, আমি নাই এ কথা কেহই বলেন না, কারণ তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরাত্মা রূপে বিরাজমান, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বাক্য।

অতএব তিনি একান্ত অবিষয় নহেন, যেহেতু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

"সর্ব্বানি হবা ইমানি ভূতানি আকাশাৎ এব সমুৎপদ্যন্ত—আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান্ আকাশপরায়ণম্"। ইতি ছান্দোগ্য শ্রুতি।

আকাশ হইতে যাবতীয় ভূতের উৎপত্তি ও আকাশেই লয় হইয়া থাকে, আকাশই সমস্ত ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আকাশই ভূত সমূহের আশ্রয় স্থান।

"আকাশ স্তল্লিঙ্গাৎ"। বেদান্ত দর্শন।

বেদান্তদর্শন উক্ত সূত্র দ্বারা ভূতাকাশ হইতে পৃথক করিয়া এই আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম বা রূপান্তর, বেদান্তদর্শন "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" এই সূত্র দ্বার প্রমাণ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ বলা হয়। "তদ্ আত্মানং স্বয়মকুরুত" ইতি শ্রুতি, তদ্ ব্রহ্ম আত্মানং—আপনাকে ইতি কর্ম্মত্বং, স্বয়মকুরুত—আপনি করিলেন ইতি কর্ত্তৃত্বং অর্থাৎ

ব্রহ্ম আপনাকে জগতের উপাদান কারণ রূপে আপনি পরিণত করিলেন। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, দ্বিতীয় বস্তু ছিল না, তিনি আপনার লীলা প্রকাশ জন্য আপনিই জগৎ রূপে আবির্ভূত হন। ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত বাক্য।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে" ইতি বেদান্তদর্শন।

বহু বেদান্ত শাস্ত্র ব্রহ্মকে জগৎযোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "কর্ত্তারমীমান্ পুরুষং ব্রহ্ম যোনি" ইতি। "যদ্ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা" ইতি চ।

তিনিই জগতের কর্ত্তা, তিনি নিয়ন্তা, তিনি পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম ও তিনিই জগৎ যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি, জ্ঞানিগণ সেই ভূতযোনি পরব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন। পৃথিবী যেমন ওষধি ও বনস্পতি সকলের যোনি বা উৎপত্তিস্থান, সেই প্রকার ব্রহ্মও জগতের প্রকৃতি বা উৎপত্তি স্থান, অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় ব্রহ্মই জগতের উপাদন কারণ ও তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ জনিবেন।

যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট সরাবাদি উৎপন্ন হয়, সে কারণ মৃত্তিকাকে তাহাদের উপাদান কারণ কহে, যেমন সুবর্ণ হইতে বলয় কুণ্ডলাদি উৎপন্ন হয় সে কারণ সুবর্ণকে তাহাদের উপাদান কারণ বলে; সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ কহে। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট সরাবাদি উৎপন্ন হয়, যেমন সুবর্ণ হইতে বলয় কুণ্ডলাদি উৎপন্ন হয় কিন্তু মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় না সেইপ্রকার ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইলেও তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আবার যখন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট সরাবাদি, সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয় কুণ্ডলাদি আপন আপন নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন স্বরূপে অবস্থান করে, সেই প্রকার নাম রূপাত্মক বিকারি জগৎ প্রলয় কালে নাম রূপ পরিত্যাগ করিরা ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান করে। অতএব ব্রহ্ম স্বরূপাংশে অবিকারি এবং নাম রূপাত্মক জগৎ অংশে বিকারি বলিয়া জানিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী শ্রীভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের কর্ম্মফল কিরূপ হয়? তাহাদের কর্ম্মগুলি সাত্ত্বিক কিংবা রাজসিক অথবা তামসিক?

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধাও তিনপ্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক! পুরুষেরা দেবগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার অনুগত হইয়া যাগাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, রাজসিক শ্রদ্ধায় যক্ষরক্ষেরা তৃপ্ত হয়, তামসিক শ্রদ্ধায় ভূতপ্রেতাদির তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। অজ্ঞান লোকেরা রাগ দ্বেষ দম্ভাদি পরিচালিত হইয়া ভূতগণকে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কঠোর তপস্যা করে, তাহারা আত্মাকেই ক্লেশ দিয়া থাকে; অতএব তাহারা নিতান্তই ক্রূরস্বভাব। কেবল যাগ যজ্ঞ বলিয়া নহে, লোকযাত্রার সর্ব্বাঙ্গই তিন প্রকার; যাহাতে সর্ব্বলোকের প্রীতি সাধিত হয়, তৎসমস্তই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, দান তিন প্রকার, তপস্যাও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যেরূপ আহার জীবনবর্দ্ধন, উৎসাহবর্দ্ধন, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিপ্রদ, সুরস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী, মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক আহার; অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি রুক্ষ, এবং শোক-দুঃখ-রোগপ্রদ আহারকে রাজসিক আহার বলে; বহুক্ষণপাচ্য, বিশুষ্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ও ত্যাজ্য আহারের নাম তামসিক আহার। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, একাগ্রতাসিদ্ধ, অবশ্য-কর্ত্তব্য জ্ঞানযোগযুক্ত যজ্ঞ সাত্ত্বিকযজ্ঞ; ফলাদি কামনায় অথবা দম্ভপ্রকাশের উদ্দেশ্যে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহা রাজসিক যজ্ঞ; বিধিশূন্য, মন্ত্রশূন্য, দক্ষিণাশূন্য, শ্রদ্ধাশূন্য এবং অন্নদানশূন্য যজ্ঞসমূহ তামসিক যজ্ঞ নামে অভিহিত। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ

ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য, বেদাভ্যাস, চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্ম-নিগ্রহ, ভাব-শুদ্ধি, বাঙ্‌ময়, মনোময় ও শারীরিক তপঃ—এইরূপ নিষ্কাম অনুষ্ঠানকে সাত্ত্বিক তপঃ বলে ; সৎকার, মান, পূজা ও লাভের প্রত্যাশায় এবং দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত যে সকল তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক তপঃ ; দুরাগ্রহ, আত্মপীড়া ও অপরের উৎসাদনার্থে যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক তপঃ। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় অনুপকারী ব্যক্তিকে কেবল দাতব্য জ্ঞানে যে দান করা হয় তাহা সাত্ত্বিক দান, প্রত্যুপকার কামনায় ও স্বর্গাদি লাভের আশায় অনিচ্ছাপূর্ব্বক ক্লেশ বোধ করিয়া যে দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান ; অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে, অতুষ্টচিত্তে দানার্থীকে তিরস্কৃত করিয়া যে দান করা হয় তাহাই তামসিক দান। ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার ; —ওঁ, তৎ এবং সৎ। এই ত্রিবিধ নামের দ্বারা সৃষ্টিকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী-গণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ নানাবিধ যজ্ঞ, দান ও তপোঽনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অহিংসত্ব, সাধুত্ব, মঙ্গলকর্ম্ম, যজ্ঞ, তপ ও দানে এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধা-সহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ; ইহলোকে বা পরলোকে তৎসমস্ত কর্ম্ম সফল হয় না।

অর্জ্জুন। হে বাসুদেব ! সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব আমি পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন ! পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন, সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মফল পরিত্যাগই ত্যাগ নামে গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, ক্রিয়াকলাপকে দোষাবহ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ; কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই তিনটি কার্য্য কোন রূপেই পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে ; বস্তুতঃ প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তামসাদি ভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, উহার

অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। ঐ তিনটি কার্য্য বিবেকাদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে পার্থ ! আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ তিনটি ব্রতের অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃকল্প। নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মত্যাগ তিন প্রকার। মোহ বশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ, তাহা তামস ত্যাগ নামে অভিহিত ; নিতান্ত কষ্টকর বিবেচনায় অথবা ভয়প্রযুক্ত কিংবা অগত্যা পরিত্যাজ্য বলিয়া যে কর্ম্মত্যাগ, তাহা রাজসিক ত্যাগ বলিয়া গণনীয় ; ফলকামনাশূন্য হইয়া অকপটে অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। সত্ত্বগুণাবলম্বী ত্যাগী পুরুষ দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ এবং সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। মানবগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ করাও যুক্তিবিরুদ্ধ ; অতএব কর্ম্মফল-পরিত্যাগী পুরুষকেই ত্যাগী পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ ; ইষ্ট ফল, অনিষ্ট ফল এবং ইষ্টানিষ্ট মিশ্রফল। যাঁহারা ত্যাগী নহেন, লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে ঐ ত্রিবিধ ফল লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীগণকে কদাচ ঐ সকল ফল ভোগ করিতে হয় না। হে অর্জ্জুন ! বেদান্তসিদ্ধান্তে সিদ্ধিকল্পে কর্ম্ম-বিধির গৌরব নাই ; শরীর ও কর্ত্তাকে পৃথক্ জ্ঞান, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, পুরুষকার ও দৈব, বেদান্ত সিদ্ধান্তে এই পঞ্চপ্রকার লক্ষ্য ; ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, মনুষ্য সচরাচর যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ঐ পাঁচটিই তাহার কারণ। এই বিধি অতিক্রম করিয়া যে জ্ঞানবর্জ্জিত মূঢ় ব্যক্তি নিরুপাধিক আত্মার উপরে কর্ত্তৃত্বের আরোপ করে, তাদৃশ নির্ব্বোধ ব্যক্তি কদাচ সাধু-তত্ত্ব-দর্শী হইতে পারে না। যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক সমুদয়ের বিনাশের হেতু হইয়াও বিনাশ করেন না, লোক বিনাশের ফলভাগীও তাঁহাকে হইতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই তিনটি সর্ব্বথা কর্ম্মে প্রবর্ত্তি দানের হেতু ; কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কারণ, এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। সাংখ্য শাস্ত্রে সত্ত্বাদি গুণ ভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা তিনপ্রকার ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক !

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ ! শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা অতিশয় দুরূহ বোধ

হইতেছে। জ্ঞান কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিগুণাধিকার কি প্রকার, তাহা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অতএব তুমি কৃপা করিয়া সবিস্তারে তাহা কীর্ত্তন কর।

কৃষ্ণ। হে পার্থ! অভিন্নভাবে সর্ব্বভূতে যাঁহার অবস্থান, যিনি অব্যয়, অক্ষয়, নির্ব্বিকার, যে জ্ঞান দ্বারা সেই পরব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান; যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ নিরূপণ করা যায়, তাহাই রাজসিক জ্ঞান এবং যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিমাদি অবাস্তবিক পদার্থে ঈশ্বরবোধ হয়, তাহাই তামসিক জ্ঞান। কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য বিদ্বেষ-অনুরাগ-বিরহিত নিষ্কাম কর্ম্মই সাত্ত্বিক; অহঙ্কার-পূর্ণ বহুল আয়াস-সাধ্য সকাম কর্ম্মের নাম রাজসিক; এবং শুভাশুভ-বিচার-বিহীন হিংসা ও মোহবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক কর্ম্ম। অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহ-সম্পন্ন ও সিদ্ধি-অসিদ্ধি-বিকার-বর্জ্জিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক; অনুরাগাসক্ত, কর্ম্মফলকামী, লোভী, হিংস্র, অশুচি ও শোকহর্ষ-বিমোহিত কর্ত্তাই রাজসিক; এবং অনবহিত, অবিবেকী, আত্মাভিমানী, শঠ অলস ও বিষাদমোহিত কর্ত্তাই তামসিক। হে অর্জ্জুন! ত্রিবিধ গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যেরও ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে বুদ্ধি দ্বারায় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য্য-অকার্য্য, ভয়-অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী; যে বুদ্ধি দ্বারায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য প্রকৃত রূপে অবগত হওয়া যায় না, সেই বুদ্ধিই রাজসী; এবং যে বুদ্ধি অজ্ঞানবশে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থকে বিপরীত অর্থে বুঝাইয়া দেয়, সেই বুদ্ধিই তামসী। হে পার্থ! জ্ঞান ও কর্ম্মের ত্রিগুণাত্মক ত্রিবিধ লক্ষণ কথিত হইল. এক্ষণে ধৃতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ শ্রবণ কর। যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা সাধন বিষয় সমূহ ধারণ না করিয়া, মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহ ধারণা করে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী; ফললাভের অভিলাষ করিয়া যে ধৃতি ধর্ম্মার্থকাম ধারণ করে, তাহা রাজসী, এবং অবিবেকী ব্যক্তিগণ যে ধৃতির প্রভাবে গর্ব্ব, ভয় শোক, বিষাদ ও স্বপ্ন অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাই তামসী ধৃতি অর্থাৎ তামসিক ধৈর্য্য।

অর্জ্জুন। হে জনার্দ্দন! জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধৃতির লক্ষণ সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এক্ষণে

ত্রিবিধ গুণে সুখের তারতম্য কিরূপ, তাহা অবগত হইতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব তুমি আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ কর!

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও শকুনি।

ধৃতরাষ্ট্র। কহ দুর্য্যোধন! কি মনোবেদনা তব?
বৎস! কহ ত্বরা মোরে, অন্তর বিদরে,
শুনি শকুনির মুখে,—দিন দিন দুঃখে
শক্তিহীন দেহকান্তি মলিন তোমার,
হৃদে হেরি অন্ধকার; তুইরে আমার
আলোক-আনন্দ—অন্ধ নয়নের তারা,
শতপুত্রে তোরে হারা হই ক্ষণে ক্ষণে।
কহ সত্য কি বিষাদ! কৌরব গৌরব
আজি পুত্র কোন্ গুণে ন্যূন কা'র হ'তে?
জ্যেষ্ঠ সূত্রে শ্রেষ্ঠ তুই হস্তিনার রাজা,
করে পূজা রাজেন্দ্রসমাজ যোড়করে।
কুরুরাজ্য মাঝে ভুজবীর্য্য কীর্ত্তি তোর
দুর্ব্বার-বিস্তার সৌরকর রাশি সম।
দুর্দ্দান্ত-দমন দণ্ড ভয়ে বৈরীজন,

---

* সত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দুষ্ট খল হ'ল এককালে হতবল,
ক্রূরব্যাধি প্রবলাভিষক্ বলে যেন !
প্রকৃতিমণ্ডল অনুগত ; পুত্র যথা
পিতার তাড়নে – তথা কৌরব শাসনে,
ধনে ধান্যে নিত্য ক্রমে হৈল বর্দ্ধমান।
গণি তুচ্ছ শত্রু অন্যে—শত্রু নাহি জিনে
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সেনানী পরিচালিত
কুরুসৈন্য ভুবনবিজয়ী ! সর্ব্বদ্রব্যে
রত্নধনে পূর্ণিত ভাণ্ডার ! নারীরত্ন
সংসারের-সার বাছিয়া আনিলি গৃহে,
তবাশ্রয়ে কৌরব-রাজশ্রী সমুজ্জ্বল
বিপুল গৌরবে ! অহো ! কি অভাব তবে
তবে অনুশোচ কররে অন্তরে বৎস !
কোন্ তাপে শুকাইলি বলরে আমায় ?

দুর্য্যো। হায় পিতঃ ! কি কহিব সহি যত হৃদে
সেই তাপ পূটপাক প্রায় ! মম সম
হীনজন ধরে না ধরায় ; ভাবি মনে,
কৌরব সম্পদ্ গৌরব বৈভব যেন
ভুঞ্জি সব কাপুরুষ হেন। তৃপ্তি নাই—
পুষ্টি কোথা তায়, হায় ! ধিক্ সেই জনে,
ধিক্ তার জীবন ধারণে, ধিক্ ধিক্ !
নেহার নয়নে—বাড়ে নিত্য বৈরীকুল
জলে যথা পদ্মমূল—বিপদ সঙ্কুল—
নারে বলে অথচ দমিতে। হায় পিতঃ !
সদা জাগে চিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-দীপ্তি-
সম পাণ্ডব-রাজশ্রী ঝলসি অন্তর !
কলেবর শুষ্ক সেই তাপে। তবু কেন
পাপ ছার প্রাণ নাহি হয় অবসান ?
অপমান আর কত বাকী নাহি জানি।
শুনি জ্ঞানী বৃদ্ধ মুখে, "শত্রু যার নিত্য

বাড়ে সুখে, ছাড়ে লক্ষ্মী তারে অনাদরে।"
তাত ! ধরাপরে কহ কাহার সম্পদ,
প্রতাপ—আমার বৈরী পাণ্ডবের সম ?

ধৃত। হেন অলক্ষণ কেন কহ দুর্য্যোধন ?
মোর মনে নাহি লয়,—তব শত্রু কভু
পাণ্ডুপুত্র কদাচ নহিবে ; হেন বুঝি—
রাজসূয়ে ঐশ্বর্য্য সম্পদ পাণ্ডবের
হেরি সেই ভাব মনে হইল ; কহ রে—
ঘুচুক সংশয় হায়, শুনি হেন বাণী !

দুর্য্যো। পাণ্ডবের রাজসূয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
যেই দিন হ'তে তারা সভা প্রবেশিল,
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজে নিত্য স্বর্ণপাত্রে
ভুঞ্জাইল ; সেবিল সাদরে দেব সম !
যজ্ঞকালে আইল কত কে করে গণন !
এক লক্ষ করিলে পারণ, মাত্র বাজে
এক শঙ্খ ; সে নিয়মে শুনি অনুক্ষণ—
বধিরি শ্রবণ ধ্বনিছে অসংখ্য শঙ্খ ;
চমকিত মন – বিস্মিত কম্পিত হেরি
ধন-বিতরণ ! সমাগম অতুলন,
অদ্ভুত সকলি ! তত আসে যত যায়,
কোষাগার বৃদ্ধি পায়, দানে না ফুরায় ;
বৈশ্য প্রায় যত পার্থিবে যোগায় কর—
অমূল্য রতনরাজি নানাবিধ ধন।
ধাঁধিল নয়ন পাণ্ডবের বীর্য্যবতী
রাজলক্ষ্মীর প্রভায় ! কি কহিব হায় !
নাহি ইতিহাসে হেন করিতে তুলন !
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-অভিষেক আড়ম্বর
নিরখি হৃদয়ে নির্ব্বেদ উদয় হ'ল।
অমর-ঈশ্বর, মৃত্যুপতি দণ্ডধর,
ধনপতি কুবের, বরুণ রত্নপতি,

সম্পদে সম্প্রতি সবে পাণ্ডবের তুল্য
নাহি হবে। জাগরণে শয়নে স্বপনে
ভাবি, নিশিদিনে হৃদয় হইল খার।
অতঃপর সুখ শান্তি জানিব কোথায় ?

ধৃত। বৎস ! কি আছে উপায় ? যায় বিধি তুষ্ট,
তায় অসন্তুষ্ট চিত্ত কদাপি নহিবে।
কহ কি করিবে বলে, ছলে বা কৌশলে ?
এবে ইন্দ্রপ্রস্থে বিরাজে পাণ্ডব একেশ্বর।
ভীষ্মদেব বর্ত্তমান, দ্রোণ কৃপ দেখে
দোঁহারে সমান ; বহুমানে পূজা সদা
দেয় যুধিষ্ঠির গুরুজনে ! জেন কদা
গৃহদ্বন্দ্বে কাহার নহিবে অভিমত।
জতুগৃহ-দাহ অপবাদ যত এবে
কালেতে বিস্মৃত লোকমন, তেঁই কহি,
আপন অরিষ্ট কষ্ট আপনা হইতে
তুলিবে না। ধর্ম্মজ্ঞ সুধীর যুধিষ্ঠির
আজ্ঞা মোর করয়ে পালন ভক্তিভাবে,
রবে লোকে কলঙ্ক বিরোধি তার সনে !
নাহি অপরাধ কোন বিবাদসূচন,
তাহে পাণ্ডুর নন্দন, পাঞ্চাল যাদব
কুন্তীভোজ মদ্র কেকয় বান্ধব সনে—
দেবের অজেয় রণে ; যদি বৈরি সত্য,
কে সমর্থ হেন শত্রু দমিবে কেমনে ?
কি মন্ত্রণা অভিপ্রায় ?

দুর্য্যো। ভাবিয়া না পাই।
হায়, সদা মৃত্যু চাহি নাহি হয় মোর,
জীয়ন্তে নিরয় যাতনা কতেক সহি,
বৈসে অহি হৃদে, সাধে কত পুষি তায় !

শকুনি। বৎস দুর্য্যোধন ! এই সে চিন্তায়,
কভু না জুয়ায় হেন পরিতাপ তব।

নহে অসম্ভব পাণ্ডব-সৌভাগ্য-বলে
উপায়ে লইতে, যদি একান্ত সে বাঞ্ছা
থাকে চিতে, ধর বাপু ! আমার মন্ত্রণা,
ত্বরা হবে সিদ্ধকামা, কর অবহেলে
দুর্জ্জয় পাণ্ডবে জয় দেবন-সংগ্রামে।

দুর্য্যো। হে মাতুল ! সে মন্ত্রণা নাহি লাগে মনে,
অস্থির পাশায় ভাগ্য জানিব কেমনে ?

শকুনি। বৎস ! সিদ্ধবিদ্যা মম ! অক্ষবিজ্ঞগণ
গুরুজ্ঞানে মানে মোরে ; মায়াবী কপটী
অক্ষে যে আছে যথায়, হেরিয়া আমায়
স্থান ছাড়ে, মোরে জিনে নাহি এ সংসারে।
দ্যূতাসক্ত অথচ কৌশল-অনভিজ্ঞ
যুধিষ্ঠির, জেন স্থির – একপণ কভু
নারিবে জিনিতে, অতি ক্রোধে পুনঃ পুনঃ
না হইবে ঊন ; অবশেষে পুরী, সভা,
সর্ব্বস্ব হারিবে মাতি মায়ার দেবনে।

দুর্য্যো। হে মাতুল ! জানি মনে, কি হেতু আসিবে ?
কেন বা শুনিবে আবাহন ?

শকুনি। দুর্য্যোধন !
হেন বুঝি, নাহি জান যুধিষ্ঠির পণ ?
যুদ্ধে কিম্বা দ্যূতে ডাকিলে না বাহুড়িবে।
সদা সত্যে মন, কদাচন না ত্যজিবে
সত্যপণ, শত্রু রাজ্য ধন সিংহাসন
বিনা রক্তপাতে জিনিতে যদ্যপি সাধ—
পাণ্ডুপুত্রে দ্যূতে ত্বরা কর আবাহন।

দুর্য্যো। পিতঃ ! শুনিলে কি মাতুল মন্ত্রণা ? যদি
দেহ আজ্ঞা, এককালে এড়াই যন্ত্রণা ?
সে উপায়ে পাণ্ডব-রাজশ্রী নহে হরি।
বনচারী কুন্তীপুত্র সৌভাগ্যগর্ব্বিত
দীপ্ত ভুজতেজে বিজয় গৌরবে। এবে

ধনমদে মোরে তুচ্ছ গণে অনুক্ষণ।
তাত! দেহ আজ্ঞা, দেবন-সংগ্রাম তরে
পাণ্ডবে করিতে আবাহণ।

ধৃত। দুর্য্যোধন!
মন্ত্রী মম ধর্ম্মজ্ঞানী বিদুর সুমতি,
তারে না জিজ্ঞাসি অনুমতি দিতে নারি।
তবে পারি লয়ে তার মত; হিতবাদী
ক্ষত্তা—জানি সদা কুরুকুল অনুগত—
উভয়তঃ করিয়া বিচার, হবে যায়
মঙ্গল সবার, অকপটে কহিবে সে
নিশ্চয় আমায়।

দুর্য্যো। সর্ব্বনাশ! তাত!
যদি বিদুরে কহিবে, হবে ব্যর্থ তব
অভিপ্রায়। সদা তার অন্তরে অন্তরে
বড় স্নেহ পাণ্ডবেরে; সমরে পাশায়
অভিমত কদাচ নহিবে তার জানি,
বরঞ্চ সে নিরস্ত করিবে তর্কজালে;
তেঁই এই কালে দেহ আজ্ঞা, নহে প্রাণ
ত্যজিব নিশ্চয় হুতাশনে; আমি ম'লে,
বিদুরের সনে ভুঞ্জ রাজ্য অধিকার,
আমি কণ্টক সবার জানি এতদিনে।

ধৃত। দুর্য্যোধন! হেন ভাবা না আন বদনে!
বাজে প্রাণে—খেল পাশা করিয়া প্রকার।
শতদ্বার-সভা সেই তব জন্মদিনে
শুভক্ষণে করিনু নির্ম্মাণ, কর শীঘ্র
আজ্ঞা সুনিপুণ শিল্পীগণে,
বিবিধ বরণে সাজাইতে সেই সভা,
যেন হয় সর্ব্বজন মনোলোভা হেন
দেখেনি কখন যাহা ভারত মাঝারে।
পাণ্ডুর রাজত্বকালে যেই রত্নমণি

সঞ্চয় করিনু, বড় বড় রাজগণে
নয়নে হেরেনি এক ঠাঁই। যাও বৎস!
সভা সজ্জা হ'লে দেহ বার্ত্তা; এবে ত্যজ
দুঃখ মন। (দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রস্থান)
পুত্রস্নেহ বিষম বন্ধন!
হয় না মোচন ভব মায়া, ধরি কায়া
নরে কে তায় এড়ায়? কে আছ, বিদুরে
সত্বরে আনহ হেথা। কিন্তু ভাবি তাই,
সদা মোরে ধর্ম্মজ্ঞ সুধীর যুধিষ্ঠির,
পিতৃসম মানে পূজা করে কভু ভ্রমে
নাহি অনাদরে, মন বাক্য সদা লক্ষ্য
পাণ্ডুর আছিল যথা তুষিতে আমায়!
হেন জনে কপট পাশায় নাহি জানি
কেমনে ডাকিব! নষ্টপুণ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট
হব? ভাল, বনে ধর্ম্ম করিব অর্জ্জন,
তনয় রতন যদি যায়, কোথা পাব?
পুত্র মম দুর্য্যোধন অন্ধের নয়ন!
রাজ্য ধন সর্ব্ব ধন হ'ল যার হ'তে।
সর্ব্বমতে অন্ধ না পাইনু সিংহাসন,
পাণ্ডুদত্ত ধন গ্রহণ করিতে সদা
ছিল চিতে আপনারে অতি হীন জ্ঞান,
নিতান্ত কুণ্ঠিত সদা দুঃখিত অন্তর;
দুর্য্যোধন পুত্রে আমি হস্তিনা-ঈশ্বর!
যদি কাতর সে, অহো! অন্তরে প্রবোধ
দিব কিসে? ক্ষত্রধর্ম্মে আছেত দেবন।
(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। হে রাজন! করি তব চরণ বন্দন।

ধৃত। ভাই! চাহে দুর্য্যোধন খেলিতে দেবন
সত্য পণে একদিন পাণ্ডবের সনে।
কতেক বিচারি তারে নিবারিতে নারি,

শেষে দিনু আজ্ঞা খেলিবারে পাশা
সত্য পণে ; এবে ভাবি কে জিনে কে হারে
নাহি জানি, কহ শুনি তোমার মন্ত্রণা।

বিদুর। মহারাজ ! কহি সত্য, একি কৈলা কাজ ?
কুরুকুলক্ষয় কিহে ছিল তব মনে ?
দেবন ব্যসন প্রবর্ত্তন ; সাধে সাধে
পুত্রগণ মাঝে বিবাদ সূচন কভু
কর্ত্তৃপক্ষ নাহি করে ! হে আর্য্য ! কদাপি
দুরোদরে ইন্দ্রত্বের তরে যদি হয়—
করিনা অনুমোদন ; প্রমত্ত পাশায়,
হিতাহিত জ্ঞান ধ্বংস পায়, হয় শেষে
আত্মীয়-বিচ্ছেদ দ্বার স্বতঃ উদ্ঘাটন,
শেষে ঘটে মহারণ কুলক্ষয়-কর,
অধর্ম্ম বিস্তর—দুস্তর নরকে মজে
সবে ; আর্য্য ! হেন কার্য্য না সাজে তোমায়।

ধৃত। হায় ক্ষত্তা, আমি কি কহিব তায় ?
দৈব প্রতিকুল সত্য—নহে কোন্ হেতু,
পুত্রসব মাঝে হেন বিরোধ ঘটিবে ?
ফলিবে যা বিধির লিখন !

বিদুর। মহারাজ !
পুত্র দুর্য্যোধন তব কুরুকুলকেতু,
আপনি ঘটায় আনি আপন মরণ।

ধৃত। হে বিদুর ! এবে করা বৃথানুশোচন !
তুমি আমি ভীষ্ম দ্রোণ নিকটে থাকিতে
দ্যূত হতে অবিনয় সম্ভব না হয় ;
যদি ঘটে—নিরস্ত করিব হে নিশ্চিত !
হলে সুসজ্জিত সভাগৃহ, যাও চলি
ইন্দ্রপ্রস্থে, যুধিষ্ঠিরে আনিবে হেথায়।
হে বিদুর। এই পাশা আমার ব্যবস্থা—
হেন ভাষা কহিও না কভু পাণ্ডবেরে,—

এ ঘটন দৈবেতে ঘটিল।

বিদুর। হায় আর্য্য !
কি আর কহিব ? কার্য্য না করিলে ভাল,
জানিলাম কুরুপাণ্ডবের সর্ব্বনাশ
হ'ল এতদিনে। যাই ভীষ্মের সদনে। (প্রস্থান)

ধৃত। চিন্তা, চিন্তা যত করি সকলি বিফল,
যা আছে বিধির মনে ঘটিবে সকল। (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

আগমন-গীত।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

কে এল বঙ্গ-মাঝে ?
আকাশে বাতাসে কাননে সাগরে
কার আগমনী বাজে ?
ভুবন ভরিয়া কেন এতো আলো,
চোখে আজ সব কেন লাগে ভাল,
দিগ্ দিগন্ত সাজিয়াছে কেন
হেন অপরূপ সাজে ?
কে এল বঙ্গ-মাঝে ?
কেন শেফালিকা শুভ্র হাসিতে,
ফুটিয়া উঠেছে ওই ;
কেন অরুণের কনক রেখায়
ধরা করে থই থই ?
পূজা-মণ্ডপে কেন ফুল-ফল,
কেন ধূপ-ধুনা, জননীর দল,
কেন দুয়ারেতে কদলী-পাদপ
আম্র-কলস রাজে ?
কে এল বঙ্গ-মাঝে ?

বন্দনা। *

নাট্যাচার্য্য — শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

যোগীবর-জটাজাল-বিহারিণি !
সুখদে মোক্ষদে দুঃখনিবারিণি !
করুণাকারিণি, ত্রিতাপহারিণি,
নমামি নমামি সুরধুনি গঙ্গে !
ক্ষিতিতে পতিতে উদ্ধার কর্ত্রি !
তৃষিতে ক্ষুধিতে সুধারসদাত্রি !
প্রেম প্রবাহে সিন্ধুসঙ্গম-যাত্রি !
নমামি জাহ্নবি, তরল-তরঙ্গে !
প্রপাতাঘাতে ঐরাবত-দলনী,
কলকল্লোলা গঙ্গা বিমলিনী
সিতফেন-কুসুমমাল-মালিনী,
ধরাতল ঝলমল লীলারঙ্গে।
জগতের মাতৃ জগতের ধাত্রী,
পবিত্রতা ব্রতে নারী তব ছাত্রী,
মাতৃস্নেহরস প্রাপণের পাত্রী,
ভীত-ভয়হরা মাতঃ সিত-অঙ্গে !
হরিদ্বারঘোরে, মণীন্দ্রনন্দনে লয়ে পঙ্কজ অঙ্কে
করি স্নেহবন্ধনে ধন্য, করি রাজনে
পুণ্যচন্দনে বসুমতী কোলে তুলে দিলে দান।
ভকতি প্রণতি বঙ্গসতী করে,
পূজে মা তোমারে পূজে গঙ্গাধরে,
যেন হরিহর হরজায়াবরে,
চির আয়ু ধরে এ নর প্রধান।
গঙ্গা গঙ্গা ব'লে গাই স্তুতিগান ॥

* কাশিমবাজারের মহারাজা হরিদ্বারে জলমগ্নাশঙ্কা হইতে দৈব-পরিত্রাণ হইবার পর মাতাজি সেবাময়ী দেবীপ্রতিষ্ঠিত মহিলাহিতকারিণী সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বন্দনাটি দেবী জাহ্নবীচরণোদ্দেশে গীত হইয়াছিল।

মিলন।

লেখক—শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আকাশে বাতাসে অনলে জলে—
স্থলে মরুতলে দেখিতে পাই,
আলো অন্ধকারে হিম ধূলাপরে
এক রূপ ছাড়া দ্বিতীয় নাই।

যতই চিনিতে চিন্তিত হই
চেনা দিতে তুমি নিকটে এসো,
চিন্তার স্রোতে লীন হয়ে গেলে
অতি চুপ্ এসে মনেতে মেশো।

ধ্যান ছেড়ে পুন চাহিয়া দেখিলে
ফাঁকি দিয়ে তুমি চলিয়ে যাও,
নির্ণয় লওয়া জানিতে পারিলে
বিশ্বেতে রূপ মিশিয়ে দাও।

অজানা অচেনা অপরূপ রূপ
চিনিতে বাসনা তাই না চায়,
তোমার মিলন বিচারেতে দেখি
লীনত্ব বই অনন্যোপায় ॥

গঙ্গার বন্দনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজবিহারী ভট্টাচার্য্য।

(১) কে জানে মহিমা তব গঙ্গে !
এ অধমে চাহ মাগো করুণাপাঙ্গে ॥
নীর রূপেতে কলুষ নাশিতে,
পাতকী তরাতে অবতীর্ণা অবনীতে ॥

ভীষ্মজননী নাম ধরেছ মা জগতে।
তব নাম যেই লয়, দূরে থেকে মোক্ষ পায়
অনায়াসে সেই যম যাতনা এড়ায়.
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি কোন স্তুতি,
অন্তে পদে দিও স্থান রেখো এ মিনতি।

শিবস্তুতি।

(২) প্রমথ সঙ্গে ভ্রুকুটি ভঙ্গে
নানাপ্রসঙ্গে ধরিছে তান।
শিঙ্গা ডমরু রোল হতেছে ঘন ঘন,
তাথেয়া তাথেয়া রবে নাচিছে প্রেতগণ।
নাহি লজ্জাভয় অট্ট অট্ট হাস —
ভালে মিটি মিটি জ্বলিছে ত্রিনয়ন॥
সহজে নাহিক রোষ সদাই সন্তোষ।
অভয়বরদানে নামে আশুতোষ॥

মহিমার—মহিমা।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র।

দেবু আমাদের পুরাণো চাকর বটে,—অনেক দিন ধ'রে এ বাড়ীতে কাজ করেচে—আর আমাকে এক রকম মানুষ করেচে—তা ঠিক—

যাক্, তা বল্লে কি হয়? প্লেগের রোগীকে বাড়ীতে রাখা ঠিক নয় ভেবে, দেবুকে আজ হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দোবার জন্যে, দরোয়ান রামদীনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে—ওকে দিয়ে একখানা গাড়ী আনালুম।

গাড়ী আনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেবুকে বল্লুম,—"টপ্ ক'রে উঠে পড়, দেরী কোর না।

দেবু মিনতি-ভরা দৃষ্টি মেলে বল্লে,—"দাদা, তোমাকে আমি কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেচি, আমার একটা কথা রাখ, বাড়ী থেকে একবার মা-টীর সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌তে দাও, আর বেঁচে ফিরে আস্‌বো কি না ঠিক নেই, হয়তো আমার লক্ষ্মী মা-টীর-সঙ্গে জন্মের শোধ আর দেখা হবে না।"

আমি আমার নব-বিবাহিত বধূর কথা ভালরূপ জান্‌তুম। ভেবে দেখলুম,—মা, ওরফে আমার গৃহিণীর কাছে বিদায় চাইতে গেলে, সে কখনই দেবুকে ছেড়ে দেবে না, তার ওপর এই অসুখের সময়—তাই বল্লুম,—"না—রামদীন গাড়ী ভাড়া ক'রে এনেচে, তুমি গাড়ীতে ওঠ, ও তোমাকে রেখে এসেই আমার একটা ভারী- জরুরী কাজে যাবে, দেরী হ'লে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে।" ওদিকে গাড়োয়ান বল্লে,—"বাবু, দেরী কর্ব্বেন না।"

জো পেয়ে আমি বল্লুম,—"নাও, ওঠ।"

দেবু পুনরায়,—একবার মা-বল্‌তেই আমি ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলুম,—"এখন ত সেরে ওঠ গে যাও, মা ঠাক্‌রুণের সঙ্গে দেখা ক'রে কি হবে? ছাই হবে!" দেবু বিনা বাক্যব্যয়ে এইবার গাড়ীতে উঠে বস্‌লো। গাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে দিলে।

শরতের রাত্রি।

মশারি-তোলা খাটে, মহিমার মুখের ওপর, দক্ষিণ ধারের গরাদের ফাঁক দিয়ে ধপ্‌ধপে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। আর, বাতাসে তার মাথার কয়েক গাছি কোঁকড়ান চুলও উড়ে উড়ে তার কপালের আশে পাশে চপল ঢেউ-শিশুর মত খেলা কচ্ছিল।

চুলে খোলা-ঢাকা, চাঁদের আলোয় মাখা মহিমার মুখের পানে তাকিয়ে ভাব্‌তে লাগলুম,—আজ মহিমা কেন আমার আগে শুয়ে পড়্‌লো—সেত কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প না ক'রে ঘুমোয় না।

অনেক রাত ধ'রে একটা কবিতা লেখায় ব্যস্ত ছিলুম। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমার মনে হ'ল—অনেক রাত হ'য়ে গেছে—বোধ হয় তাই মহিমা শুয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ীতে তখন গ্রামোফোন সুর ক'রে গাইছিলো:—

ওই দেখ সখি! ঘুমাল রজনী
সুনীল গগন পরি,
ওই দেখ সখি! চুমিতে ধরণী
আলোক পড়িছে ঝরি!
ওই দেখ সখি! ফুটে ফুলকলি,
গায়ে গায়ে গায়ে পড়ে ঢলি ঢলি,
পারে নাক কেহ একাকী রহিতে
এ জগতে প্রাণ ধরি!

আর তার সঙ্গে আমাদের বাগান থেকে শিউলি ফুলের মিঠে গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল!

আমার মন এই চাঁদের আলোয়, ফুলের গন্ধে, গ্রামোফোনের সুরে কি একটা রঙীন্ কল্পনায় বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লো।

হঠাৎ মহিমার চোখের উপর চোখ পড়্‌লো—দেখলুম, মহিমার চোখের কোলে দুফোঁটা জল টলটল কর্চ্ছে। তার ওপর জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে, সেই জল দুফোঁটা হীরের মত জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠলো।

তখন আর কিছু দেখ্‌বার বা ভাব্‌বার সময় ছিল না। মহিমার গায়ে হাত দিয়ে মিষ্টি-গলায় ডাক্‌লুম,—"মহিমা!"

মহিমা উত্তর দিলে না।

এইবার তার ডান হাতখানা হাতে ধ'রে একটু চাপ দিয়ে বল্লুম—"মহিমা!"

মহিমা আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"কি?"

আমি বল্লুম—"কাঁদ্‌চো কেন?"

মহিমা বল্লে,—"কে বল্লে?"

আমি বল্‌লুম—"ওই চোখে জল।"

মহিমা উত্তর দিলে না। আমার হাতের ভেতর থেকে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরে, আবার চোখ বোজালে।

আমি আসল কারণ বুঝ্‌তে না পার্লেও, এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম,—মহিমার অভিমান হ'য়েছে। আর, আমার সঙ্গে গল্প না ক'রে শোয়া তারই কারণ।

যাক্—আসল কারণ জানবার জন্যে, আমি মহিমার গায়ে আবার হাত দিয়ে মিষ্টি গলায় ডাকলুম,—"কি হয়েছে বলনা মহিমা!"

মহিমা তার হাত দিয়ে, আমার হাতখানা ঠেলে দিয়ে বল্লে—"জানি না, যাও।"

* * *

অনেক সাধ্যসাধনার পর মহিমা বল্‌লে,—"আমার অসুখ হয়েচে।"

আমি বল্‌লুম,—"তার জন্যে কাঁদা কেন, অভিমান কেন?"

মহিমা বল্‌লে,—"আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও।"

আমি বল্‌লুম,—"হাঁসপাতালে কেন, কি অসুখ?"

মহিমা জবাব দিলে—"খারাপ অসুখ, প্লেগ।"

আমার ও কথা বিশ্বাস হ'ল না। তবু বল্‌লুম,—"বেশ, তা হাঁসপাতালে কেন?"

মহিমা গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—"তা হ'লে দেবুকে পাঠালে কেন?"

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লুম—"তুমি আর দেবু!"

মহিমা তীব্রস্বরে বল্‌লে,—"ছিঃ, বল্‌তে লজ্জা করে না। প্রাণ সকলেরই সমান, তার ওপর তুমিই নিজে কতবার বলেছ,—দেবু তোমাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, আর তুমি তাকে অসুখ হয়েছে বলে হাঁসপাতালে বিদেয় ক'রে দিলে! কেন, আমি তার সেবা কর্‌তুম, কচ্ছিলুমও ত।"

* * *

হঠকারিতায় দেবুকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবার পর থেকে আমারও মনে একটা দারুণ অনুশোচনা হচ্ছিল। আমি কিছুক্ষণ চুপ্ থেকে বল্লুম—"মহিমা! তোমার অসীম মহিমা—কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন, ভিখারিণীর নাম কমলা, দয়াহীনের নাম দীনদয়াল বাস্তব জগতে এই দেখে আস্‌চি, নামের সঙ্গে কাজের সাদৃশ্য খুব কম দেখ্‌তে পাই—কিন্তু মহিমা! তোমার মহিমা নাম উপযুক্ত হয়েছে, কালই দেবুকে ফিরিয়ে আন্‌বো।"

উৎফুল্ল কণ্ঠে মহিমা বল্‌লে,—"নিয়ে আস্‌বে, সত্যি বল্‌চো?" আমি বল্‌লুম, "নিশ্চয়, কিন্তু তা হ'লে তুমি আমায় কি দেবে মহিমা?"

মহিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—"ফুলের মালা দোব।"

আমি বল্‌লুম—"ও আমার চাই না।"

মহিমা সেই রকম হাসির সঙ্গেই বল্‌লে—"তবে কি চাও?"

আমি বল্‌লুম,—"সেই"—বুঝ্‌তে পেরেচ?"

মহিমা একটা কৃত্রিম ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে—"যাও—রাতদিন তোমার—"

আমি কিন্তু মহিমাকে রেহাই দিইনি।

* * *

পরের দিন নিজে গিয়ে দেবুকে মেডিকেল কলেজ কটেজ ওয়ার্ড থেকে নিয়ে এলুম।—

এখন মহিমার সামান্য একটু সর্দ্দি, সামান্য একটু কাশি, সামান্য একটু পেটখারাপ বা সামান্য একটু জ্বর হ'লে আমার খোঁচা দিয়ে বলে—'হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও।"

মাতৃ-আবাহন।

মা—কি মধুর নাম! যাহার মা নাই, জগতে তাহার কেহ নাই,—সেই মা—সেই স্নেহময়ী করুণাময়ী মা সেই অমৃতময়ী মাধুরীময়ী মা—আমার একার নহে, কোটি কোটি সন্তানের মা—আনন্দময়ী; মা, এহি, এহি!

শুভ শরৎ সমাগত, অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত গগনমণ্ডল কৌমুদীহাস্যে উচ্ছ্বসিত, এই ত সময় মা! মর্ত্তে তোমার শুভ আগমনের এইত মুহূর্ত্ত; মা আর বিলম্ব কেন,—মা, এহি, এহি!

কিন্তু মা! আনন্দময়ি! আমার মনে হয়, তোমার আগমনে পদে পদে বাধা, তাই এবার তোমার আগমন-দিনে সপ্তমীপূজা দিনে ত্র্যহস্পর্শ,—যাত্রানাস্তি।

মা! তোমার চিরপ্রিয় বঙ্গভূমি আজ তোমার সন্তানের শ্মশানক্ষেত্র; আর্ত্ত বুভুক্ষু দানহীন সন্তানের কঙ্কাল-সার শরীরে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ।

মা!—এবার এখানে আসিয়া বুঝি তোমার আনন্দময়ী নাম বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সন্তানের দুঃখে বিগলিত হইয়া ত্রিনয়নে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইবে—বুঝি বা সেই জন্যই তোমার শুভ আগমন দিনে যাত্রানাস্তি!

মা! তাই বলিয়া তুমি যে আসিবে না, তা হইবে না। মা! মুমূর্ষু সন্তান অন্তিম শয্যায় মাতৃমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যগ্র; মাএর করুণাশ্রুপ্লাবিত স্নেহময় উৎসঙ্গে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া শান্তি-লাভে অভিলাষী, সর্ব্ববিপদনাশন মাতৃপদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইতে ইচ্ছুক—এ সময়ে মা! তুমি না আসিলে, মা নামে যে কলঙ্ক হইবে।

মা! আরও একটী কথা;—বঙ্গদেশের পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমারই নামের মহিমায়, তোমারই সাধনার বলে, শমনদেবকে তৃণজ্ঞান করিতেন; তাঁহাদের উপর যমের অধিকার ছিল না; সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য শমনদেব এখন তাঁহাদের অকৃতী বংশধরগণের উপর কঠোর অত্যাচার করিতেছেন; আমরা সেই অকৃতী বংশধর পূর্ব্বপুরুষের সাধনা ভুলিয়াছি একাগ্রতায় জলাঞ্জলি দিয়াছি—আমরা মা! তোমায় ভুলিয়া সেই চিরশত্রু অত্যাচারী যমরাজেরই অনুবৃত্তি করিতেছি; মা! এ সময়ে একবার আসিয়া মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করিয়া আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেও,—মা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে! পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায় এই অকৃতী সন্তানগণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেও,—আমরা

তোমায় ডাকিতে শিখি, তোমার নাম জপ করিতে সমর্থ হই, তোমার সাধনায় অধিকারী হই,—শমনরাজের সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইব। মা! তুমি কালভয়নিবারিণী; আমরা তোমার সন্তান, একথা আমরা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি পড়া-পাখীর মুখস্থ বুলির মত তোমাকে কখন কখন মা বলিয়া ডাকি বটে; কিন্তু তাহা অন্তরের নয়। নতুবা যদি তোমাকে মা ভাবিয়া—তোমাকে কালভয়নিবারিণী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা আনন্দময়ী ভাবিয়া—এই দারুণ কালভয়েও মা মা রবে তোমার দিকে ছুটিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে মা! তুমি অবশ্যই কালভয় নিবারণ করিতে। মা! কালের কি সাধ্য যে তোমার ঐ দশভুজা মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হয়, যে সন্তান—মা বলিতে বলিতে তোমার অভয় পদে আশ্রয় গ্রহণ করে, কাল তাহাকে দেখিয়া ভীত হয়। আমরা যেমনই হই, যত ভ্রান্ত, পামর এবং অধম হই, বাস্তবিক ত আমরা তোমারই সন্তান, মা হইয়া কোন্ প্রাণে মুমূর্ষু সন্তানকে না দেখিবে মা!

মা! রাজপুত্র উন্মত্ত অবস্থায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে রাজার নাম করে, রাজ্যের নাম করে, অনেক অসম্বদ্ধ কথাও বলে; কে তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? সে তখন রাজপুত্র হইয়াও নিরাশ্রয় পথের ভিখারী। মা! আমাদেরও সেই অবস্থা—আমরা উন্মত্ত! আমরা যে আনন্দময়ী সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা অন্নপূর্ণার পুত্র, তাহা প্রকৃত পক্ষে ভুলিয়া গিয়াছি। এক এক-বার তোমার নাম করি বটে; কিন্তু তাহা এত অসম্বদ্ধ কথার সহিত জড়িত যে, সে নামের সঙ্গে আমাদের যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় না! তাই আমরা চির নিরানন্দ, চির অশক্ত, আধিব্যাধিপ্রপীড়িত এবং দুর্ভিক্ষে জর্জ্জরিত। কেহ উদ্ধারকর্ত্তা আমাদের নাই। তার পর, সেই উন্মত্ত রাজপুত্র এক দিন তাঁহার পিতার নয়ন গোচর হইলেন, পিতা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া যত্ন করিয়া প্রাসাদে লইয়া আসিলেন, তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, ক্রমে রাজপুত্র নীরোগ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। মা! তুমি আসিলে, সন্তানের দুর্গতি এ সময়ে একবার স্বচক্ষে দেখিলে, তুমি কি স্থির থাকিতে পারিবে, নিশ্চয় আমাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে যত্ন করিবে। তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টিস্থিতি সংহার হইয়া যায়; আর তোমার যত্ন হইলে, আমাদের দুর্দ্দশা কি দূর হইবে না! অবশ্যই হইবে, আমরা প্রকৃতিস্থ হইব! আনন্দময়ীর পুত্র আনন্দময় হইব, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতার পুত্র সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইব, অন্নপূর্ণার পুত্র অন্নপূর্ণ হইব। মা! তাই বলি, এহি, এহি, এস, এস। মা! সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিলে তোমার ক্লেশ হইবে? আহা!

হউক হউক—আনন্দময়ি! একবার ক্লেশের বার্ত্তা গ্রহণ কর। তোমার ক্লেশে করুণার উৎস ছুটবে,—অকৃতী বঙ্গসন্তানগণ, চিরতাপদগ্ধ বঙ্গসন্তানগণ সেই উৎসের অমৃত ধারায় শান্তি লাভ করিবে। মা! এহি, এহি, আগচ্ছ! আগচ্ছ!

আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে!

মা! "তদ্দূরে তদু অন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" তুমি যে দূরস্থ ও নিকটস্থ, তুমি যে বাহ্যস্থ এবং অন্তঃস্থ, এ উপদেশ ধারণা করিতে আমরা অসমর্থ। মা! তুমি যে সর্ব্বস্বরূপা তোমার যে আবাহন বিসর্জ্জন নাই, তুমি যে বিশ্বব্যাপিনী, এ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে যে আমরা অসমর্থ; তাহার জন্য খেদ করি না। মা! আমরা তোমার মাতৃভাব, স্নেহময়ী জননীর ভাব, যে ভাবে ঘরে ঘরে তুমি নিত্য বিরাজিতা, আমাদের চিরপরিচিত তোমার সেই ভাব ত আমরা ভুলিতেছি, ইহা আমাদের বড়ই দুঃখ। মা! চিন্ময়ি! এই যে আমাদের ভ্রান্তি, এ লীলা ত তোমারই; অবোধ সন্তানের প্রতি এ লীলা কেন মা!—একবার বিদ্যারূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, একবার শ্রদ্ধারূপে আমাদের অন্তরে আসন গ্রহণ কর, ভক্তিরূপে আমাদের চিত্তে উদিত হও, মা—এস, এস, দশভুজে! কোটি পরিবারসমন্বিতে! সর্ব্বভয়নিবারিণি! সর্ব্বাশুভনাশিনি! এহি, এহি, আগচ্ছ! আগচ্ছ! আমরা প্রাণ ভরিয়া এককণ্ঠে যেন বলিতে পারি—

"কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রর্হিমপর্ব্বতাৎ।
স্বাগতং দেবদেবেশি মাহেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥"

মা! আমরা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় তোমার চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তির অধিষ্ঠান বুঝিয়া আমাদের ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে তোমার সুরেন্দ্রসেবিত অমরাবতী-দুর্লভ শ্রীচরণের শুভ সম্পর্ক অনুভব করিয়া ভক্তিভরে যেন বলিতে পারি,—"মা দেবদেবের ঈশ্বরি! তোমার সেই সিদ্ধচারণসেবিত ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত বেদধ্বনি নিষাদিত পারিজাত-পরিমল মনোহর কৈলাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজা উপলক্ষ করিয়া, জন-মনোহর বিন্ধ্য পর্ব্বতে অসুরগণ ও মুনিগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, মন্দাকিনী কল-কল-মুখরিত পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ভবনে পিতৃবাৎসল্য মাতৃ-স্নেহ এবং সখীপ্রীতির সংবর্দ্ধনায় না ভুলিয়া, মা! এই অকৃতী অধম সন্তানের ক্ষুদ্র কুটীরে শুভাগমন করিয়াছ; মা, মহেশ্বরি!—এত কৃপা, এত বাৎসল্য না হইলে কি আর সকলের ঈশ্বরী হইতে? মা! তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

স্বাধীনতাপ্রিয় পতির প্রতি পত্নী।

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত

প্রেমাস্পদেষু—

ছিল না বাসনা কিছু লিখিতে তোমারে,
লিখিতে হইল তবু সভ্য ব্যবহারে।
কি ছল পাইয়া তুমি ত্যজিলে আমায়,
কেন নাহি চেয়ে নিলে অন্তিম বিদায়?
তুমি আমি এক প্রাণী, দম্পতির রাণী,
তুমি যদি রাজা হও, আমি হব রাণী!
বিদেশী হইলে তুমি, আমি বিদেশিনী,
সন্ন্যাসী যদ্যপি হও, আমি সন্ন্যাসিনী,
মেয়েদের এই কথা, বাঙ্গালীর মেয়ে,
আমি কিছু উচ্চমনা সবাকার চেয়ে।

আপনি তোমারে আমি করিয়াছি বিয়ে,
তুষিয়াছি কত দিন ভালবাসা দিয়ে,
বেশ ভালবাসা ছিল তোমার উপর,
ভেবেছিনু হবে তুমি রসিক নাগর—
তা না হয়ে বনিয়াছ দিব্য বনচর,
প্রেম ঈর্ষানলে ভরা তোমার অন্তর।
তব বন্ধু সনে আমি বিবি সজ্জা করে,
মটরেতে চড়ে যাই, ভয় করি কারে ?
প্রতি শনিবার দিনে বেলা অবসানে—
হেসে খেলে চলে যাই সুখের বাগানে,
তাই দেখে জ্বলে গেছে তব ঈর্ষানল,
দিন কত হয়েছিলে প্রচণ্ড পাগল,
রাগে দ্বেষে ফুলে ফুলে না পেয়ে উপায়,
মিছে ছলে পালায়েছ ত্যজিয়া আমায়।
প্রাণেশ্বর ! বল দেখি কেন হেন ভাব ?
কবে কি বুঝেছ কিছু প্রেমের অভাব ?
পিতৃ ধনে কিনিয়াছি, প্রেম বিলায়েছি,
হৃদিপদ্মাসনে নিত্য আসন দিয়েছি,
বল কিসে ছল পেলে, বল দেখি ভাই,
তব সঙ্গী সঙ্গে আমি বেড়াইতে যাই,
তাই কি ভেবেছ তুমি ঘটিতেছে দোষ ?
তাই কি আমার প্রেমে প্রকাশিছ রোষ ?
কি দোষ পেয়েছ তাতে, লুকোচুরী কিবা,
মিথ্যা কথা বলিব না সাক্ষী নিশি দিবা।
যতেক তোমার বন্ধু, অখণ্ড প্রণয়,
তারাও আমারো বন্ধু, জানিও নিশ্চয়,
বন্ধুসনে বিচরণে প্রেমানন্দ মানী,
তাতে কোন বাধা নাই, এই আমি জানি।
দোষ নাই, লজ্জা নাই, আশঙ্কাও নাই,
তবে কেন রাগ কর বল দেখি ভাই ?

জান তুমি এক আত্মা তোমায় আমায়,
এ সংসারে উভয়ের সম অধিকার,
তুমি সদা স্বেচ্ছামত কর বিচরণ,
আমি কেন করিব না, কি আছে কারণ ?
বন্ধুসনে বেড়াইব একান্ত বাসনা,
তাই তব বন্ধু জনে করি উপাসনা।
এখন নীরব নহি, তোমার কল্যাণে,
আমার অনেক বন্ধু মিলেছে এখানে।
বাগানে বেড়াতে যাই, তাই মন্দ ভাব,
বন্ধুগণ সঙ্গে শীঘ্র মধুপুরে যাব।
দেহ প্রাণ ভাল রাখে তথাকার বায়ু,
প্রেমের প্রবাহ বহে, বৃদ্ধি করে আয়ু।
তাই যাব মধুপুরে করেছি মনন,
সঙ্গীও মিলেছে ভাল মনের মতন।
সব ঠিক হয়ে গেছে, যাইব সত্বর !
যাও যদি ফিরে এসো করুণাসাগর ॥
ট্রেণ ভাড়া লাগিবে না, নিজ হতে দিব,
নিজ বাসে পরিতোষে যতনে রাখিব।
নীলাম্বর ! এ কথায় কি দিবে উত্তর ?
বাধা দিতে পারিবে কি হিংসা বিষধর ?
বাধা কথা মনে হলে সুধু হাসি পায়,
স্বাধীনা জেনানা আমি, কে রোধে আমায় ?
যথা তথা উড়ে যাব চরিব আকাশে,
স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ পাব অনায়াসে।
বন্ধু করে প্রেম যদি করি সমর্পণ,
তাহাতেও হতে পারে পুলকিত মন।
নাটক নভেল কত করিয়াছি পাঠ,
প্রেমরাজ্য দ্বারে কভু থাকে না কপাট,
অনাবৃত অবারিত প্রেমের প্রাসাদ.
থাকে না সেথানে কোন বাদ প্রতিবাদ।

স্বাধীন জেনানা আমি, বাসনা আমার
অবলার স্বাধীনতা করিব প্রচার।
প্রতিবাদী হয়ে তুমি চলাবে কেবল,
রক্ষিবার চেষ্টা সব হইবে বিফল।
বসিয়া ঘরের কোণে লাজে মুখ ঢেকে,
হাঁপায়ে মরিব ঘোর অন্ধকারে থেকে,
সেটা তুমি মনে আর দিও নাকো ঠাঁই,—
ভোটে অধিকারী নারী, স্বাধীনতা চাই।
করিব না প্রায়শ্চিত্ত, করি নাই পাপ,
ভুঞ্জিতেছি স্বাধীনতা, নাহি অনুতাপ।
রাগে বিষে জ্বলিতেছ, বড় পরিতাপ,
ফিরে এস মম পাশে ত্যজি মনস্তাপ।
আর কিছু বলিব না, এস প্রাণধন!
স্বাধীনা জেনানা আমি, করি নিমন্ত্রণ।

প্রেমবিলাসিনী—শ্রীমতী

কেন ?

লেখিকা—শ্রীমতি শৈলরাণী বসু, বি, এ।

আজি, রহিয়া রহিয়া রহিয়া
বাজে কেন বীণা মোহিয়া।
কেন পঞ্চম রাগিনীতে
হরষে ওঠে তান চিতে,
নিশুতি জাগার নিশীথে
ঘন ঘন বাণী কহিয়া।
আজি, নীরব বীণার মুরলা
কেন তুলে হেন কাকলী।
কেন মরমের তার
খুলে দেয় হৃদি-দ্বার,
রহে কেন আশে কার
সমারোহ গীত বহিয়া।
আজি, চারি দিক্ কেন হাসিয়া,
কেন সে আসন লাগিয়া।
কেন এ নিঝুম রাতিতে,
হ'ল আলা কার ভাতিতে
বন্দনাগার নিরভিতে.
চরণের সুখ সহিয়া॥

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

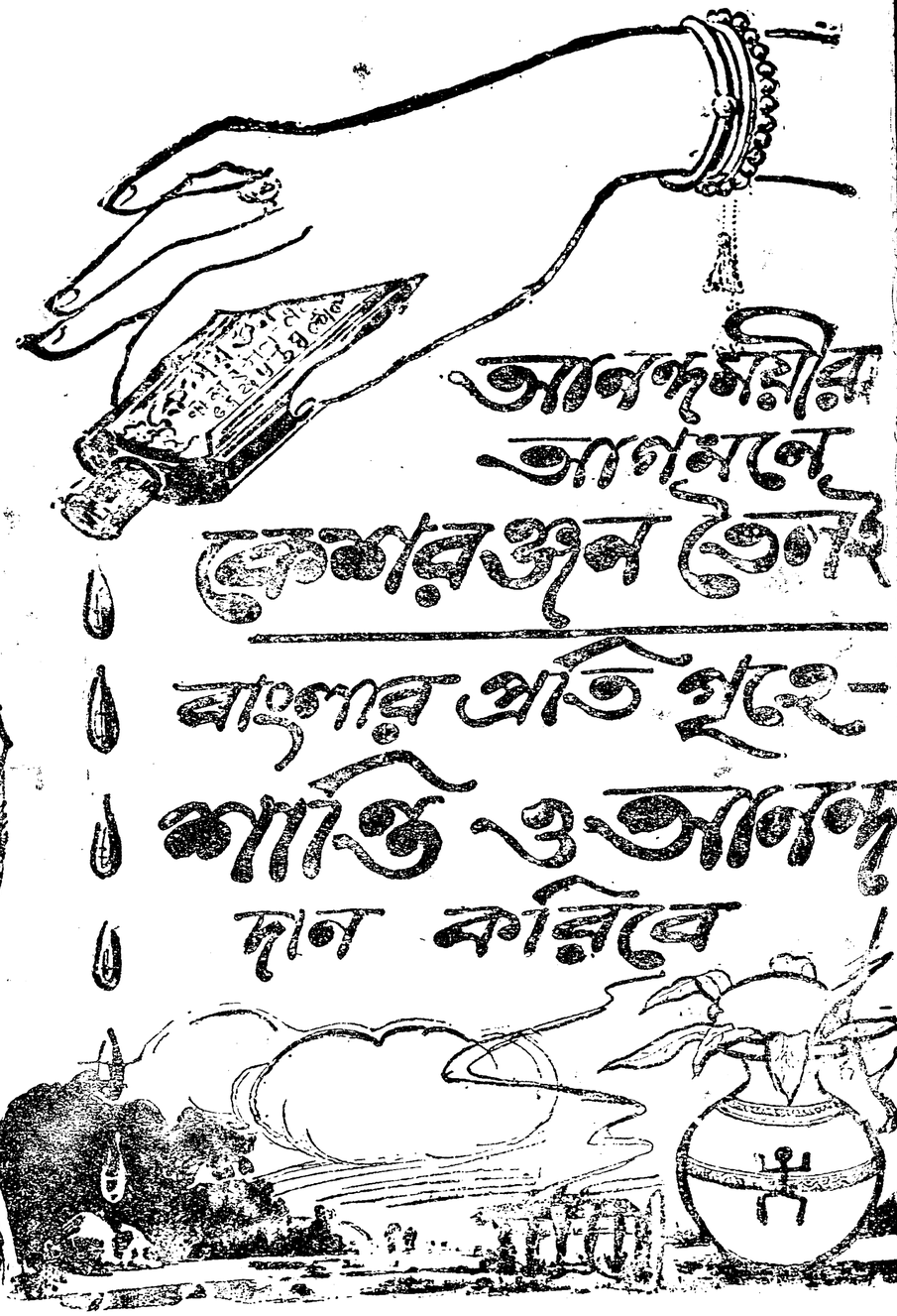

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক— শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ]   ১৩৩৪, কার্ত্তিক,   [৭ম সংখ্যা

১।	বিসর্জ্জন		৫৭৩
২।	পাণ্ডব নির্ব্বাসন	শ্রীযুক্ত স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	৫৭৬
৩।	কমলা	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৫৮১
৪।	ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-সংবাদ		৫৯৬
৫।	মহাপুরুষের দক্ষিণেশ্বরে গমন	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৫৯৯
৬।	একা	শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ	৬০২
৭।	সবার রাস টানে যে, তাহার রাস টানে কে	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৬০৩
৮।	অর্ঘ	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ	৬০৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
১২ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

3 I 28

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে!   পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৷৵০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুবিধা

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B. মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ } ১৩৩৪ সাল, কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা

বিসর্জ্জন।

দেখিতে দেখিতে চকিতে চমকে বিজলী ঝলসে তিন দিন চলিয়া গেল! সুখের দিন এমনই করিয়া যায়।

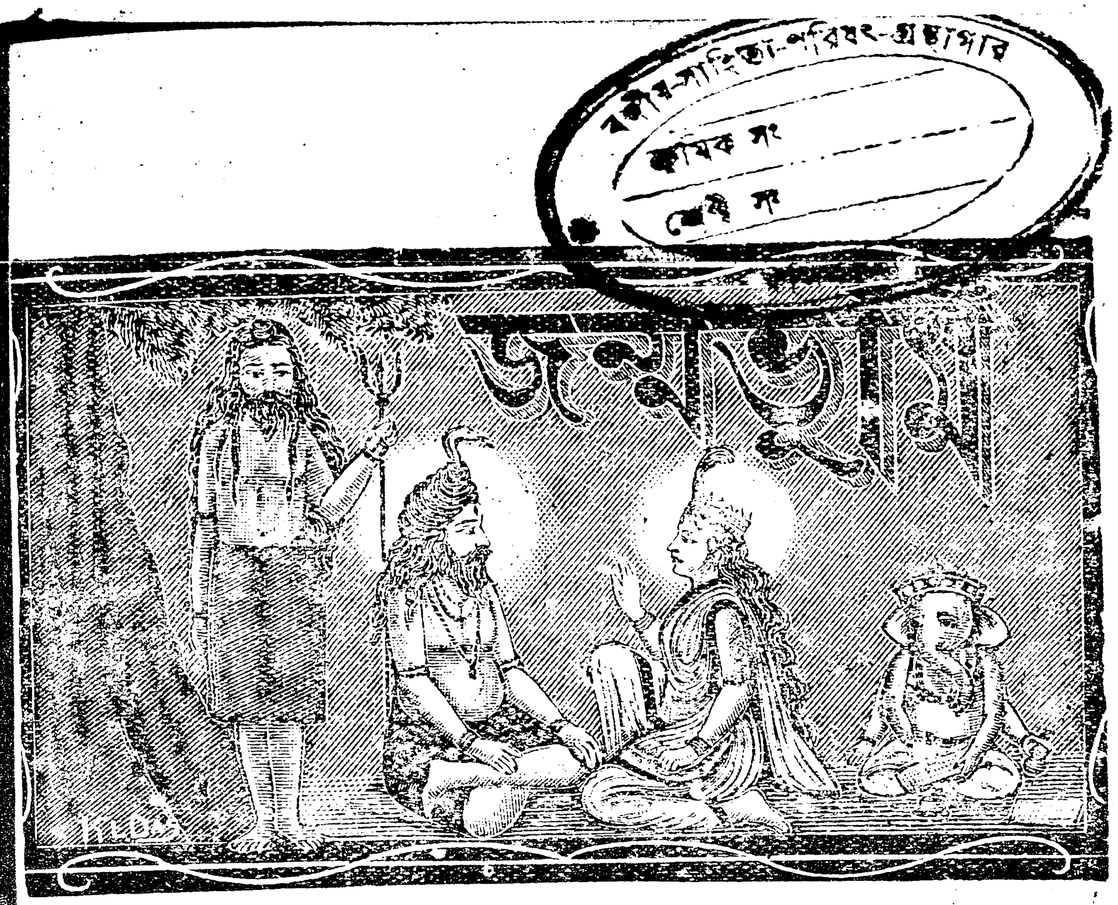

মন্ত্রেই আবাহন, মন্ত্রেই উদ্বোধন, মন্ত্রেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবার মন্ত্রেই বিসর্জ্জন।

মন্ত্রেই প্রতিমা প্রাণহীন হইল। হউক প্রতিমা প্রাণহীন, সে প্রতিমা ত মায়েরই প্রতিবিম্ব। প্রতিমা প্রাণহীন হইলেও ভক্ত কি শ্রদ্ধাহীন হয়? গর্ভধারিণী জননীর প্রাণহীন দেহেও মাতৃজ্ঞান থাকে না কি? প্রাণহীন মাকেও মা বলিয়া ভাবি না কি? মায়ের প্রাণহীন দেহে সূচি ভেদ হইলেও মনে হয় না কি মাকে কত ব্যথার বাজ বাজিল? শ্মশান সৎকারে প্রাণহীন মাকে মা বলিয়া পরিচয় দিতে কোন মাতৃভক্ত পুত্র কি কুণ্ঠিত হয়?

সর্ব্বভূতময়ী জগদম্বার প্রতিমা প্রাণহীন হইলেও সেই প্রতিমায় মাতৃজ্ঞান থাকিয়া যায়। তাঃ প্রতিমা ভাসানের পূর্ব্বে চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে ভক্তগৃহস্থের শুভগা সধবা কুলললনা মায়ের পুনরাগমনের প্রত্যাশায় মায়ের তুষ্টির জন্য প্রতিমা

বরণ করিয়া মায়ের মুখে মিষ্টান্ন তাম্বুল তুলিয়া দেয়। তাই প্রতিমাকে অঙ্গনের বাহিরে আনিয়া বিসর্জ্জন-যাত্রায় ভক্ত মায়ের মুখ বাটীর দিকে রাখিয়া দেয়, পাছে অন্য দিকে মুখ রাখিলে মা বিমুখ হইয়া আর এমুখে না ফেরে; তাই পথে বিসর্জ্জন-যাত্রায় মায়ের প্রাণহীন প্রতিমা দেখিয়া ভক্তজনসঙ্ঘ ভক্তিনতকন্ধরে উচ্চকণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিয়া দুই হাত তুলিয়া প্রতিমাকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। তাই জগজ্জননী দশভূজা দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিকে জলে ভাসাইয়া দিবার সময় ভক্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে দরবিগলিতধারে ডাকিয়া বলেন,—

"নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং চণ্ডিকা প্রতিমা শুভা।
পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া।
গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

বিসর্জ্জন ত হইল! বিষাদ বা অবসাদ কেন? বিসর্জ্জনেই যে ত্যাগ। ত্যাগেই যে সুখ। 'বিসর্জ্জন' অর্থাৎ ত্যাগ। "সৃজ" বিসর্গে এই অর্থ শব্দশাস্ত্রে নিরূপিত আছে। মাকে যে হৃদয় হইতে লইয়া আসিয়া প্রতিমূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়াছি, আবার সংহার মুদ্রা দ্বারা আনিয়া সেই স্বস্থান হৃদয়ে ত্যাগ করিলাম অর্থাৎ যথাস্থানেই তাহার বিন্যাস করিলাম। হৃদয়ের ধন হৃদয়েই রহিয়া গেল। যতদিন না জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, ততদিন এইরূপেই আবাহন এইরূপেই বিসর্জ্জন চলিবে।

তাই বলি, বিসর্জ্জনে বিষাদ বা অবসাদ কেন? ভূত ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ ভাবনায় চিত্ত-চাঞ্চল্য আনিও না। ভূত ভবিষ্যতের সুখ দুঃখের কথা আজি ভাবিও না। মা গজে আসিয়াছেন, দোলায় গিয়াছেন। মায়ের এ গমনাগমনের ফলে আমাদের কর্ম্মদৃষ্টের নিদর্শন। মায়ের আগমনের পূর্ব্বেই বর্ষার ধারা বহিয়াছে—পরন্তু ভীষণ বন্যায় কত গ্রাম পল্লী ডুবিয়া গিয়াছে, কত নর নারী পশু পক্ষী ভাসিয়া গিয়াছে কত লোক নিরন্ন নিস্ব, নিরাশ্রয়, নির্বাস হইয়াছে,—তাহা দেখিয়া চক্ষু ফাটিয়া শোণিত নিঃসৃত হয়, বুকের হাড় মর্ম্মর করিয়া খসিয়া পড়ে। এ যে আমাদেরই কর্ম্মফল; তবে মায়ের রাজ্যে অমঙ্গলে যে মঙ্গল হয়। কে বলিতে পারে যে মায়ের গজে আগমনফলে এ ধরণী শস্যপূর্ণা না হইবে? "গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।" মা দোলায় গিয়াছেন। দোলায়াং মড়কং তথা। ফলে মড়ক অনিবার্য্য। সেও ত আমাদেরই কর্ম্মফল। প্রলয়েও যে কর্ম্মফলের বীজ রহিয়া যায়। মড়কে অবশ্য অনেকেই মরিবে;

কিন্তু যে বঙ্গ মরণের নিত্য লীলাক্ষেত্র, সে বঙ্গে মরণের বিভীষিকা হিন্দুর চিত্তে চাঞ্চল্য আনিতে পারে কি? যে হিন্দুর কর্ণকুহরে ভগবদ্‌বাণী নিত্য কূহরিত, সে হিন্দু মরণের নামে বিচলিত হইবে কেন? ভগবান ত বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষের মরণ কোথায়। আর মরণ থাকিলেও এই মড়কের মরণ ত আমাদেরই কর্ম্মফল। মাতৃস্মৃতি জাগরণে সুকর্ম্মে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা রাখিলে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই মড়ক মরণের ফলে আর আমাদেরই শুভাদৃষ্টে মঙ্গলময়ী মঙ্গলার রাজ্যে মঙ্গল যে হইবে না, সে কথা কি বলিতে পার?

যাহাই হউক, আজ চিরাচরিত বঙ্গের এ বিজয়ানন্দের দিনে ভূত ভবিষ্যতের সুখ দুঃখের চিন্তায় চিত্ত চঞ্চল না করিয়া কে কোথায় আছ, এস আর প্রাণভরা বিশ্বপ্রেমের আলিঙ্গনে প্রাণের উৎস খুলিয়া দেও। যে মায়ের শত সৌর করোজ্জ্বল নিত্য অনাবিল স্বর্ণমূর্ত্তির প্রতিমা জলে ভাসাইয়া দিলে, সেই মাকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া তাঁহারই ধ্যানে প্রাণমন ডুবাইয়া, এসো আজ আজিকার বিজয়ানন্দে কোটী কণ্ঠে ঐকতানে মা মা বলিয়া—ডাকিয়া সেই মায়েরই চিরশরণাপন্ন হই। নাম লেখ,—নাম বল। আজি মনে কি হয় না মায়ের নামের কি মহিমা,—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা-দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

তবে এসো এসো বিজয়ার শুভসম্ভাষণে প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলি করিয়া বলি—"জয় দুর্গে জয় দুর্গে"। আর মাকে বলি; মা তুমি হৃদয়ের ধন হৃদয়েই থাক।

সফল হউক আবাহন, সফল হউক বিসর্জ্জন।

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

ভীষ্ম, দ্রোণ।

ভীষ্ম। আচার্য্য হে! সত্য এত দিনে পাণ্ডবের—
ধর্ম্ম কর্ম্ম যশের প্রভায় এ ভারত
বংশ মোর হ'ল সমুজ্জ্বল! ধর্ম্মবীর
যুধিষ্ঠির একছত্রেশ্বর ইন্দ্রপ্রস্থ
সিংহাসনে; ভাই চারি দিগ্বিজয়ী জনে জনে
এ ভারতে কেহ তুলনা নাহি অর্জ্জুনে!
শিষ্য তব হেলে ধনুহুলে ধরিল ধরণী,
কুরুকুলে বহিঃশত্রু হ'তে আর ভয়
নাহি গণি!
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যজ্ঞে অধিষ্ঠান,—
রাজক্রতু পিতৃগণের স্বর্গের সেতু—
নির্ব্বিঘ্নে করিলে সমাধান, হে আচার্য্য!
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মা পাণ্ডব প্রধান,—
ইথে মোর মনে পূর্ণ আনন্দ হইল।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। হে আচার্য্য, তাতঃ! বন্দি চরণ দোঁহার—
বুঝি হয় সবাকার আনন্দ বিফল!
পাণ্ডবের রাজসূয়ে অনল জ্বলিল!

* সত্ত্বাধিকারী – শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভীষ্ম। হে বিদুর! কোথা কেবা কি হ'তে কি হ'ল!
শিশুপাল সম কোন নৃপ দুষ্ট জন,
করিল মন্ত্রণা পুনঃ পাণ্ডবে হিংসিতে—
কে চাহে পুড়িতে ভীমার্জ্জুন শরানলে?

বিদুর। দেব!
সাধ্যকার দুর্ব্বার পাণ্ডবে আক্রমিতে—
বাহুবলে? আজি এই ভারত মাঝারে
পাণ্ডব শাসনে শান্তি পূর্ণ চারিধার;
কিন্তু দেব! তব গৃহে অনল জ্বলিল।

ভীষ্ম। কুরুগৃহে! সে কেমন!

দ্রোণ। আশ্চর্য্য কথন তব!

বিদুর। কি আশ্চর্য্য যথা রাজা দুর্য্যোধন,
মন্ত্রি সুবল নন্দন—ভাই দুঃশাসন,
রাধাপুত্র কর্ণ সখা মুখ্য সেনাপতি
যথা, দেব, দুর্ম্মতির কি অভাব তথা!

দ্রোণ। বড় ধৃষ্টতার কথা! পাণ্ডব সংহতি—
কাহার শকতি—বিগ্রহে তরিবে কোন জন?
তোমা আমা জনে দোঁহে সমান বিচারি—
একপক্ষ নারি করিবারে সমর্থন।

ভীষ্ম। মোর যেই যুধিষ্ঠির সেই দুর্য্যোধন,
সেই মত্ত ভূরিশ্রবা বাহ্লিক নৃপতি,
কুন্তিপুত্রে অকারণ কেবা বিরোধিবে?

বিদুর। এ বিবাদে দুর্য্যোধন কারে না চাহিবে।
যুঝিবে একা শকুনি।

দ্রোণ। কিমদ্ভুত শুনি!

ভীষ্ম। ব্রতী একা সুবল নন্দন?

বিদুর। ক্ষতি কিবা। অক্ষ্যসারে যদি অস্ত্রগণ
সহায় হইবে তার পাছে, এ ভারতে
অক্ষাভিজ্ঞ কূট খল যে যথায় আছে,
গেছে দূত সে সবারে আনিবারে।

মোরে আজ্ঞা, পাণ্ডবে করিতে আবাহন,
সত্যপণ ধনরত্ন রাজ্য-সিংহাসন।

ভীষ্ম। হে বিদুর, তুমি কি হেতু যাইবে?
তুমি নহিলে পাণ্ডব মোর কভুনা আসিবে।
কে দিল আজ্ঞা তোমায়?

বিদুর। নিজে অন্ধরাজ!
হায় দেব! জ্যেষ্ঠ আজ্ঞা কেমনে লঙ্ঘিব?
কোন ধর্ম্মে, যুধিষ্ঠিরে কহিব কিরূপে,
মায়াবী শকুনি সনে পশিতে দেবনে।
ধিক্ ধিক্ অধীন জীবনে। ঘোর পাপ,
কুলক্ষয়ে গৃহদ্বন্দ্বে নিমিত্ত হইব,
কোথা যাব? ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ অন্ধ—
সে সম্বন্ধ কি ধর্ম্মে ত্যজিব জানদেব,
আমি মাতৃপণে তার ভৃত্য আজ্ঞাকারী,
কিন্তু অন্ধরাজ আজ্ঞাকারী বটে তব—
আর যত ভারত সম্ভব আছে জ্ঞাতি;
কার শক্তি তব আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন!
যাচি দেব! ভাবী মন্দ কর নিবারণ।

ভীষ্ম। হে বিদুর, যবে ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা দিল,
তুমি তবে কেন নাহি বারিলে তাহারে?

বিদুর! রোগী যেন ঔষধ না চায় মৃত্যুকালে!
কতেক কহিব? কর্ম্মগতি রাজধর্ম্ম—
নীতিমত কত বুঝাইনু; ধনলোভে
কোন কথা নাহি তুলে কাণে, শুধু বলে,
"হে বিদুর! দৈব করে সব!" তুমি আমি
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ তিনে নিকটে থাকিতে,
অন্যায় না হবে কদাচন—হায় দেব!
কালে কি হইল! যেই পাণ্ডু বাহুবলে
পৃথিবী জিনিল; কেনা জানে! সর্ব্বরত্নে—
সেবিল জ্যেষ্ঠেরে—হায়! ভাণ্ডার ভরিল,

আজি কিনা সেই অন্ধরাজ, নাহি লাজ,—
যৌ-গৃহ দাহনে করি হস্তীনা বঞ্চন—
এবে দেখি পাণ্ডুপুত্রে ডাকিবে পাশায়।
যুগ লয় হবে কত দিনে! কোথা ধর্ম্ম!
তুমি দেব কৌরব ঈশ্বর, সবে তব
অনুজ্ঞ তৎপর এবে, সত্বর নিভাও
অগ্নিকণা সময় থাকিতে—সুকৌশলে,
যেই ভীম দাবানলে দহে মহাবন,
অতি ক্ষুদ্র ছিল সেই স্ফুলিঙ্গ প্রথম।

ভীষ্ম। বিদুর! অধীর নাহি হও যেন স্থির!—
প্রজ্ঞা চক্ষু ধৃতরাষ্ট্র নহে ক্ষুদ্রমতি।
সত্য কালগতি কেহ পারেনা রোধিতে।
কহ মোরে এই পাশা করিতে বারণ?
হে সুমতি! সদা কৃষ্ণ পদে রাখ মতি—
সত্য পথ নাহি লঙ্ঘিবনা জীবন থাকিতে!
পিতৃদেব তুষ্ট তরে বিমাতার পদে—
ত্যজি রাজ্য সিংহাসন বৈমাত্রেয় ভোগে,
দারা ত্যাগে মোর স্থির মন; দিল মোরে
দেবগণ ভীষ্ম নাম, তবে, আজীবন
কৌমার বৈরাগ্য অবলম্বন আমার!
পিতা স্বর্গে বৈমাত্রেয় দোঁহে সুকুমার—
মমতা সঞ্চার হইল মনে, তাহে চিন্তা
বংশ রক্ষা হইবে কেমনে? চিত্রাঙ্গদ্
বিচিত্রবীর্য্য সে দোঁহে যতনে পালিনু—
(পুনঃ) ধরি ধনু জিনি রাজ্য কন্যা রত্ন ধন
সমর্পণ করি তাহে হৈল বিড়ম্বনা!
অল্পভোগে অপুত্র গত দুই জনা।
বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকানন্দন,
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু সহোদর সে দোঁহার—
পুত্র দুর্য্যোধন আর যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকারী—

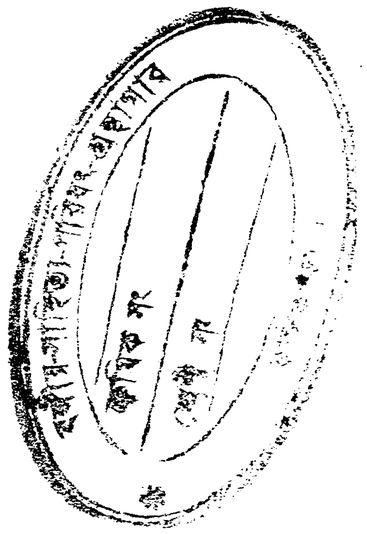

আমি মাত্র প্রজা আজ্ঞাকারী
নহে তারা মম—আজি বদ্ধকুলধর্ম্ম—
ব্রতে, বিপক্ষ হইতে রাখিতে উভয়ে,—
দোঁহা দ্বন্দ্বে একপক্ষে না যাব কখন,—
উদাসীন ভাবে রব এ মোর মনন।

বিদুর। কিন্তু দেব! কুরুবংশ হবে ছারখার!
কেমনে দেখিবে হায় মোর অনুতাপ
রবে পাছে!

ভীষ্ম। হে বিদুর! যাও আর বার—
তবে অন্ধরাজ কাছে, মোর নাম লয়ে
কহ তাঁরে করি ভেদ আশঙ্কা দেবনে!
সত্য পণে অনর্থ উঠিবে; দুই পক্ষ—
ফেলি অক্ষ অস্ত্র করে সমরে নাবিবে,
ভ্রাতা-ভ্রাতারে হানিবে, জ্ঞাতিবন্ধু রক্তে
পৃথিবী ভাসিবে - হবে এ ভারত কুল,
অবশেষে ক্ষয়! কর্ত্তা তিনি সবকার—
জ্যেষ্ঠতাত পাণ্ডবের পিতা কৌরবের,
পুত্রগণ পরস্পর—খেলিবে দেবন,—
হেন প্রবর্ত্তন তা' হ তে উচিৎ নয়,
লোভে মহাপাপ উপচয়—অক্ষক্রীড়া
কভু সত্ত্ব ক্ষত্র ধর্ম্ম নয়; তামসিক,
ক্রূর কর্ম্ম বলি সদা কহে বুধগণ।
কুলের রক্ষণে পিতৃ পিণ্ড প্রয়োজন,
লক্ষ্য মম অক্ষরণ বিবাদের হেতু;
উভয় কল্যাণ মাত্র করি আকিঞ্চন—
ভগবান, তব ইচ্ছা হইবে পূরণ!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

কমলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রথম লহর।

কমলা বড় জমীদারের কন্যা; আদরিণী অভিমানিনী; তাঁহার পিতা হরলাল বাবু কন্যাকে বড়ই ভালবাসেন, হরলাল বাবুর স্নেহ ও ভালবাসা পুত্রদের অপেক্ষা কন্যা—কমলা সুন্দরীর উপর বেশী পরিমাণে বর্ষণ হইয়া থাকে। বড় লোক জমীদার পিতা, তাঁহার এত আদর, তাই কমলা এত আদরিণী গরবিনী, কমলা শত দোষ করিলেও কাহারও একটী কথা বলিবার উপায় নাই, কমলার ভয়ে সংসারে সদাই সকলেই ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত। বহু অনুসন্ধানের পর হরলাল বাবু আজ ৪ বৎসর অতীত হইল, কমলার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে হেমচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। হেমচন্দ্র ধনী, জমিদার পুত্র নহেন, কিন্তু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ভদ্র-সন্তান। বিবাহের পর একবারমাত্র কমলা শ্বশুরালয়ে ১৫ দিনের জন্য গিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে কমলা স্বামী গৃহে যান না। হরলাল বাবুও এই ভাবিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন যে, আমার অপেক্ষা গরীব ঘরে বিবাহ দিলে জামাই বাবাজী আমার কন্যাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতে সাহস করিবেন না। পরে বাবাজীকে আমার বাড়ীতেই অবস্থান করিতে হইবে। কিন্তু মানুষ যাহা মনে স্থির করে, ঈশ্বর তাহার ঠিক বিপরীত কার্য্য করান। হরলাল বাবুরও তাই হইল। যদিও তাঁহার অপেক্ষা গরীব ঘরে বিবাহ দিলেন। কিন্তু জামাতা হেমচন্দ্র শিক্ষিত তেজস্বী গুণবান যুবাপুরুষ। হেমচন্দ্রের সংসারে দাদা আছেন, স্নেহময়ী মাতৃ-স্বরূপিনী বউদিদি আছেন, আদরিণী কুসুমময়ী ভগ্নী আছেন। এরূপ পবিত্র শান্তিময়ী সোণার সংসার ছাড়িয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। হরলালবাবু বহু চেষ্টা করিলেন, কত লোককে দিয়া কত রকম করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র অচল, অটল, হেমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন হরলাল বাবু মনের সাধ মনেই রাখিয়া দিলেন।

কমলা সুন্দরী পিত্রালয়ে সুখশয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত। রাত্রি বোধ হয় তখন ১০ ঘটিকার অধিক হয় নাই। হেমচন্দ্র ধীর পদবিক্ষেপে কমলার শয়ন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক—"কমলা, কমলা," বলিয়া ডাকিয়া কোন প্রকার সাড়া শব্দ না পাইয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নিবিষ্ট

মনে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। আর একবার ডাকিলেন,—'কমলা", তথাপি কমলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না! শেষে হেমচন্দ্র কমলার গা ঠেলিয়া পুনরায় ডাকিলেন। এবার কমলার চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোর একেবারে ভাঙ্গিল না। বিরক্তির সহিত বলিল.—"আঃ। ঠেল্‌ছ কেন? এলে তো শুয়ে থাকো না! কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে আমার দেহ খারাপ হইবে।" হেমচন্দ্র কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, আবার কমলার বিরক্তির কারণ উৎপাদন করিবার বহু চেষ্টায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"কমলা! আমি যে বিষম বিপদে পড়ে আজ এখানে এসেছি, তা কি তুমি শুন নাই। আমার এই বিপদের সময় তোমার কি একটু সহানুভূতি পাইবার আশা করি না। তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, দেবতা সাক্ষী রাখিয়া তোমাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। পূর্ব্বে যাহা করিয়াছ তাহাতে কিছু আসে যায় না, এখন আমার সমূহ বিপদ এ সময় তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা উচিত।"

"হাঁ তাতো শুনেছি! এখন আমাকে কি করিতে আদেশ করেন?"

"এখন তোমার আমাদের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে কি মত?'

"মতামত তো সব বাবার নিকটেই শুনেছ। সে কথা আবার জিজ্ঞাসার জন্য এত রাত্রে ডাকাডাকি করে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবার কি প্রয়োজন ছিল?"

"প্রয়োজন ছিল বলেই তোমাকে বিরক্ত করেছি। তুমি তো জান যে, দাদা, বউদিদি. আমি, তুমি ও সুশীলা. ব্যতীত আমাদের খোজ লইবার এবং একটী কথা বলবার আর কেউ নাই। তবে সুশীলা বোন হলেও সে-তো পরের বউ, তাহার শ্বশুরালয়ে আছে। এখন বউদিদি মৃত্যুশয্যা-শায়িনী, তাঁর কাছে বসে কিম্বা উপযুক্ত সময়ে ঔষধ পথ্যাদি দেয়, এমন একটী লোক সংসারে নাই! এ অবস্থায় তুমি না গেলে কি উপায় হবে, এবং দেশের লোকেই বা কি বল্‌বে!"

"এত রাত্রে ওসব ঘ্যান ঘ্যান আমার ভাল লাগে না, শুতে হয়তো চুপ করে শুয়ে থাকো, কেন বাবা তো বল্লেন,—আমার শরীর অসুস্থ তিনি এখন আমাকে কোথাও পাঠাইতে রাজি নন, সে কথায় বুঝি আর হলো না। আবার আমাকে এত রাত্রিতে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ"। "বাবা তোমাকে বেশী স্নেহ করেন ও ভালবাসেন বলিয়া তোমার অসুস্থ শরীর লইয়া যেতে মানা

করেছেন কিন্তু কমলা তোমার কর্ত্তব্য তো তোমার করা উচিত। তুমি তো আর ছেলে মানুষ নও, সবইতো বুঝিতেছ, এখন আমাদের কি রকম সময়?"

"তোমার বিপদের সময় বলিয়া কি আমাকে তোমাদের বাড়ীতে যাইয়া দাসীবৃত্তি করাই বুঝি আমার কর্ত্তব্য।"

কমলার কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন. প্রাণের ভিতর কেমন হইয়া গেল. চোখ ছলছল করিতে লাগিল। অতি কষ্টে আত্ম সংবরণ করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন—'সেটা কি তোমার বাড়ী নয় কমলা? নিজের বাড়ীতে নিজের পরিজনের কাজ করাটা কি দাসীবৃত্তি হয় কমলা?"

"আর কাজ কি, দাসীবৃত্তি নয়তো কি? এ পর্য্যন্ত আমি পিত্রালয়ে কোনদিন রাঁধি নাই, ঘরে ঝাঁট দেই নাই, কোন কষ্টের কার্য্যই বাবা আমায় করিতে দেন না; আর বিয়ের পর একবার যাইয়াই যে সুখ পাইয়া আসিয়াছি, তাহা আমি কখন ভুলিব না; তোমার গুণের ভাজটী আমাকে দিয়া ৩।৪ দিন রাঁধাইলেন, আবার বলেন, কিনা, "ছোট বউ রান্না শেখা খুবই ভাল", আহা, মরি আর কি, রান্নাটা যেন একটা বড় গুণপনার কাজ। যদি না বাবা আমাকে শীঘ্র করে লইয়া আসিতেন তাহা হইলে আমি তো মারা গেছলুম, ৩।৪ দিন রান্না করিতেই আমার মাথা ধরিতে লাগিল, হাতে সোনার বালা ময়লা হইয়া যেতে লাগ্‌ল, শেষে মূর্চ্ছার ব্যারাম হইয়া মরতুম। আমি মরলে তোমাদের কি? আমার বাপ মায়েরই যাবো; থাক্, অত কথায় কাজ কি, বাবা আমাকে যেতে দিবেন না, আর আমিও যাবো না!"

"আমি যদি তোমাকে রেখে না যাই?"

মানিনী কমলা আর স্থির থাকিতে পারিল না; ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া স্বামীর প্রতি তীব্র কটাক্ষে অহঙ্কারপূর্ণ স্বরে বলিল,—"রেখে যাওয়া না যাওয়াতে তোমার কি অধিকার আছে? ইস্ বড়ই তো ক্ষমতা, ভেসে যাচ্ছিলেন, কেউ তো একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করিত না, বাবা দয়া করে বি'য়ে দিয়া দিলেন, ইহাই তোমার সৌভাগ্য জ্ঞান করা উচিত! তাতে কোথায় কৃতজ্ঞ হইয়া থাক্‌বে?—না বাবার উপর কর্ত্তৃত্ব করতে চাচ্ছেন? ওরূপ জোরের কথা বল্‌তে হয়তো একটা দাসী বাঁদীর মেয়ে বিয়ে করে নিও; তার দ্বারা যা ইচ্ছে করাতেও পারবে, ও সব আমার কাছে চল্‌বে না।"

পিতৃধন গর্ব্বিতা স্ত্রীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র তো অবাক হইয়া গেলেন, মুখে একটী কথাও সরিল না, নীরবে চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে

লাগিল। উভয়েই কিছুকাল নীরব রহিয়া তারপর কমলা ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিল,—"প্যান প্যান করতে হয়তো বাহিরের ঘরে বসে কর গিয়ে! আমাকে ঘুমাতে দাও", এই বলিয়া কমলা হেমচন্দ্রের দিকে পিছু ফিরাইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইল। হেমচন্দ্র স্বীয় অদৃষ্টকে শত সহস্রবার ধিক্কার দিতে দিতে মর্ম্মান্তিক যাতনায় নীরব নিশীথে বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে ঘরের বাহির হইয়া বরাবর রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া প্রাতের ট্রেনে চড়িয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ী পঁহুছিলেন।

দ্বিতীয় লহর।

হেমচন্দ্র বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার বউদিদির অবস্থা অতীব শোচনীয়, তিনি অচৈতন্য অবস্থায় শয্যাশায়িতা! মস্তক পার্শ্বে তাঁহার দাদা রমেশচন্দ্র বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছেন। হেমচন্দ্র "বউদিদি, বউদিদি" বলিয়া ২।৪ বার ডাকিলেন। বউদিদির কাণে বোধ করি সে শব্দ প্রবেশ করিল। অতি কষ্টে চোখ চাহিয়া কিছুকাল হেমচন্দ্রের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পরে অতি কষ্টে, অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "ছোট বউ কি এসেছে?"

হেমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ অতি সতর্কের সহিত চোখ মুছিয়া বলিলেন, "না, বউদিদি।"

রমেশচন্দ্র ছোট ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণে বড়ই বেদনা পাইয়া পুনরায় স্ত্রীর মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

দুই ভাইয়ের প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা সত্বেও রোগিণীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে লাগিল। বৈকাল হইতে বিকার দেখা দিল। সন্ধ্যার পর হেমচন্দ্র গ্রাম্য কবিরাজ লইয়া আসিলেন, তিনি অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। শেষ অবস্থায় প্রয়োগোপযোগী ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রমেশচন্দ্রের বড় আদরের ধন, হেমচন্দ্রের বড় ভালবাসার, বড় স্নেহের, বড় সোহাগের, বউদিদি তাঁহাদের মায়া কাটাইয়া সুখের সংসার সমুদ্র সাঁতার কাটিয়া পার হইয়া চলিয়া গেলেন। রমেশচন্দ্রের হৃদয় প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল?

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দিন আসে আর যায়, কাহারও সুখে যায়, আবার কাহারও বা দুঃখে যায়। দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্রের আদরের বউদিদি আজ পক্ষ কাল সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এতদিন

দুই ভাইয়ে সংসার সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা হয় না। আজ রমেশচন্দ্র ছোট ভাইকে বলিলেন, "এখন তো বউমাকে না আনিলে সংসার চল্‌বে কি করে? সংসারে এমন একটী লোক নাই যে, এক গ্লাস জল দেয়, পরের উপর নির্ভর করিয়া আর কতদিন চলিবে?" হেমচন্দ্র এতাবৎ শ্বশুরবাড়ীর ঘটনা এবং কমলার মর্ম্মান্তিক ব্যবহার কাহারও নিকট বলিবার সুবিধা পান নাই! এখন আর হেমচন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন নাই; এতদিন যে যাতনা নীরবে প্রাণের ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ দাদার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপে শ্বশুর ও স্ত্রীর ব্যবহার সম্ভবমত দাদার নিকট বলিলেন, "দাদা, আপনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছেন! বড়লোকের মেয়ের দ্বারা আমাদের মত সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকের সংসার চলিবার আশা করাই বিড়ম্বনা মাত্র। আমি এম-এ, পাশ করিয়াছি বলিয়া আমাদের স্বীয় অবস্থার দিকে না তাকাইয়া বড় ঘরে যখন সম্বন্ধ করেছেন, তখনই আপনি মহা ভ্রমে পতিত হয়েছেন! এখন যে তাহার দ্বারা আমাদের সংসার রক্ষা হইবে, সে আশা আর করিবেন না। অতএব সে আশা ত্যাগ করিয়া সুশীলাকে আনাই আমার মত। সমস্ত কথাই আপনাকে বলিলাম, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন।"

রমেশচন্দ্র আর অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া অগত্যা সুশীলাকে আনাই যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া ২।৩ দিনের মধ্যেই সুশীলাকে তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া লইলেন। আবার রমেশচন্দ্রের সংসারে শ্রী ফিরিল। সুশীলা শীঘ্রই দাদাদের সংসারটী বেশ করিয়া গুছাইয়া লইলেন। হেমচন্দ্র ছোট বোনের নিকট ছোট বউয়ের ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমার জীবন থাকিতে আমি তাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না, ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন তো ইহার প্রতিশোধ লইব।" সুশীলা নিঃশব্দে দাদার কথাগুলি শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। একদিন সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাঁহার বড় দাদার নিকট ছোট বধুর ব্যবহারের বিষয় বিস্তারিত জানাইয়া বলিলেন, "হিন্দুর ঘরের মেয়ের এরূপ ব্যবহার কখন তো শুনি না; স্ত্রীর স্বামীই দেবতা, স্বামীই সর্ব্বস্ব, সেই স্বামীর সহিত যখন এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তখন সে বউয়ের দ্বারা আপনাদের সংসার চলবে না; দাদা আমার একান্ত অনুরোধ আপনি আবার বিয়ে করুন এবং ছোট দাদারও আবার বিয়ে দেন।"

রমেশচন্দ্র সে সময়ে স্নেহময়ী ভগ্নীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্রের আর বাটীতে বসিয়া থাকা চলে না, তিনি কলিকাতার কোন এক এণ্ট্রেন্স স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন এবং বি, এল পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বউদিদির কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট হইতে ১ মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছিলেন। ছুটীর দিন কাল শেষ হইবে। হেমচন্দ্র সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় রহনা হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। সুশীলাবালার প্ররোচনায় রমেশচন্দ্র ছোট ভাইয়ের পুনরায় বিবাহ দিবার মনস্থ করিলেন। চারিদিক হইতেই পাত্রীর অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু রমেশচন্দ্র নিজে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না!

তৃতীয় লহর।

যেদিন হেমচন্দ্র লাঞ্ছিত অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্বশুরালয় হইতে চলিয়া আসেন, তৎপর দিবস প্রাতে কমলার মাতা তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমলা, ব্যাপারখানা কি? হেমচন্দ্র সবেমাত্র একদিন আসিয়াই কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলে গেল? তুই কি কিছু অন্যায় ব্যবহার করেছিস যে সে অমনভাবে কাহাকে কিছু না বলিয়া রাত্রিতেই চলিয়া গেল? হেম তো আমার সে ছেলে নয়, সে অতি ঠাণ্ডা, নম্র ও বিনয়ী, আহা বাছার কথা শুনিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, সে যতবার আসিয়াছে প্রতিবারই আমাকে প্রণাম করিয়া আমার অনুমতি লইয়া তবে বাড়ী গিয়াছে! এবার এমন ভাবে চলিয়া যাইবার কারণ তো কিছু বুঝিলাম না!" কমলা জননীর কথাগুলি শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর দিল না। কেবল বলিল, "জানি না!"

"জানিবে না কেন মা; সব জান, সব বোঝ; আমারও আর কিছু বুঝিতে বাকী নাই! তুমি যে কি মনে করেছ, তাহা তো ভাবিয়া পাই নাই? কর্ত্তার কি একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? ভবিষ্যতে মেয়ের যে কি হবে তাহা ভাবিতেছেন না? আর কমলা তোমাকে বলি; তুমি বড় লোকের মেয়ে ভাবিয়া আপনার কে এবং পরে কি হবে তাহা তো ভাবিলে না! ইহার প্রতিফল একদিন হাড়ে হাড়ে ভুগতে হবে, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব যে

স্ত্রীলোক স্বামীর সুখে ও আদরে বঞ্চিত তাহার জীবনই বৃথা, স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু, সেই স্বামীকে অনাদর করা, কতদূর যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আর বালিকা নও, যাহা তুমি বোঝ তাহা কর।" এই কথা কয়টী বলিয়া কমলার জননী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

জননীর ভৎর্সনাতে কমলার প্রাণের ভিতর যেন কি রকম করিতে লাগিল। সেদিনকার স্বামীর প্রতি ব্যবহারের কথা একে একে মনে উদয় হইয়া প্রাণে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। সেইদিন হইতেই কমলার কোমল হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আবার হেমচন্দ্র আসিলে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিব, ভাল করিরা কথা কহিব তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। মনে মনে কমলা এই সব সংকল্প করিয়া রাখিল। কমলা হেমচন্দ্রের পুনঃ আসার আশায় বুক ধরিয়া দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু হেমচন্দ্রের আসাতো দূরের কথা তাঁহার কোন পত্রাদিও কমলার নিকট আসিল না। লোকমুখে জায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কমলার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন; পিতৃধনে গর্ব্বিতা হইয়া না বুঝিয়া কি কুকাজই করিয়াছি, নিজ বুদ্ধির দোষে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছি; তেমন দেবোপম স্বামীর মনে অকারণে কত কষ্টই না দিয়াছি! হে ভগবান. তোমার এই অবোধ বালিকাকে রক্ষা করুন! তোমার এই অল্পবুদ্ধিসম্পন্না কন্যাকে কি ক্ষমা করিবে না? দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কমলা, স্বামীর এবং শ্বশুরালয়ের কোন সংবাদই না পাওয়ায় মন বড়ই উতলা হইতে লাগিল!

হেমচন্দ্রের বিবাহ দিবার জন্য রমেশচন্দ্র প্রাণপণ চেষ্টায় পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুশীলাবালা এখন দাদাদের সংসারের গিন্নি. তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের সংসারের কোন অভাব নাই। রমেশচন্দ্র পাত্রী ঠিক করিলেন, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে, ইহাই স্থির হইয়া গেল। সংসারের কোন কথাই গোপন থাকে না। হেমচন্দ্রের বিবাহের কথাও তাঁহার শ্বশুরালয়ে গোপন রহিল না। একথা কমলার গোপন রহিল না। একথা কমলারও শুনিতে বাকী রহিল না। এতদিনের পর কমলা তাঁহার স্বামীর সংবাদ ও স্বামীর সংসারের সংবাদ পাইলেন। কিন্তু সে সংবাদ পাইয়া তাহার মন যেন কিরূপ হইয়া গেল, চোখের জল আর রাখিতে পারিলেন না। "আমার দেহ ভাল নয়, আজ আমি কিছু খাইব না" বলিয়া নিজ শয়ন কক্ষে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

সে রাত্রি তাহার আর নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই কমলা দুইখানি পত্র লিখিতে বসিলেন ; একখানি তাঁহার স্বামীর নিকট, অপরখানি সুশীলা-বালার নিকট। দুইখানি পত্র লিখিতে লিখিতে চোখের জলে কাগজ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। অতি কষ্টে লেখা শেষ করিয়া ঠিকানা লিখিতে যাইবার কালীন তাঁহার স্বামীর ঠিকানা না জানায় বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। অবশেষে নানা-রূপ চিন্তা করিয়া সুশীলাবালার পত্রের ভিতর স্বামীর পত্রখানি দেওয়াই স্থির করিলেন। কমলা স্বামীর পত্রখানি ভালরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাহাতে কি লেখা হইল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। আর বিরহ বিধুরা স্ত্রীর লিখিত স্বামীর পত্র অন্যেরও পড়িবার অধিকার নাই, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। তবে সুশীলাবালার পত্রখানি এই ;—

কল্যানীয়াষু,—

ঠাকুরঝি, এই হতভাগিনীকে কি চিনিতে পারিবেন? মনে করিয়া-ছিলাম, আর এ জীবনে তোমার নিকট এবং তোমার ছোট দাদার নিকট এ পোড়া মুখ দেখাইব না! আমার অদৃষ্টদোষে, অল্প বুদ্ধির জন্য পিতৃধনে গর্ব্বিতা হইয়া আমি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছি ; আজ আমি আমার সোনার সংসারে পর হইয়াছি। দিদি, এতদিনে আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, মনের দুঃখ আর হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। লোকে বলে, কষ্টের কথা, প্রাণের দুঃখের কথা প্রাণের কথা অপরের নিকট বলিলে অনেকটা কষ্টের ও দুঃখের লাঘব হয়, তাই আজ তোমার নিকট এই হতভাগিনীর দুঃখ কাহিনী কয়েকটী লিখিতেছি। অপরাধিনী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না! দয়া করিয়া পাঠ করিবেন, ঠাকুরঝি! আমার মত মন্দভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই, আমি পরধনে গর্ব্বিতা হইয়া সুখ দুঃখ কিছু চিন্তা না করিয়া আমি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা আমার এ জীবনে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যতদিন বাঁচিব ততদিন তুষানলের চিতা হৃদয়ের ভিতর জ্বলিবে। তুমি হয়তো শুনিয়া থাকিবে—হয়তো কেন?—নিশ্চয়ই শুনিয়াছ এবং মনে মনে আমাকে কত ঘৃণা করিয়াছ—তোমার ছোট দাদা, দিদির অসুখের সময় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন—আমি হতভাগিনী, আপনার পর কিছু না বুঝিয়া আমি তাঁহার সহিত সেই দেবোপম স্বামীর প্রতি যেরূপ অন্যায় অপ্রীতিকর ব্যবহার করিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব না। হৃদয়ে কি যে দুর্ব্বহ যাতনা বহন করিতেছি ; তাহা একমাত্র ভগবানই জানিতেছেন। হায়! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হয় না

দিদি! সে ত্রুটীর সংশোধন কি হয় না, বোন যদি হয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া এ হতভাগিনীকে লিখিবে। আমি তুচ্ছ প্রাণ দিয়াও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমি আর দুর্ব্বহ যাতনা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেছি না। এ অভাগিনী আপনার দাদার সংসারে স্থান পাইবার উপযুক্ত কি না লিখিবে। আর একটী কাতর প্রার্থনা আমি তোমার ছোট দাদার ঠিকানা না জানায় তাঁহাকে স্বতন্ত্র পত্র দিতে পারিলাম না। তাঁহার পত্রখানিও ইহার সহিত দিলাম, দয়া করিয়া তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে। যেন তাঁহার শ্রীচরণে পৌঁছে। ইতি—

আপনার হতভাগিনী—

বউদিদি—"কমলা"।

যথাসময়ে পত্রখানি সুশীলাদেবীর হস্তগত হইল। তিনি পত্রখানি ভাল-রূপে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। সুশীলা সুন্দরী বুঝিলেন, এতদিনে ছোট বৌদির অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ আসিয়াছে, এতদিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

যেদিন কমলার পত্র ২ খানি হস্তগত হইল সেইদিনই হেমচন্দ্র কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিলেন। সুশীলা দাদাকে কমলার পত্র দুইখানি দিলেন। হেমচন্দ্রও পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া কেবলমাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কমলার পত্র পাঠ করিয়া সুশীলাদেবীর মন গলিয়া গিয়াছিল। তিনি কমলার প্রতি ঘৃণা রাগ সই ভুলিয়া গেলেন।

কি করিয়া, দাদাদিগকে বুঝাইয়া ছোট বৌদিদিকে এ বাটীতে লইয়া আসেন, আবার কি উপায়ে ছোট বৌদিদিকে দাদাদের সংসারে রাখিয়া ঘরের গিন্নি করিয়া আনি, ইহাই তাঁহার মনে সততই উদয় হইতে লাগিল।

দাদাদিগকে কি করিয়া বলি, লজ্জায় ও ভয়ে বলি বলি করিয়া সুশীলা দাদাদের নিকট কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া সুশীলাদেবী ছোট দাদার নিকট ছোট বউদিদির পক্ষ লইয়া নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলেন, শেষে বউদিদিকে শীঘ্র আনিয়া আবার সংসার করুন, ইহাও বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র ছোট ভগ্নির কোন কথারই উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া কত কথা শুনিতে লাগিলেন, শেষে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ লহর।

হেমচন্দ্রের আগ্রহে ও যত্নে শীঘ্রই রমেশচন্দ্রের পুনর্ব্বার বিবাহ হইয়া গেল। হেমচন্দ্র দাদাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া উপস্থিত তাঁহার বিবাহ স্থগিত রাখিলেন। হেমচন্দ্রও কোনমতে বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। রমেশচন্দ্রও অগত্যা ছোট ভাইয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সুশীলাদেবীর কর্ত্তৃত্বাধীনে কনেবউ আসিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। গোলমালে সুশীলাদেবী ছোটবউদিদিকে পত্রের উত্তর দিতে সময় পান না। এইবার পত্রের দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া পত্রখানি লিখিতে বসিলেন—

শ্রীচরণেষু —

বউদিদি! আপনার পত্র পাইয়াছি, নানারূপে কার্য্যের ব্যস্ততার জন্য আপনার পত্রের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল, কিছু মনে করিবেন না। গত রবিবার দিন বড় দাদার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আপনার জন্য ছোট দাদার নিকট নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছি, কিন্তু এখনও তাঁর কোন উত্তর পাই নাই। বড় দাদাতো ছোটদাদার বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সবই প্রস্তুত আছে। এমন কি আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত শেষ, কিন্তু ছোট দাদা কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইতেছেন না। আমার বিবেচনায় এখন আপনার অদৃষ্টে এইটুকুই ভাল। আপনার জন্য আমি সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছি - এবং করিব; কার্য্যফল ভগবানের হাত। ইতি—

আপনার ঠাকুরঝি—
সুশীলা।

যথাসময়ে পত্রখানি কমলা দেবীর হস্তগত হইল, পত্র পাঠ করিয়া চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার এরূপ অন্যায় ব্যবহারে ও তাঁহার স্বামীর ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার প্রতি হেমচন্দ্রের এখনও ভালবাসা আছে, তাই তিনি এত চেষ্টা অনুরোধসত্ত্বেও বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। তিনি দেবতা, আমার মত পাতকীকে তিনি এখনও ভুলিতে পারিলেন না। এই কথা কমলার যতবার মনে হইতে লাগিল, ততই হেমচন্দ্রের ভালবাসা, দয়া ও তাঁহার প্রতি করুণার কথা ভাবিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। সমস্ত রাত্রিই কাঁদিয়াই কাটাইলেন।

দেখিতে দেখিতে রমেশচন্দ্রের বিবাহ ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। হেমচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরীক্ষার শেষ দিনে হেমচন্দ্রের

বাসায় আসিয়া জ্বরাক্রান্ত হইলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর হইয়াছে ভাবিয়া কোন প্রতিকার করিলেন না। ক্রমশঃ জ্বর প্রবল আকার ধারণ করিল, ৫।৬ দিন জ্বরের বিরাম নাই, মেশে দেখিবার লোক নাই, বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে দেখিয়া হেমচন্দ্র সেই অবস্থাতেই দেশে যাওয়াই স্থির করিলেন। তারপর প্রাতের ট্রেনে হেমচন্দ্র দেশে রহনা হইলেন, ট্রেনে ও রাস্তায় বিশেষ পরিশ্রম হওয়ায় হেমচন্দ্রের ব্যারাম বাড়ীতে আসিয়া আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। ক্রমশই জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিছুতেই উপশম নাই। রমেশচন্দ্র এই দেখিয়া গ্রামস্থ কবিরাজকে লইয়া আসিলেন। গ্রাম্য কবিরাজ ১৫।১৬ দিন ক্রমাগত চিকিৎসা করিয়াও রোগের কোন প্রতিকারই করিতে পারিল না, বরং উত্তরোত্তর নানা উপসর্গ বাড়িতে লাগিল। জ্বরের অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল! সুশীলাদেবী দাদার অসুখের কথা কমলাকে লিখিলেন।

কমলা দেবী যেদিন সুশীলাদেবীর পত্র পাইলেন. সেইদিন রাত্রের ট্রেনেই তাঁহার ভ্রাতা মনোজকুমারকে লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। কমলার মা তাঁহার সহিত একজন দাসী দিতে চাহিলেন, তাহাও তিনি লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। কেবলমাত্র মায়ের নিকট হইতে তাঁহার সমস্ত অলঙ্কারগুলি চাহিয়া লইয়া দেহের যথাস্থানে পরিধান করিয়া লইলেন।

যথাসময়ে কমলা স্বামী গৃহে আসিয়া পৌছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সুশীলাদেবীর নিকট রোগীর সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন, কমলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, গৃহমধ্যে যাঁহারা রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাঁহারা কমলার অবস্থা বুঝিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। হেমচন্দ্র তখন অচৈতন্য অবস্থায় আছেন, সুশীলা নিকটে গিয়া দাদা, দাদা বলিয়া ডাকিলেন। হেমচন্দ্রের আঁখিপল্লব যেন একটু নড়িয়া উঠিল, হেমচন্দ্র চোখ মেলিয়া চাহিলেন। "দাদা বউদিদি আসিয়াছেন।" এই কথা সুশীলাদেবী বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

হেমচন্দ্র ও কমলা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া দরবিগলিতধারে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। কমলার আঁখিদ্বয় যেন অতি করুণভাবে স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জানাইল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিল কি না, ক্ষমা করিল কি না সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অবসন্ন আঁখিযুগল আপনা আপনি নিমীলিত হইয়া আসিল।

কমলা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া গৃহে স্থির হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ত্রস্তে বাহিরে আসিয়া তাঁহার দাদার হস্তে স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে খুলিয়া প্রদান পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "দাদা যদি একদিনের জন্যও এ হতভাগিনীকে ভগিনী বলিয়া স্নেহ করিয়া থাকেন যদি আপনার স্নেহের ভগ্নির প্রাণ বাঁচাইতে চান তবে এই আমার গহণাগুলি লইয়া তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন।" মনোজকুমার ভগ্নীকে আশ্বাস দিয়া গহণার পুঁটুলি হস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রি যত অধিক হইতে লাগিল রোগীর অবস্থাও তত খারাপ হইতে লাগিল নানারূপ প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভয় পাইয়া রমেশচন্দ্র কবিরাজ ডাকিয়া আনিলেন। কবিরাজ মহাশয় বহুক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, শেষ মুখ গম্ভীর করিয়া একটী বড়ি খাওয়াইলেন। কিন্তু ঔষধের কোন ক্রিয়াই দেখা গেল নাই অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয়ের মুখও ক্রমান্বয়ে গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা রাত্রি থাকতে কবিরাজ মহাশয় রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। মনোজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় অবস্থা কিরূপ"। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "আমার তো ভাল বোধ হইতেছে না। বোধ করি প্রাতঃকালের মধ্যেই সব ফুরাইবে"।

মনোজ বাবুর সহিত যখন কবিরাজ মহাশয়ের এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে ঘরের দেয়ালের পার্শ্বেই সুশীলা ও কমলা দুই জনে দাঁড়িয়া সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া কমলাদেবী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সুশীলাদেবী কিন্তু এ বিপদেও ধৈর্য্য হারাইলেন না। তিনি কমলার মস্তক কোলে তুলিয়া মস্তকে ও মুখে জল দিতে লাগলেন, কমলার যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। দুই একটা পাখী গাছের ডালে বসিয়া উষার আগমন জানাইতেছে। আর ভ্রাতৃপ্রাণ রমেশচন্দ্র হেমচন্দ্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদতেছেন! পৃথিবী নীরব, নিস্তব্ধ! রমেশচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল যে, জগত তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! ক্ষণিক পরে তাঁর হৃদয়ের আশা-প্রদীপটুকু চির অন্ধকার। ভীষণ অন্ধকার।

যাহারা রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, রোগীর অন্তিম সময় ভাবিয়া তাঁহারা ঘর হইতে বাহির করিবার যুক্তি করিতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্বাটী হইতে "মনোজ মনোজ" করিয়া ব্যস্তস্বরে কে যেন ডাকিল। মনোজ ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ চারিটী লোকসহ ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আগন্তুকদের মধ্যে দুই জন ভদ্রলোক একজন মনোজের বন্ধু বাল্যসখা, অপর জন বিলাতফের্ত্তা ডাক্তার। অপর ২টী কুলী, দুই মোট বাক্স প্রভৃতি লইয়া ষ্টেশন হইতে আসিয়াছে। মনোজ তাহাদের মজুরী দিয়া কুলীদিগকে বিদায় দিলেন। ডাক্তার বাবু মনোজকুমারের মুখে রোগীর অবস্থার কথা সব শ্রবণ করিয়া রোগীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রোগীর শেষ অবস্থা বটে, এখন ঈশ্বরের একমাত্র হাত তাঁর দয়া ব্যতীত রক্ষা পাইবার আশা নাই। কবিরাজি বড়ির গুনে রোগীর মস্তিষ্ক বড়ই গরম হইয়া গিয়াছে! আপনারা বেশী অস্থির হইবেন না! আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি।" এ আশ্বাসবাণী অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা কমলার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চকিতনেত্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেওয়ালের অন্তরাল হইতে ডাক্তারের দিকে একবার চাহিয়া ঈশ্বরের নিকট ডাক্তারের দীর্ঘজীবন কামনা পূর্ব্বক স্বামীর জীবনের জন্য ভগবদপদে স্বীয় অধ্যয়াত্মা উদ্দেশ্যে ছুটাইয়া দিলেন।

সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসায় হেমচন্দ্রের অবস্থা ক্রমে ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু চারি দিন কাল অবস্থান করিয়া হেমচন্দ্রের অবস্থা উন্নতির দিকে অনেক পরিবর্ত্তন করিলেন। এখন আর কোন ভয়ের কারণ নাই বলিয়া ডাক্তার সাহেব চলিয়া যাইলেন। তাঁহার পারিশ্রমিক, ঔষধ প্রভৃতির খরচায় কমলার অলঙ্কারগুলি সব শেষ হইয়া গেল।

পঞ্চম লহর।

ইহার পরও প্রায় ১ মাস কাল হেমচন্দ্রকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। এই একমাস কাল কমলার শুশ্রূষায় হেমচন্দ্র বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এখন কোনরূপ অসুখ নাই। হেমচন্দ্র একদিন বৈকালে ছাদে বেড়াইতেছিলেন, কমলা যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি কেমন আছ?" হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, কমলা তার পশ্চাতে দাঁড়িয়া আছেন, কমলাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "কমলা কেমন আছি, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? কেন কমলা। আমি কেমন আছি, তুমি কি জাননা, তোমার প্রাণ কি তোমাকে বলিয়া দেয় না যে আমি ভাল আছি কি মন্দ আছি। তোমার মত স্ত্রী ছিল বলিয়াই এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। হায়! তুমি যদি আমার বউ দিদির অসুখের সময় আসিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার বউ দিদিকে বাঁচাইতে পারিতাম। কমলা! কেন তুমি সে সময়ে এলে না।" এই বলিয়া হেমচন্দ্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিলেন। সে নিশ্বাসের প্রতিঘাত কমলা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কমলা কাঁদিয়া স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া দু'টী হাতে পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "দেবতা, আমার ইহকাল ও পরকালের পরম গুরু, আমার সর্ব্বস্ব, তোমার দাসীকে ক্ষমা কর, সে কথা ভুলে যাও, মনে কর তোমার সে কমলার মৃত্যু হয়েছে। সে সব কথা মন হ'তে মুছিয়া ফেল আমাকে আবার তোমার দাসী বলিয়া গ্রহণ কর, তোমার মনের মত ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লও; তোমার শ্রীচরণে স্থান পাইবার উপযুক্ত করিয়া লও। তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি তাহার জন্য সেই পাপের প্রায়শ্চির জন্য আমার এ তুচ্ছ জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি। অজ্ঞানে অশিক্ষিতা স্ত্রী যে অপরাধ করিয়াছে, তোমার ন্যায় দেবোপম স্বামীর নিকট হইতে তাহা ক্ষমা পাইতে পারে না ?"

"কমলা পারে, শত সহস্রবার পারে" বলিয়া হেমচন্দ্র কমলার হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। সেই দিন হইতে কমলার হৃদয়ের যাতনা অনেক লাঘব হইল; স্বামী আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন, স্বামী আমাকে দাসী বলিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া কমলা আনন্দে কঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর হেমচন্দ্রের পদধূলী লইয়া বলিতে লাগিলেন, "যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত দেবোপম স্বামী পাই।"

পীড়ার পর হইতে হেমচন্দ্রের খুব প্রত্যুষেই ক্ষুধার উদ্রেক হইত। কমলা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহার জন্য রন্ধন করিতেন। এবার কমলা শ্বশুরালয়ে আসিয়া কাহাকেও একটী কাজও করিতে দেন না, নিজেই সব কাজ করেন। কমলার শুশ্রূষায় ও যত্নে আপ্যায়িতে গৃহের সকলেই সন্তুষ্ট। সুশীলা বালাও নতুন জা কোন কাজ করিতে গেলে, কমলা অমনি কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের হাত হইতে কাজ কাড়িয়া লইতেন, এবং বলিতেন, "ঠাকুরঝি সে ছোট বউদি দ মরিয়াছে, এখন এ ছোট বউ সব কাজ শিখিয়াছে সব কাজই সে একাই পারিবে।"

একদিন প্রাতে কমলার নিদ্রা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল! রন্ধন করিতে বিলম্ব হইলে স্বামীর কোনরূপ অনিয়মে কষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় যেমনি তাড়াতাড়ি ভাত নামাইতে যাইবেন অমনি কমলার হাতে গরম ফ্যান পড়িয়া গিয়া হাতটী অনেকটা পুড়িয়া গিয়াছিল। কমলা উহা অনেক চেষ্টা করিয়াও গোপন রাখিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র ঘরে যাইবামাত্র বলিলেন, 'কমলা ওকি এমন করিয়া হাতটী কি করিয়া পুড়িল।' কমলা অতিশয় লজ্জিত

হইলেন এবং ব্যস্ত সহকারে "ও কিছু নূতন রূপ ধারন করি না, ভয় নাই মরিব না" এই বলিয়া ঘর হইতে পালাইয়া গেলেন। কমলার শুশ্রূষায়, যত্নে হেমচন্দ্র দিন দিন নিরোগ হইলেন এবং বল পাইতে লাগিলেন। কমলা এখন হেমচন্দ্রের গৃহে সাক্ষাত কমলা হইয়াছেন। সকলেরই মুখে কমলার সুখ্যাতি আর ধরে নাই।

শীঘ্রই হেমচন্দ্রের ওকালতি পাশের সংবাদ আসল। রমেশচন্দ্রের সংসারে একটা নূতন উদ্যম নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল। হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাইয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। বেশ পয়সাও উপায় হইতে লাগিল। এখন হেমচন্দ্রের সংসারে কোন কষ্ট নাই। দেশে থাকা নানোরূপ অসুবিধায় উভয় ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় বাস করাই যুক্তসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। রমেশচন্দ্র একটী ভাল দিন দেখিয়া প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই একটী বেশ পরিষ্কার মনের মতন বাড়ী দেখিয়াই চাকর চাকরাণী পাচক ঠাকুরের সব বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। একদিন সকলেই আহারাদি সমাপন করিলেন, কিন্তু কমলাদেবী কিছু খাইলেন না। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে, "কমলা, তোমার কি হয়েছে, তুমি যে কিছু খেলে না।" কমলা একটু অভিমানস্বরে বলিলেন—"যে স্ত্রী স্বামীর স্নেহে, দয়ায় ও ভালবাসায় বঞ্চিত তাহার আর বাঁচিয়া কি প্রয়োজন ?"

"কেন তোমাকে তোমার স্বামী যে ভালবাসে না তাহার প্রমাণ কি" ?

"প্রমাণ যথেষ্ট আছে, একদিন তোমার পায়ে ধরিয়া আমার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলাম তুমিও দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলে। কিন্তু আজ আবার তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছি, যে আজ এখানে চাকর চাকরাণী পাচকঠাকুর রাখিয়া ফেলিলেন।"

হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "তাই ভাল, রক্ষা কর, আর কাজ নাই, একবার ত হাত পোড়াইয়াছ, আবার কি পা দুখানি পোড়াইবে। আবার আমায় অসুখ করিলে কে সেবা শুশ্রূষা করিবে ?"

"সেজন্যে আর তোমাকে ভাবিতে হইবে না, অনেক জুটিবে" বলিয়া কমলা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে পাচকঠাকুর চাকরাণী স্বীয় পুঁটুলী হস্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় তাহারা বলিতে বলিতে গেল, "কোথা থেকে এক ছোট লোকের মেয়ে এসেছে যে একদিনেও বাড়ীতে থাকিতে দিলে না।"

শ্রী শ্রী ভগবদ্গীতা।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন জ্ঞান কর্ম্মাদির ন্যায় সুখও ত্রিবিধ। অভ্যাস বশে যে সুখে আসক্ত হইতে হয়, এবং যে সুখ লাভ হইল দুঃখের অবসান হইয়া থাকে, সেই সুখের প্রভেদ লক্ষণ পরিজ্ঞাত হও। প্রথমে যাহা বিষবৎ, পরিণামে যাহা অমৃতময়, যাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহার নাম সাত্ত্বিক সুখ. বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে প্রথমে যাহা অমৃততুল্য, পরিশেষে হলাহল সদৃশ. সেই সুখকে রাজস সুখ বলে ; এবং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা হইতে যাহা উৎপত্তি, প্রথমে ও পরিণামে উভয় কালেই যাহা আত্মার মোহ উৎপাদন করে তাহাই সুখ। পৃথিবীতে এবং স্বর্গে এই গুণত্রয় চিরহিত প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতি প্রসূত এই ত্রিবিধ গুণ ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণের কার্য্য বিভাগ নির্ণিত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জিত, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি কার্য্য ব্রাহ্মণের গুণ সন্নিবিষ্ট ; শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা সমরে অটলতা দান, ঈশ্বর নিষ্ঠা, এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ; কৃষি বাণিজ্য গো রক্ষণ এই তিনটি বৈশ্যের কার্য্য ; পূজরাক্ত ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের কার্য্য। চারি বর্ণের লোকেরা স্ব স্ব বর্ণ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য পালন করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ মনুষ্যগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে রত থাকিয়া কিরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা বিশেষ করিয়া বল।

কৃষ্ণ। যিনি বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারা লোক হৃদয়ে প্রবৃত্তির সঞ্চার হইতেছে. চাতুর্ব্বর্ণের মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের তৃপ্তিসাধন করিলে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম পালন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ; পূর্ণাঙ্গ পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ; কেন না, পরধর্ম্ম অতীব ভয়ঙ্কর।

স্ব স্ব বর্ণের বিহিত কর্ম্ম বিশুদ্ধচিত্তে অনুষ্ঠান করিলে সংসারে দুঃখভোগ করিতে হয় না। ধূম দ্বারা যেমন অনল আবৃত থাকে, সংসারের সমস্ত কার্য্যই তদ্রূপ দোষাবৃত ; অতএব বর্ণ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে দোষস্পৃষ্ঠ হইলেও পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। আসক্তি বর্জ্জিত, স্পৃহাশূন্য, জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা সন্ন্যাস ব্রতাচরণে সর্ব্ব কর্ম্মে নিবৃত্তি লাভ করিয়া সত্ত্বগুণে চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হন। সিদ্ধিকামী পুরুষ বিশুদ্ধ বুদ্ধি সংযোগে ধৈর্য্যসহকারে পরমাত্মার আরাধনা করিবেন, বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ দ্বেষাদি পরিবর্জ্জন করিবেন, সংযত-চিত্তে কায়মনবাক্যে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন, যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক লঘু আহার করিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন, অহঙ্কার, দর্প, বল, কাম, ক্রোধ মমতা ও পরিগ্রহ পরিবর্জ্জন করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবেন, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মপদ আশ্রয় পাইবার অধিকার জন্মিবে। ব্রহ্মপদে আশ্রয় পাইলে তাদৃশ নিষ্কাম সিদ্ধ-যোগীকে শোকে লোভে ও মোহে অভিভূত হইতে হয় না, সর্ব্বক্ষণ প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করেন, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি তিনি সমদর্শী হন, পরমাত্মার প্রতিও তাঁহার অবিচলা ভক্তি জন্মে। ভক্তি প্রভাবে তাদৃশ পুরুষ সম্যক রূপে আত্মার স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিত্ব অবগত হইয়া পরিণামে আত্মাতেই বিলীন হন। হে অর্জ্জুন ! আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক তুমি সৎপরায়ণ হও, তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। এক্ষণে তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ না. প্রকৃতি তোমাকে যথাসময়ে অবশ্যই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবেন। সূত্রধর যেমন দারুযন্ত্রে ইচ্ছামত কাষ্ঠ খণ্ডাদি ঘুরায়, ঈশ্বরের ইচ্ছাচক্রে সেইরূপে জগতের সমস্ত ভূত নিয়তই ঘূর্ণিত হইতেছে। তুমি সেই সর্ব্বময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জাতীয় সৌর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে এবং ঈশ্বরের অনুকম্পায় পরিশেষে শাশত লোকে স্থানপ্রাপ্ত হইবে। হে পার্থ ! আমি তোমার নিকটে এই নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, ইহার ফলাফল আলোচনা করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠানে তোমার অভিরুচি হয় তাহাই কর। তুমি আমার পরম প্রিয়, সেই কারণে আমি এই গূঢ়তত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ; আমার

প্রতি যাহারা ভক্তি হীন এবং অসূয়াবশে আমার নামে যাহারা বিদ্বেষ প্রদর্থন করে এই অতি গূহ্য পরম তত্ত্ব কদাচ তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিও না; ভক্তিমান সাধুপুরুষেরাই এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার অধিকারী। তুমি আমার ভক্ত ও সখা অতএব তোমাকে এই মূল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। ইহা অবগত হইয়া তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ বিদূরিত হইল কি না? বৃথা শোকে অভিভূত হইবার আশঙ্কা দূর হইল কিনা?

অর্জ্জুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! ইত্যগ্রে মোহবশে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার দূর হওয়াতে আমি সেই নষ্ট স্মৃতি এক্ষণে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় বিভঞ্জন হইয়াছে; তুমি আমাকে যেরূপ সদ্ উপদেশ প্রদান করলে, অতঃপর আমি অকপটে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিব।

অর্জ্জুনের এইরূপ অঙ্গিকার শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ব্যাসদেবের অনুকম্পায় আমি কৃষ্ণার্জ্জুনের এই লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। যোগেশ্বর কৃষ্ণ এই সমস্ত যোগতত্ত্ব ব্যক্ত করিবার অগ্রে অর্জ্জুনকে যে বিরাট রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক রূপ স্মরণ করিয়া আমি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে কৌরবনাথ! এক্ষণে আমার নিশ্চয় প্রতিভা জন্মিতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব, সেই পক্ষেই জয়শ্রী প্রসন্ন হইবেন, নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় লাভ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদ্‌কম্প হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে আমি যেন মনশ্চক্ষে নানা দুর্নিমিত্য দর্শন করিয়াছি, বুঝিলাম দুর্য্যোধনের দুর্ম্মতি হইতেই আমাদের কুলক্ষয়কর এই মহানর্থ সংঘটিত হইল; বুঝিলাম, দৈবই সর্ব্বত্র বলবান; শুভ কামনার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, প্রতিকারের আর উপায় নাই, এক্ষণে বৃথা অনুতাপ ও বৃথা চিন্তা নিতান্তই বিফল।

ইতি শ্রীভাগবতগীতা।

মহাপুরুষের দক্ষিণেশ্বরে গমন।

বিগত ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বৈকালে এক মহাপুরুষ ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া দক্ষিণেশ্বর গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সবলে পরমানন্দে ভগবৎকীর্ত্তন ও আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ পঞ্চবটীতে আসন করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ও তৎপরে মায়ের মন্দিরের সম্মুখে অনাবৃত স্থানে প্রাণ ভরিয়া নিম্নলিখিত স্তোত্র ও সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন।

বহুদিন যাবৎ এরূপ অনুপম আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ বা অবসর আমাদের মধ্যে কেহ পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না! সর্ব্বসমেত ৪০ জন ভক্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। সুদিনে শুভক্ষণে এরূপ বাঞ্ছনীয় সম্মিলন জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। মাতা জগদ্ধাত্রীর কৃপায় ও মাতা ভবতারিনীর আশীর্ব্বাদে এই স্মরণীয় আশাতীত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সকলে প্রাণে বিমল পবিত্র আনন্দ উপলব্ধি করিয়া জীবন জনম সফল করিয়াছিলেন। এ অভাবনীয় আনন্দোচ্ছাস কিছুদিনের জন্য সকলের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকিবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই! আজকালকার দিনে নানা উৎসবে ও বাগানপাটীতে অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাতে শান্তির পরিবর্ত্তে প্রায়ই অশান্তি লাভ করিয়া অনেকেই ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। সেইজন্য বলিতেছিলাম এরূপ আদর্শ ধর্ম্মসম্মিলনী যতই হইবে ততই দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল সংসাধিত হইবে। আমার এত দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে বলিতে বাধ্য যে, বিনা আড়ম্বরে বিনা অর্থব্যয়ে এরূপ পবিত্র সম্মিলনী হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

আজকালকার দিনে গুরুগিরি ও ধর্ম্মপ্রচার অনেকটা অভিনব উপায়ের পন্থা ভাবিয়া অনেকে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। কেহ নামের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, কেহ অন্য কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া আখড়া বা মঠ সংস্থাপিত করিয়া শিষ্যবর্গের মাথায় হাত বুলাইয়া গাড়ী, জুড়ি, বাড়ী, মোটর প্রভৃতি সংস্থান করিয়া স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা দেখিতে ও শুনিতে ভাল কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে সকলই অসার ও অশান্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আমাদের

এই হুজুকপ্রিয় দেশে একটা কিছু নূতন হইলে দলে দলে লোক যোগদান করিবে ও ক্রমে ক্রমে দল পুষ্টি লাভ করিলে শিষ্য শিষ্যার অভাব থাকে না। অনেক স্থলে শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে দালালে নিযুক্ত করা হয়, শিষ্য বা শিষ্যা শ্রেণীভুক্ত হইতে ন্যূনকল্পে দশ টাকা বা উচ্চকল্পে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে অনেকে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এরূপ ব্যাপার বহু স্থানে ঘটিয়া থাকে। আবার যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করিবার আশায় কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় বা যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহারা প্রায়ই অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসে। দেশের এই তো অবস্থা। এখানে ধর্ম্ম একপ্রকার কেনাবেচা ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। নির্ম্মল পবিত্র আনন্দ উপভোগ করা এক জিনিষ আর অর্থের বিনিময়ে গুরুর নিকট খাতির যত্ন আদর অভ্যর্থনা পাওয়া অন্য জিনিষ। যেরূপ দেশ কাল পাত্র পড়িয়াছে তাহাতে খাঁটী বিশুদ্ধ জিনিষ একপ্রকার দুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি খাদ্য সম্বন্ধে, কি ব্যবহার সম্বন্ধে সর্ব্বত্র এই বিসদৃশ ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা ভাবেন বা বুঝেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা বা আন্দোলন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। যখন সময় হইবে এবং যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে সে বিষয় আপনি ঘটিবে, সেজন্য মাথা ঘামাইবার বা আয়োজন উদ্যোগের প্রয়াস বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় মস্তিষ্কের কতকটা বিকৃতভাব উপস্থিত হওয়ায় এক শ্রেণীর লোক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ সকল কথা বেশী আলোচনা বা আন্দোলন না করাই উচিত। ইহাতে লাভ কিছুই নাই বরং লোকসান ষোল আনা।

এখন দেখা যাউক প্রকৃত গুরুর কার্য্য কি! যিনি গুরুদেব ভগবানের অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, সেই গুরু কি প্রকৃতই অর্থপ্রয়াসী? না তাহা কখনই নহে। গুরুদেব নিষ্কাম, নির্লোভ, নিরহঙ্কার একমাত্র জগতের লোক সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণ দিয়া উপকার করিয়া থাকেন। তাঁহার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি নির্জ্জন নিবিড় কাননে অবস্থান করিলেও তাঁহার আহারের চিন্তা করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নাই। স্তিমিতলোচনে তিনি পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন অহরহ তিনি আনন্দ সুধা পান করিয়া বিভোর হইয়া থাকেন। এইরূপ লোক যদি কেহ পাইয়া থাকেন তিনি,

জীবনে ধন্যবান পুরুষ। এরূপ গুরুলাভ সচরাচর ঘটিয়া উঠে না বটে কিন্তু একেবারে মিলে না একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মনের একাগ্রতা, আগ্রহ ও যত্নের উপর এরূপ গুরুলাভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানুষ সর্ব্বদাই কষ্ট সহ্য করিতে না হয় এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যেখানে ক্লেশ ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে উপায়ান্তর নাই সেখান হইতে দূরে পলায়ন করে। তাই প্রকৃত সাধুগুরু সহজপ্রাপ্য নহে আজকালকার দিনে প্রকৃত গুরু পাওয়া বা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সময় হইলে সদ্‌গুরু স্বয়ং আসিয়া দীক্ষা দেন একথা যেমন সত্য, আবার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও যত্ন না থাকিলে কোনকালে গুরু মিলে না একথাও তেমনি সত্য! এখন কথা হইতেছে তবে মানুষ কিপ্রকারে ভাল লোক নির্ণয় করিবে? ইহার একমাত্র উত্তর সাধুসঙ্গ করা। সাধুর নিকট গমন তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, তাঁহার কার্য্যকলাপ অনুশীলন পূর্ব্বক নিজ মনকে কৈফিয়ৎ প্রদান করণ, তারপর মনের দৃঢ়তার সহিত অচল অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক গুরুকরণ। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে বোধ হয় কতকটা প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর।

মানুষ নিতান্তই দুর্ব্বলচিত্ত তাহার উপর চতুর্দ্দিকের বিঘ্নরাশি ও প্রলোভন করালবদন বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছে। এ সংসারে ইহাই বেশী। যতক্ষণ "আমি কে" "আমি কি" "আমি কেন" এই প্রশ্ন মানসপটে উদিত না হইবে ততক্ষণ কিছুই হইবে না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু না হইলে, আমাকে জানিবার বা দেখিবার প্রয়াস না জন্মিলে, কিছুতেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার বাসনা ও লোক নির্ণয়ের ইচ্ছা প্রবল হইবে না। গায়ের জোরে বা টাকার জোরে এখানে কিছুই হইবে না। তাই বলিতেছিলাম সেদিন ভাগ্যক্রমে একজন সদানন্দময় মহাপুরুষকে দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া প্রাণমন বিগলিত হইয়াছিল, জীবন যেন এক নির্ম্মল পবিত্রস্রোতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভাসিয়াছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা আবিলতাপূর্ণ ভাব নিয়ে যেন সে সময়ের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, সে ভাব হৃদয়পটে সম্যকরূপে চিত্রিত রহিয়াছে। যদি আবার কখন এমনি সুযোগ এমনি দিন জীবনে ঘটে তাহা হইলে কৃতকৃতার্থ হইব।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখে সর্ব্বপ্রথমে এই স্তোত্রটী সমস্বরে গীত হইয়াছিল।

নবীন মেঘ সন্নিভং সুনীল কমলচ্ছবিং সুহাস্য রঞ্জিতাধরং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
মুকুন্দনন্দনং প্রফুল্ল পদ্মলোচনং সুবর্ণ চারু অম্বরং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
ময়ূরপুচ্ছ ধারণং বিনোদ চূড়াশোভিতং কদম্ববৃক্ষ হেলনং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

ব্রজেন্দ্রনন্দনন্দনং অসুরা দর্পগারিণং দুকুলপীতোজ্জ্বলং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
কিশোর কৃষ্ণ কেশবং করীন্দ্রমত্তমর্দ্দনং কদম্বদামভূষণং নমামি কষ্ণ সুন্দরং।
রসিক কান্তি শেখরং খগেন্দ্রপৃষ্ঠ আসনং গোকুলগোপ রক্ষণং নমামি কৃষ্ণ সুন্দর
বিচিত্র বংশীধারনং বিনোদবেশরঞ্জিতং নুপূর পদে শোভিতং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
ভবাদিদেব বন্দিতং অনাদিদেব বাঞ্ছিতং বকাসুরাদি নিধনং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
অরিষ্টকেশ নাশনং নৃসিংহবেশ মাধবং নারদাদি সেবিতং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
যশোদানন্দনন্দনং সুরেন্দ্র পাদবন্দনং সুবর্ণ রত্নমণ্ডলং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।
ভবাব্ধিকর্ণধারকং ভবাব্ধি ভয় নাশকং মুমুক্ষু মুক্তিদায়কং নমামি কৃষ্ণ সুন্দরং।

তার পর এই গানটী গীত হইয়াছি।

তোমারি দুয়ারে পাতকী এসেছে আশা করে প্রেমবারি।
প্রেমসুধা দানে হয়োনা কাতর দিও হে চরণতরী॥
সুখের বাঁধন গিয়াছে ছিঁড়িয়া হতাশ হইয়া এসেছি ফিরিয়া।
নাও তুলে নাও অনাথজনে দয়াময় ওহে হরি॥
দীনের পিয়াসা যদি না মিটাবে দয়াময় নাম কেন নিলে তবে।
দীনের বন্ধু কে আর বলিবে দয়াময় পাপহারা॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ!

লেখক— শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

একা।

লেখক শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

সঙ্গী যদি নাহি মিলে, একা পথে চলিব নির্ভয়,
ভাবিয়া অন্তরে মম তুমি আছ সদা দয়াময়!
নিত্য-সাথী তুমি মোর;—অনশ্বর শকতি তোমার
করিবে আমারে রক্ষা শত বিঘ্ন বিপদ মাঝার।
যেথা ঘোর অন্ধকারে পথ-চিহ্ন মুছে গেছে হরি!
সেথানেও র'ব ধীর তোমার চরণ দুটী স্মরি।
করুণা-কিরণ তব বিনাশিয়া অনন্ত আঁধার
দেখাইবে পথ মোরে,—অবসান করিবে শঙ্কার।
কি ভয় আমার আর? ভয়হারী আছে যবে হৃদে;
গাহিয়া ধর্ম্মের গান সত্যে বরি, চলিবে অবাধে।

সবার রাস টানে যে, তাহার রাস টানে কে।

লেখক— শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

মানুষ আপন ছায়ায় দেখে আপন ছবি।
জানেনা যে তার মধ্যে লুকান আছে রবি॥
আপন মনে যাহা ভাবে তাই ভাবে সে ঠিক!
অনেক সময় উল্টে গিয়ে সব হয় বেঠিক॥
যেই যেমন পাত্র তার সেই মত ভাব।
খতাইয়া দেখেনা তায় ক্ষতি কিম্বা লাভ॥
খুঁজিয়া না পায় সেই কি রাস্তা তাহার।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম নাহি দোষ তার॥
ভবের হাটে এসে সবে হয়ে দিশেহারা।
সার ফেলে অসার নিয়ে হয় মাতোয়ারা॥
জানে না এই মানুষেতে আছে মানুষ সেরা।
সেখানেতে গোঁজামিলে চলেনা সই ঢেরা॥
গুরু গুরু কর ভাই গুরু মাথার মণি।
গুরুকে যে চিনে সে চিনে রতন খণি॥
মানব আকারে গুরু আছে বিদ্যমান।
মানব নহেক কভু দেবতা সমান॥
জিবন্ত দেবতা গুরু বিরাজেন ভবে।
হইলে তাঁহার কৃপা সকলি সম্ভবে॥
বোবা কথা কয় যদি পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি।
সে সকল হয় শুধু কৃপায় তাঁহারি॥
এমন দেবতা যদি কেহ পেয়ে থাক।
সামান্য স্বার্থের লাগি কভু ভুলোনাক॥
কখন ভেবনা গুরু আমারি কেবল।
যাঁরে কৃপা করেন তিনি তাহারি সম্বল॥
গুরু নিয়ে দ্বেষাদ্বেষি করা ভাল নয়।
গুরু যে সবারি তিনি মঙ্গল নিলয়॥
হেন গুরু পেয়ে কেহ করোনাকো হেলা!
ভবার্ণবে তরিবারে একমাত্র ভেলা॥
(তাই) সকলের রাস টেনে (তিনি) বসে আছেন একা।
সোজা রাস্তা ধরে চল ভেবো নাকো বাঁকা॥

অর্ঘ্য।

লেখিকা—শ্রীমতি শৈলরাণী বসু, বি, এ।

হৃন্মন্দির-মঞ্চে বিরাজিতা জননী আমার ভারতী!
দীন পূজারিণী আগতা—করিতে তোমার আরতি।
মালঞ্চ-মুকুল ঝ'রে গেছে সব—গিয়েছে সৌরভ,
হীন উপচারে হ'বে মা কি তব আদর গৌরব?
আনত আননে সরম সভয়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
কি জানি যদি মা, ফেলে গো চরণ দেউল মাড়ায়ে!
কোথা পাব বল মন্দারহার, কোথা পাব আমি অর্ঘ্য।
এই নিয়ে দেও জননি আমার, মুক্তি অপবর্গ॥

না জানি তোমার কত না নন্দন হরিচন্দনে
পূজেছে জননি বসা'য়ে পারিজাত-জাত নন্দনে!
কত উপহার কত উপচার যাচিল চরণে,—
সাজাল তোমার অনঙ্গ-অঙ্গ কত আভরণে।
আমি দীন হীনা রাতুল মলিনা যা-আছে আমার
করিব উজাড় রাতুল রক্ত চরণে তোমার।
কোথা পাব বল মন্দার-হার, কোথা পাব আমি অর্ঘ্য।
এই নিয়ে দেও, জননি আমার, মুক্তি—অপবর্গ॥

চাহিনাত আমি, তাঁদের মতন, খ্যাতি প্রতিপত্তি।
দুইখানি পদ দাও যদি মোরে মুছিবে বিপত্তি।
করি মাত আমি প্রণতি তাঁদের—'কীর্ত্তি", চণ্ডীদাস,
মুকুন্দ, "প্রসাদ". ভবভূতি "দেব", কবি কালিদাস।
চাহিনাত আমি পরিবারে মাগো কীর্ত্তি-কিরীট,
জ্বালাতে বর্ত্তী আলোকিত তব মন্দির পীঠ।
কোথা পাব বল মন্দারহার - কোথা পাব আমি অর্ঘ্য।
এই নিয়ে দেও, জননি আমার মুক্তি অপবর্গ॥

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র।

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৵০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ডস লেন, কলিকাতা।

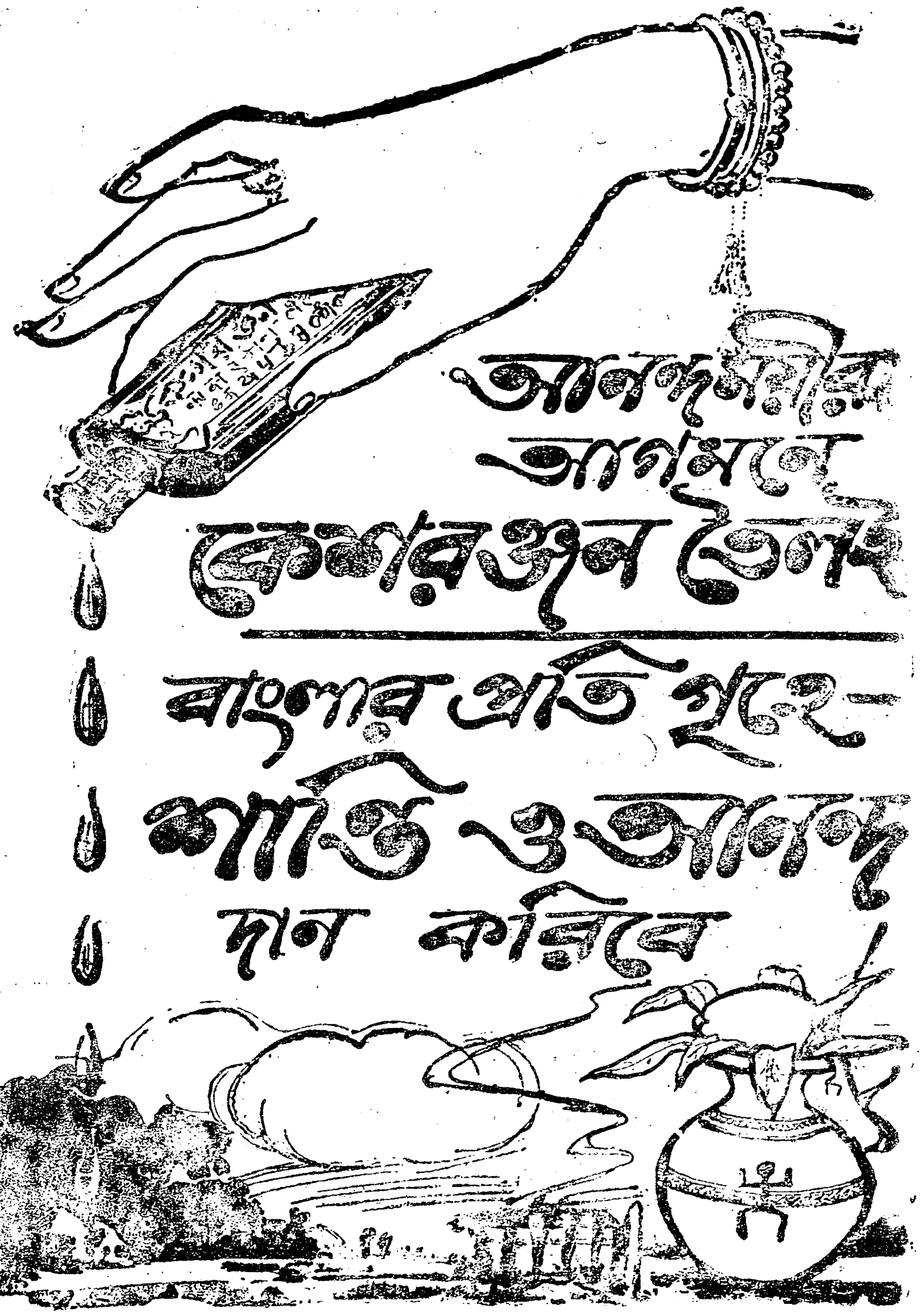

কবিরাজ— নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

১৮।১ এবং ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39, MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীসতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, অগ্রহায়ণ, [৮ম সংখ্যা

১। গান—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি, এ, .. ৬০৫
২। একখানীলীপী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রদেব রায় ৬০৬
৩। বড়বাবু—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী
৪। পাণ্ডব নির্ব্বাসন স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ৬১৭
৫। প্রশ্নত্রয় সমাধান—শ্রীআশুতোষ ঘোষ ৬২৩
৬। কবে সেদিন আসিবে—শ্রীমতী ক[illegible]লিনী [illegible] ৬২৭
৭। চিন্তা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬২৮
৮। আত্মতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় উকিল ৬৩২
৯। সমালোচনা ৬৩৫

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা, বার্ষিক মূল্য ২্ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

6 3-28

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!!

মূল্য ৸০, ডজন ৪্, গ্রোস ৪০্, পাইকারী [illegible] সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, ক[illegible]

৪২।B, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে
অমৃতবল্লী কষায়
মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে
কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

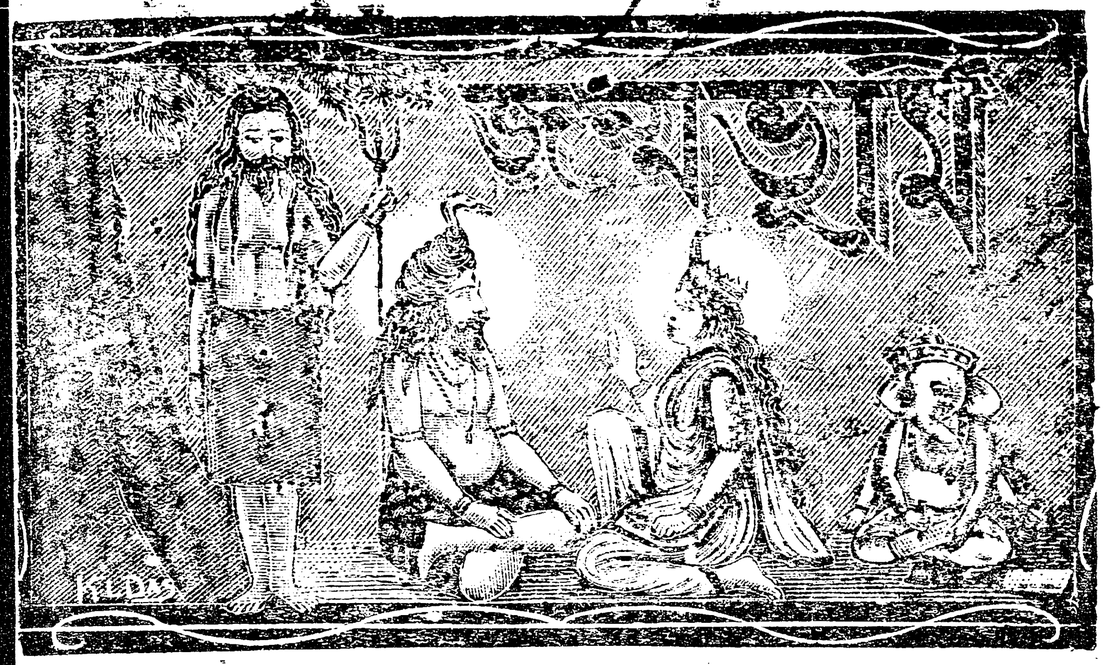

৩০শে বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, অগ্রহায়ণ | ৮ম সংখ্যা

গান।

লেখিকা—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি-এ।

[সুর,—'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে']

অন্ধকারে কাঁদ কে ?
হায় অভাগিনী দিবস যামিনী
করুণ রাগিণী সাধ কে ?
আলুথালু কেশে ধূলামাখা বেশে,
কি ভাব বসিয়া দেশে দেশে দেশে,
কেন উতলা উন্মাদ হে !
কাঁদ কে বিরলে হায়রে অভাগী !
করে কি জননি নগ্ন এলোকেশী,
সব সাধ অবসাদ বিস্বাদ হে ?

গঙ্গা।

শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বল ফুল্ল ফেনিল ফেনচ্ছল গঙ্গে।
ললিত কলকল্লোলিত স্রোত আন্দোলিত অঙ্গে॥
নরকিন্নরগন্ধর্ব্বামরচঞ্চচ্চামরবীজিতা,
তটতালতমালশালসরলব্যালোলসৃজিতা,
অশেষগুণগুম্ফিতা হরিচরণচুম্বিতা বঙ্গে॥
ভাগীরথী ভগবতী ভোগবতী রেবতী রুজারী,
লোকত্র্যলোক চরণচম্পকচন্দ্রালোকপূজারী,
দিক্‌কোটীতারিণী ধূর্জ্জটিজটাচারিণী নিঃসঙ্গে॥

একখানি লিপি।

লেখক—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায়।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ খুড়া মহাশয় শ্রীচরণেষু—

প্রণাম নিবেদন মিদং—

খুড়ো, অনেক দিন কোনও সংবাদ পাই নাই, আশা করি শারীরিক কুশলে আছেন। ঠাকুর মহাশয়ের পত্র পাইয়া অবগত হইলাম ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে "নামের" সময় ভক্তগণ বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। আমি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; ভরসা করি জগদম্বার কৃপায় আবার সে সুযোগ উপস্থিত হইবে। ঠাকুর মহাশয় আমাকে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাহার জোরে আমার কোথাও কোন কষ্ট হয় নাই, বেশ আনন্দে দিন কাটিয়াছে। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "birth reserve পাইলে বুঝিতে হইবে মায়ের ইচ্ছা যাত্রার অনুকূলে।" ঘটিলও তাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারুবাবুর চেষ্টায় birth reserve করিয়া রওনা হওয়াই কর্ত্তব্য অবধারণ করিলাম। ট্রেণে সহযাত্রীগুলি খুব ভালই পাইয়াছিলাম। বেশ গল্প করিতে করিতে শেষ রাত্রিতে গয়ায় পৌঁছি। সেখান হইতে নৃপেনের বাসায় উঠি। সেখানে উষা ও তাহার ছেলে মেয়েরা সব ছিল। পরদিন নৃপেনের সঙ্গে তাহার মোটরে বুদ্ধগয়ায় যাই। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়া

ছিলাম। এইবার আবার ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম! মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে যে সকল স্থপতিশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রত্নতাত্ত্বিকের পরম আদরের জিনিষ। এইখানে বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধার্থ সাধনায় পরম সিদ্ধিলাভ করেন। অতি পবিত্র স্থান। দেখিতে দেখিতে কত কথাই মনে উদয় হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও আজিও সেই প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। গয়ায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রথম যেবার আসি সেইবার সারিয়াছিলাম সুতরাং এবার আর শ্রাদ্ধাদি করি নাই। একটী পাহাড়ের উপর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধন কুটীর দেখিলাম। সন্ধ্যার ট্রেণে বেনারস যাত্রা করি ও পরদিন প্রাতে তথায় আসিয়া পৌঁছি। বেনারসে আসিয়া জনৈক পরিচিত লোকের বাসায় উঠি, কিন্তু প্রেমেন্দ্র ভায়ার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রেমেন্দ্রের বাসায় নিজ দ্রব্যাদি আনছিয়া লইতে হয়। এখানে আসিয়া ৺অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করি ও সেদিন ৺অন্নপূর্ণার প্রসাদ গ্রহণ করি। তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া এখানকার দ্রষ্টব্য সকল স্থান দেখিয়া বেড়াই। ১৭ বৎসর পরে আবার সারনাথ দেখিতে যাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখিলাম একটী সুন্দর মিউজিয়ম গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সুসজ্জিতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। দুই সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে গৃহস্থালীতে যে ২ দ্রব্য ব্যবহৃত হইত সেগুলি পৃথক্ গৃহে স্থান লাভ করিয়াছে। সারনাথের সুবৃহৎ স্তূপ খুঁড়িয়া আরও বহু গৃহ মৃত্তিকা হইতে বাহির করা হইয়াছে। বৌদ্ধশ্রমণগণ যে সকল গৃহে থাকিয়া ধ্যানধারণা করিতেন, যে বৃহৎ হলে ধর্ম্মালোচনা হইত, পাতাল গৃহ সুড়ঙ্গ ইত্যাদি খুঁড়ি খুঁড়ি পরে আবার সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সারনাথ হইতেই বুদ্ধদেব প্রথমে ৫ জন পরে ৬০ জন প্রচারক পৃথিবীর দিকে দিকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। আজ যে বৃহত্তর ভারতের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত, সেই গৌরবের ভিত্তি সারনাথ হইতে উদ্ভূত। সারনাথে সেবার একটী অতি বৃহদাকার মর্ম্মরস্তম্ভ দেখিয়াছিলাম, সম্ভবতঃ অনবধানতার জন্য সেটী খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়া বস্তুতঃই ব্যথিত হইলাম। বেনারসে একালের বাঙ্গালীর দুটী কীর্ত্তি দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম, একটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, দ্বিতীয়টী চিন্তামণি বাবুর Anglo Bengali School. বেনারসে আসিয়া যাঁহারা সেবাশ্রমের কার্য্য ভাল করিয়া না দেখিয়াছেন তাঁহাদের বেনারসের একটা বড় প্রতিষ্ঠান দেখা হয় নাই বলিতে হইবে। নিঃস্বার্থসেবকেরা কিরূপভাবে রাস্তা

ঘাট হইতে বিপন্ন রোগগ্রস্তদের কুড়াইয়া লইয়া গিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতেছে তাহা দেখিবার জিনিষ। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদের নির্ব্বিকারচিত্তে অক্লান্তভাবে সেবা করিতে ইহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। নর-নারায়ণের সেবার এতটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। এই জনবহুল স্থানে এরূপ একটা সদনুষ্ঠানের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয় পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছেলেদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতিকূল ছিলেন। চিন্তামণি বাবু সেই প্রতিকূলতার সহিত যুঝিয়া ৩৫ বৎসর সাতিশয় পরিশ্রমের ও যথার্থ অধ্যবসায়ের ফলে সফলকাম হইয়াছেন! প্রথমে ৩টী ছেলে লইয়া আরম্ভ করিয়া এখন স্কুলে বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা ৪৫০। স্কুলের প্রকাণ্ড বাড়ী হইয়াছে। স্কুলের উন্নতি দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাহা Recognise করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও গভর্ণমেণ্টকেও অবশেষে প্রচুর সাহায্য করিতে হইয়াছে।

বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় আর একটী বিরাট ব্যাপার। Art college, Scienee college, Engineering college. Medical college, প্রভৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, পৃথক পৃথক Boarding, আর শিক্ষকদের আবাস গৃহ ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে অবস্থিত। এই সবের ৯ খানি ফটো লইয়াছি। বেনারসে ৯ দিন থাকিয়া লক্ষ্ণৌ যাই। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর আর কোথাও দেখি নাই। সব যেন ছবির মত সাজান রহিয়াছে। নূতন Council গৃহ আধুনিক কালের প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রায় শেষ হইয়া আসিল; Martin Co, contract লইয়াছেন। প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে কয়েকটী ইমামবারা, মসজিদ ও Picture gallery বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। Residency বাড়ী বহু গোলাগুলির চিহ্ন এখনও বহন করিতেছে। এখানকার Zoo ব্যাঘ্র, সিংহাদি স্বাভাবিক অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিয়াছে, দেখিবার মত জিনিষ বটে। লক্ষ্ণৌ সহর দেখিয়া সন্ধ্যার ট্রেণে হরিদ্বার রওনা হই। শেষরাত্রিতে পৌঁছিয়া কনখল যাই ও সেইখানেই অবস্থান করি। কনখলেই দক্ষরাজার বাড়ী, কতকাংশ বন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যজ্ঞের স্থান, সতীঘাট ইত্যাদি এখনও বহু পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে আরতি অতি মনোমুগ্ধকর। কনখলে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন সেবানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া হৃষিকেশ যাত্রা করি। হরিদ্বার হইতে হৃষিকেশ যাইবার পথে দুই দিকে কেবল ধর্ম্মশালা, শুনিলাম কোনও গৃহস্থ বাস করে না। হৃষিকেশে ত্রিবেণী রামজী ও ভরতজীর মন্দিরাদি দর্শন

করি। ভরতজীর মোহান্তের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, লাইব্রেরী ও দ্রাতব্য চিকিৎসালয় উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রভাগা পার হইয়া পর্ব্বতের উপর কৈলাস মঠ! এইখানে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি আছে। বেদান্তের ও বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের Library আছে। কৈলাস মঠের উপর হইতে হিমালয়ের দৃশ্য অতি মনোহর ও চিত্তাকর্ষক।

জঙ্গলের ভিতর সাধুদের কুটীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, স্থানটী অতি নির্জ্জন, গঙ্গাপ্রবাহের অবিশ্রান্ত গুরুগম্ভীর ধ্বনি সেই নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়াছে। সেই অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য যত দেখি আবার দেখিতে ইচ্ছা করে, দেখিবার আশা মিটে না—"নয়ন না তিরপিত ভেল।" খরস্রোতা গঙ্গার সেই আকুলধ্বনি 'ওঁ' কার রূপে আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই বিরাটধ্বনি "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তন্ময় হইয়া আনন্দে ডুবিয়াছিলাম, তাহা অনুভূতি ভিন্ন বর্ণনার বিষয় নয়। অপরাহ্ণ ৩টা বাজিয়া গিয়াছে, স্নানাহার নাই, সেই পুণ্যস্থানে সেই অবস্থায় পড়িয়া আছি। সেবানন্দ স্বামীর পুনঃ পুনঃ ডাক ও ঠেলাঠেলিতে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। এরূপ অচিন্তনীয় শান্তি উপভোগের সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। মনে হইতেছিল সেইখানে থাকিয়া যাইব, আর আসিব না, কিন্তু স্বামীজির অনুরোধে অগত্যা সেস্থান—সেই শান্তিপূর্ণ সুখময় স্থান ত্যাগ করিতে হইল। সেইদিন ৫টার ট্রেণে দেরাদুন যাত্রা করিলাম ও সন্ধ্যার পর সেখানে পৌঁছিয়া রাত্রিবাস করিলাম। পরদিন স্বামীজির সহিত সহর দেখিয়া মোটরে রাজপুর গেলাম। রাজপুর হইতে মুশোরী; সেখান হইতে ফিরিয়া বিষণপুর রামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘে বসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিলাম। তারপর দেরাদুন হইতে কনখল। আবার হরিদ্বার হইতে দিল্লী যাত্রা করি। প্রাচীন দিল্লী তো এক মহাশ্মশান। কবরের পর কবর আর তার উপর মসজেদ যে কত তার ইয়ত্তা নাই। সমাধিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্রাট হুমায়ুন, আলতামাস, দাফদারপঙ্গ, তোগলক ও সুলতান নিজামুদ্দীন এবং জাহানারা বেগমের সমাধি। তাঁহার অভিলাষ মত উন্মুক্ত আকাশ জাহানারা বেগমের সমাধির চন্দ্রাতপের কাজ করিতেছে। চন্দ্রালোক তাঁহার সমাধির উপর পতিত হয়, এই ছিল তাঁহার অন্তিম কালের বাসনা, তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

মসজেদগুলির মধ্যে জুম্মা মসজেদ, কোবাতুল ইসলামের মসজেদ, মতি মসজেদ ও ঐতিহাসিক স্বর্ণ মসজেদ দর্শনীয়। ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ পাণ্ডবের দরবারগৃহ মসজেদে পরিণত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের ৬৪টী স্তম্ভের মন্দির সেকালের স্থপতি শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন—পুরাতন দুর্গটীতেও তৎকালীন শৌর্য্য বীর্য্য ও সমরনীতি-নৈপুণ্যের মূর্ত্ত বিকাশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দিল্লীর মোগল আমলের দুর্জ্জয় দুর্গ এখনও ভীম বিক্রমের স্মৃতি বহন করিতেছে—এই দুর্গাভ্যন্তরেই দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস বিরাজ করিতেছে। দেওয়ানী খাসের যে উচ্চাসনে বাদসাহের সিংহাসন স্থাপিত হইত সেটী মর্ম্মরের রং বেরংয়ের পুষ্পলতা ও কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ। এরূপ শিল্পনিপুণতা জগতে দুর্ল্লভ! শিল্পীর বাসনা তিনি প্রাণমন ঢালিয়া যে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন তাহার এক পার্শ্বে তাঁহার চিত্রও স্থানলাভ করিলে তিনি কৃতার্থ হন। বাদশাহ আদেশ দিলেন "বেশ তাহা হউক কিন্তু যেন বেমানান না হয়।" সর্ব্বমধ্যস্থানে ইটালীয় শিল্পী আফিয়াস মূর্ত্তিতে স্বয়ং প্রকাশমান হইলে কি সুন্দর ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সমগ্র চন্দ্রাতপ বেমানান দূরে থাক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেওয়ানীখাসের তো কথাই নাই, মর্ম্মর শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এখনও লতাপাতা বেষ্টিত স্বর্ণালঙ্কৃত স্তম্ভ, গৃহপ্রাচীরগাত্র, ছাদতল কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত। তাই কথিত আছে যে জগতে যদি স্বর্গ থাকে এইখানে, এইখানে, এইখানে।

বড় বাবু।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী।

(১)

সেদিন নৃত্যহরি ভট্টাচার্য্য আসিয়া আফিসের কেদারায় বসিতেই বেহারা সেলাম জানাইয়া বলিল "বড় বাবু আপ্‌কো তলব দিতা হ্যায়।"

নৃত্যহরি বাবু শশব্যস্তে নবমী পূজার পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বড় বাবুর ঘরে উপস্থিত হইলেন। হাট্‌কোট্‌ধারী বড় বাবু তাঁহাকে বসিতে না বলিয়াই ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "এখন কটা বেজেছে?"

তখন ঘড়িতে দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছিল।

নৃত্যহরি বাবু ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে পাঁচ মিনিট লেট্ হ'য়েছে, কি কর্ব্ব, গঙ্গা হ'তে আস্‌তে একটু দেরী হয়, ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা আহ্নিকটা—"

বড় বাবু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "ড্যাম্, শূয়ার, তুমি কি জাননা এটি সাহেবের অফিস, এখানে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসিতে হয়। এখানে আরও ত ব্রাহ্মণের ছেলে কাজ করে, তাদের ত দেরী হয় না, মস্ত বড় ধার্ম্মিক হ'য়েছ তুমি?"

"আজ্ঞে কত শত লোকে দূর দেশান্তর হ'তে গঙ্গায় একবার ডুব দিতে আসে, আর এত কাছে থাক্‌তে গঙ্গা স্নানটা কর্ব্ব না?—এই ভেবে প্রত্যহ গঙ্গা স্নানটা কর্ত্তে যাই, তা বাবু, ২।৪ মিনিটের তফাতে আর কি আসে যায়?"

"বটে! কিছু যায় আসে না? একথা সাহেব শুন্‌তে পেলে, এখুনি তোমার চাকরী যাবে।"

"তা যাবে যাক্ বাবু! তবু চাকরীর জন্যে পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম সন্ধ্যে আহ্নিক ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্ব না।"

"বটে! আমার কথার উপর কথা! আচ্ছা তাই হোক। দেখি কে তোমার চাকরী রাখে। চাকরী কর্ত্তে এসে এসব Irregularity চল্‌বে না—ও সব waywardness দেখাবার জায়গা এ নয়!" বলিয়াই বড় বাবু একলম্ফে সাহেবের ঘরে গিয়া নৃত্যহরির নামে কত কি লাগাইলেন।

সাহেব ইতঃপূর্ব্বেই নৃত্যহরির উপর মনে মনে চটা ছিলেন। বলা বাহুল্য, সাহেব নৃত্যহরির এই ধৃষ্টতায় আদৌ সন্তোষ লাভ করেন নাই, তবে কিনা তাঁহার মত হিসাব নিকাশে পাকা লোক সহসা পাওয়া যায় না, তাই এতদিন তাহাকে তাড়াইব তাড়াইব করিয়াও তাড়ান নাই। আজ বড় বাবুর মুখে নৃত্যহরির ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া সাহেবের মনে সেই পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, নৃত্যহরির পদচ্যুতির হুকুম হইল।

(২)

বাস্তবিক পক্ষে বড় বাবু যে নৃত্যহরির সামান্য বিলম্বের জন্য তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাড়াইবার অন্য কারণও ছিল। সেদিন আফিসে আসবার পূর্ব্বে তাঁহার গৃহিণী একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে বড় রুক্ষস্বরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই ত তোমার কেরামতী, তোমার শালাটি আজ ছ'মাস চাকরি চাকরি করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে একটা

চাক্‌রী ছুটিয়ে দিবার তোমার মুরদ নাই, তুমি কি না আবার আফিসের বড় বাবু!"

অন্য কারো শ্লেষবাক্য হইলে বড় বাবু তাহা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু যে গৃহিণীর জন্য লোকে ভ্রাতাকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেয়—মাতাকে ভাত কাপড় দেয় না—থিয়েটার বায়স্কোপে অজস্র পয়সা ঢালে, সেই গৃহিণীর কথা কি ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারেন? তাই তিনি আজ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, আজ যাহাকে হউক বরখাস্ত করিয়া সেই শূন্য পদে গৃহিণী-ভ্রাতাকে বসাইয়া তাঁহার মুরদ আছে কি না তাহা একবার হাতে হাতে দেখাইবেন। আফিসে আসিয়া তিনি আর কাহারও কোন ত্রুটি না পাইয়া বেচারী নৃত্যহরির উপরই মনের ঝালটি ছাড়িলেন।

(৩)

সন্ধ্যাকালে শুষ্কমুখে চিন্তাকুল মনে বাসায় ফিরিতেই পত্নী সারদাসুন্দরী শশব্যস্তে হাত পা ধুইবার জল লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "আজ যে তোমায় কেমন কেমন দেখাচ্ছে, অসুখ বিসুখ করে নাই ত?"

নৃত্যহরি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বয়স্থা কুমারী কন্যার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "না, অসুখ বিসুখ করে নাই, তবে সংবাদ বড় খারাপ।"

সারদা সুন্দরী বলিল "আচ্ছা তা' শুন্‌ব এখন, তুমি আগে হাত পা ধুয়ে একটু জল খাবার খেয়ে সুস্থ হ'য়ে নেও ত।"

নৃত্যহরি বাবু তাহাই করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভেবেছিলাম চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রে মেয়েটিকে আমার সুপাত্রে দান ক'রে সুখী হ'ব, কিন্তু ভাগ্যে তাহা হ'লো না।"

সারদাসুন্দরী শশব্যস্তে বলিলেন, "কেন কি হ'য়েছে?"

"আর হ'বে কি, বড় বাবুর কুপরামর্শে আজ বড় সাহেব আমায় জবাব দিয়েছেন। গঙ্গা হতে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে আস্‌তে আমার একটু দেরী হয়, আজ আফিসে যেতে পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছিল, এই অপরাধে বড় সাহেবকে বলে আমাকে চাকরী হ'তে বরখাস্ত করেছেন।"

সারদা সুন্দরী মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তাইত! এই সব ছোট ছোট কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে আজ আমরা দাঁড়াই কোথায়? আচ্ছা, তোমার বড় বাবুকে বল্লে না কেন যে ব্রাহ্মণের

ছেলে সন্ধ্যে আহ্নিকটে না সেরে আসি কি করে? তোমার বড় বাবু হিন্দু না খ্রীষ্টান?"

'হিন্দু গো হিন্দু! কিন্তু হিন্দু হলে কি হবে? তার ভিতরে কি হিন্দুত্ব আছে? মোসলমান বাবুর্চ্চির হাতে সে মায় মুরগীর মাংস পর্য্যন্ত খায়—সাহেবকে সেলাম করে, হ্যাট কোট পরে, অথচ বড় কুলীন বামুন বলে গৌরবও করে। তার ছেলের বিয়েতে সে নৈকশ্য কুলীন বলে পাঁচ হাজার টাকা পণ নিয়েছিল!"

"তা এখন কি কর্ব্বে ঠিক করেছ? কালই ত বাড়ীওয়ালা এসে বাড়ী ভাড়ার টাকা চাইবে, গয়লা এসে দুধের দামের তাগিদ দেবে, সামনে পূজা, এখন উপায়?"

"উপায় ভগবান! ভগবান যা' করেন তাই হবে। দুনিয়ায় ভগবানের রাজ্যে কেউ কি উপোস ক'রে থাকে? এই ১৪ বছর ধরে এত বড় সাহেব কোম্পানীর অফিসে চাকরী কল্লেম, এত বড় কল্‌কাতা সহরে আমার কি দোসরা চাকরী মিল্‌বে না?"

(৪)

সারারাত নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাইয়া নৃত্যহরি পরদিন বেলা দশটার মধ্যে দুটো আলু ভাতে ভাত মুখে দিয়া চৌরঙ্গী মহলে গেলেন। তথায় প্রত্যেক অফিসের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়া এবং দ্বারোয়ান বাবুদের দুই চারি আনা প্রণামী দিয়া কত "বড় বাবু" "ছোট বাবু" সাহেব সুবোর সহিত সাক্ষাত করিলেন, কিন্তু কেহই ত্রিশটি টাকার চাকুরী দিবার আশ্বাসও তাঁহাকে দিল না। এই ভাবে দিনের পর দিন হাঁটিয়াও নৃত্যহরি বাবু দশ দিনের মধ্যে একটা চাকুরীর জোগাড় করিতে পারিলেন না। সকলেই বলিল, "এখন রিডাক্‌সনের বাজার"।

দশদিন ক্রমাগত সওদাগরী আফিসে হাঁটিয়া হাঁটিয়া নৃত্যহরি অন্ন সংস্থানের কোনই উপায় করিতে না পারিয়া দেশে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। স্ত্রীর গায়ের অবশিষ্ট যে দুই একখানি অলঙ্কার ছিল, এক পোদ্দারের দোকানে তাহা নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করিয়া বাড়ী ভাড়া, দুধের দাম, বাজার দেনা প্রভৃতি পরিশোধ করিয়া একদিন রাত্রি ৯টার গাড়ীতে রিক্তহস্তে নৃত্য-হরি খুলনা মেলে চাপিয়া বসিলেন। বাড়ীওয়ালাকে অবশ্য তিনি শুধু শ্রাবণ মাসের ভাড়াটি দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার জন্য অনেক কাঁদাকাটি

করিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার বাড়ীওয়ালা ভাদ্রমাসে কোন ভাড়াটিয়া আসিবে না, বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভাদ্রমাসের পুরাদস্তুর ভাড়া ও সেই সঙ্গে কলি ফিরাইবার টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিয়া তবে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

(৫)

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সারারাত ছারপোকার দংশন ও লোকজনের ঠেসাঠেসিতে নিদ্রাহীন অবস্থায় ১২ ঘণ্টা কাটাইবার পর দৌলতপুর ষ্টেশনে যাইয়া ছোট গাধাবোটের ন্যায় ষ্টীমারে আরও ৭ ঘণ্টা কোন গতিকে অস্থিচর্ম্মসার দেহখানিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার পর, পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরে যখন নৃত্যহরি তাঁহার পৈতৃক ভগ্ন ইষ্টক নির্ম্মিত দালানটিতে সপরিবারে প্রবেশ করিলেন, তখন পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলেই চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এইরূপ অসময়ে তাঁহার আগমনের কারণ কি ইত্যাদি প্রকার শত শত প্রশ্নবাণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। ছোট ছোট ছেলেরা সব ঘন ঘন ট্রাঙ্কের দিকে তাকাইতে লাগিল, এইবার বুঝি আম, আপেল, আঙ্গুর, বেদানা আর বর্দ্ধমানের মিহিদানা বাহির হইয়া তাহাদের রসনা তৃপ্তি করিবে। কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে নৃত্যহরি বাবুর চাকুরিটী গিয়াছে এবং তিনি একেবারে শূন্য হস্তে চাষবাস করিয়া খাইবার জন্য দেশে আসিয়াছেন, তখন একে একে সকলেই সে স্থান হইতে খসিয়া পড়িল।

নৃত্যহরির ভ্রাতৃবধূ যিনি সপুত্রক এতদিন নৃত্যহরির মণিঅর্ডারের টাকায় পায়ের উপর পা দিয়া খাইতেছিলেন, আর যিনি স্বামীকে পরামর্শ দিয়া ভাসুরকে বঞ্চনা করিয়া জমিদারের খাজানা বাকী ফেলিয়া জমি জমা বাড়ী ঘর নিজের নামে বেনামী করিয়া লইয়াছিলেন—সেই ভ্রাতৃবধূ একপাল লোকের জন্য এখনি হাঁড়ীতে ভাত চড়াইতে হইবে ভাবিয়া একেবারে সিংহীর মত গর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীর কাছে গিয়া বলিল, "কতবার বলেছি, আমার দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও, তা শোননি। দিনরাত একটা সংসারের খাটুনি খেটে আর আমি পারিনে। দেখ দেখি আমার শরীরে আর কি পদার্থ আছে? এই আড়াই প্রহরের পর বেলায় আবার কি এক পাল লোকের ভাত রাঁধা যায়?"

প্রফুল্লকুমার গৃহিনীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "তা কি কর্ব্ব, ভাই বিপদে

পড়ে এসেছেন, এমন সময় কি দুটো ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া যায়?"

ভ্রাতৃবধূ যতই মৃদুস্বরে কথাগুলি স্বামীর কাছে বলুক না কেন, নৃত্যহরির উৎকর্ণ কাণে তাহার প্রত্যেক কথাটি বিষের ছুরির ন্যায় বিদ্ধ হইল নৃত্যহরি কিছুতেই খাইলেন না সঙ্গে যে চিঁড়া বাতাসা ছিল তাহার দ্বারা কোনরূপে ছেলেমেয়েদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বৈকাল বেলায় গ্রামের দর্পনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট গেলেন।

(৬)

দর্পনারায়ণকে গ্রামের সকলে "ঠাকুর্দ্দা" বলিয়া ডাকিত। বয়সে তিনি গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রবীণ। গ্রামের যা' কিছু গোলমাল হোক, সালিশী বিচার করিয়া ঠাকুর্দ্দা তাহা মিটমাট করিয়া দিতেন। ইহাতে উকিল মোক্তারের পসার জমিবার ব্যাঘাত হইলেও, গ্রামবাসীদের অনেক পয়সা বাঁচিত। নৃত্যহরি গিয়া ঠাকুর্দ্দার পরামর্শ চাইতেই তিনি বলিলেন, "দেশের বাস্তভিটা ত্যাগ করে সামান্য চাকরীর লোভে তোমরা সব বিদেশে চলে যাও, এখন তার ফল হাতে হাতে পাইলে ত? তা যাক্, এখন বলি কি, ভাইয়ের সহিত আপোষ ক'রে যা দুই একখানি জমি আর একটু বাগান বাগিচা ছাড়িয়া দেয় তাহা লইয়া নিজে হাতে কোদাল ধ'রে—বেগুণ, পটল, উচ্ছে, লঙ্কা জন্মাইতে থাক, তোমার ভাত খায় কে? খনা ব'লেছেন—

'আট হাত অন্তর এক হাত খাই
কলা পুত্গে চাষা ভাই
পুতে কলা না কেট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত
তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাক্গে চাষী খাটে শুয়ে॥"

নৃত্যহরি, ঠাকুর্দ্দার পরামর্শই সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা পত্নীর পরামর্শে "বিনা মামলায় তাঁহাকে সূচ্যগ্র মেদিনী" দিতে প্রথমতঃ নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে ঠাকুর্দ্দার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহাকে বাস করিবার জন্য একখানি ছোট চালাঘর, বাগ-বাগিচার বিঘাখানেক জমি ও মাঠের দুই পাখি জমি দিলেন। গ্রামের মধ্যে বন্য শূকরের আবাসস্থলরূপে অনেকগুলি বাগান পড়িয়াছিল, নৃত্যহরি সেই

সমস্ত বাগানের মালিককে উৎপন্ন দ্রব্যের সিকি দিবেন বলিয়া সেগুলিও ইজারা লইয়া বেগুণ, লঙ্কা ও কলার চাষ আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। ৩।৪ বৎসর যাইতে না যাইতে নৃত্যহরি বয়স্থা কন্যার মহাসমারোহে বিবাহ দিয়াও প্রায় ৭।৮ শত টাকা নগদ জমাইতে পারিলেন।

একদিন পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া নৃত্যহরি বলিলেন, "কেমন ! চাকরীর চেয়ে এ কাজ ভাল নয় কি ? খাঁটি দুধ মাছ খেতে পারি, সকাল বিকাল নির্ম্মল বায়ুও সেবন কর্ত্তে পারি, বাড়ী ভাড়ারও চিন্তা নাই, কেমন ! তখন যে মাথায় হাত দিয়ে ভেবেছিলে ?"

(৭)

সেবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে নানাস্থান হ'তে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরও যেমন সমাগম হইয়াছে, অনেক গৃহস্থও তেমনি আসিয়াছেন। দশবৎসর একাদিক্রমে গ্রামে বাস করিয়া একটু তীর্থ পর্য্যটনের জন্য আমাদের নৃত্যহরি বাবুও সস্ত্রীক তথায় গিয়াছেন। তথায় তিনি একটি বাসাও লইয়াছেন। মেলার তৃতীয় দিনে গঙ্গা হইতে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তায় লোকজনের ভিড় দেখিয়া নৃত্যহরিও কৌতূহল বশে দাঁড়াইলেন। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলেন এক বাঙ্গালী বাবু তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালককে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া এক পাণ্ডার বাড়ীতে উঠেন। আজ দুই দিন হইল বাবুর সমস্ত গায়ে বসন্ত বাহির হওয়ায় বাবুর স্ত্রী ও শ্যালক তাঁহাকে পাণ্ডার হেফাজতে ফেলিয়া কলিকাতা রওনা দিয়াছেন। বসন্ত রোগীকে স্থান দেওয়ায় পাণ্ডার বাড়ীতে যে সব যাত্রী উঠিয়াছিল, তাহারা একে একে সরিয়া পড়িতেছে এবং নূতন যাত্রীও আর কেহ আসিতেছে না। করুণার অবতার পাণ্ডা মহাশয় তাই বসন্তের রোগীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতেছে।

কি জানি কি করুণ সুরে নৃত্যহরির প্রাণের গোপন তারটি বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রোগী, ভোগী, আর্ত্ত ও দুঃস্থের সেবাই ত প্রকৃত ধর্ম্ম ! কি হবে তার তীর্থ পর্য্যটনে যদি আর্ত্তের করুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রাণের মধ্যে বেদনা না জাগে ? এই প্রকার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নৃত্যহরি সেই জনতা-ব্যূহ ভেদ করিয়া পাণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা

যদি ইহাঁকে স্থান না দাও, তবে আমি আমার বাসায় ইহাঁকে লইয়া যাইতেছি ; আহা ! বিপদে পড়িলে মানুষকে এমনভাবে নির্য্যাতন কর্ত্তে নাই—অসুখ বিসুখ আপদ সকলেরই হয়।"

পাণ্ডা সে কথা শুনিয়াও শুনিল না। নৃত্যহরি বাবু কোনরূপে একখানা এক্কা যোগাড় করিয়া রোগীকে আপন বাসায় লইয়া আসিলেন। তাঁহার বাসাটিতে দুইখানি মাত্র ঘর হইলেও অন্য লোকের সহিত তাহার কোন সংস্পর্শ ছিল না—কাজেই কেহ আপত্তিও করিল না। নৃত্যহরি ও তাঁহার পত্নীর অহোরাত্র সেবা শুশ্রূষা ও বাবা তারকনাথের নিকট তাঁহাদের ঐকান্তিক কামনার ফলে বাঙ্গালী বাবুর অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল, বসন্তের গুটিকা সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়া তাহা একে একে মিলাইয়া গেল। নৃত্যহরি বাবু প্রথম দিনেই এই বাঙ্গালী বাবুকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বাঙ্গালী বাবুই তাঁহার চাকুরী জীবনের পরম শত্রু বড় বাবু, কিন্তু পাছে এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহার স্ত্রী রোগীর শুশ্রূষায় কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করেন, এই ভয়ে তিনি এতদিন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই।

বাঙ্গালী বাবু চৌদ্দ দিনের দিন অন্ন পথ্য করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, যাদের সঙ্গে তিনি হরিদ্বারে আসিয়াছিলেন সেই স্ত্রী ও শ্যালক ত নাই ! বিস্ময়ে অবাক হইয়া বাঙ্গালী বাবু নৃত্যহরি বাবুর হাত দুখানি ধরিয়া সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি দেবতা,—আর ঐ দেবীই বা কে ?"

নৃত্যহরি বলিলেন, "বড়বাবু ! আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না, আমি আপনার অফিসের সেই নৃত্যহরি।"

"নৃত্যহরি ! হাঁ, তাইত—ভাই, বন্ধু, দেবতা ! আমি তোমার কাছে বড় অপরাধে অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর ভাই !"

"বড় বাবু ! আপনি বেশী কথা বলিবেন না, এখনও আপনার শরীর বড় দুর্ব্বল। আপনি আমার কাছে কোন অপরাধ করেন নাই ; বরং আমাকে নূতন স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া আমার কোটি কোটি নমস্কার গ্রহণ করুন।"

"না, নৃত্যহরি ! আমি বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমা কর।"

"বড় বাবু ! আপনি কাতর হবেন না। আপনি নিমিত্ত মাত্র। ভগবান যার ভাগ্যে যা বিধান করেছেন, জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে মানুষকে তা'

ভোগ কর্ত্তেই হবে। মানুষ ভাবে, আমি কর্ত্তা—আমিই ভোক্তা। এটা তাদের মস্ত ভুল।"

"নৃত্যহরি তুমি দেবতা।"

"না বড় বাবু! আমি দেবতার উপযুক্ত কোন কাজই করি নাই। মানুষের অসময়ে মানুষের যাহা কর্ত্তব্য আমি শুধু সেইটুকু করিয়াছি।"

"যাই হোক, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার ঋণ জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিব না। দেখিলে ত নিজের পরিবারের ব্যবহার, অসময়ে যমের হাতে ফেলে দিয়ে চলে গেল।"

"বড় বাবু!"

"না, আমি আর এখন বড় বাবু নই, আমি এখন তোমার ভাই। আমায় আর বড় বাবু বলো না।"

"আচ্ছা তাই হবে! ভাই! তুমি এখন আমাদের সহিত দেশে ফির্‌বে ত?"

"না ভাই! আমি এখন কিছুদিন এখানে থাক্‌ব। তারপর——"

আরও ৫।৬ দিন বড় বাবুর সেবা করিয়া এবং বড় বাবুকে সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল করিয়া রাখিয়া নৃত্যহরি সস্ত্রীক স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বড় বাবু ক্রমে লছমণ ঝোলায় উপনীত হইয়া এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তারপর যে বড়বাবুর কি হইল তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে শুনা যায়, এই ঘটনার বছর দশেক পরে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হঠাৎ একদিন নৃত্যহরির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার পুত্র-কন্যা-পৌত্র দৌহিত্রগণকে দেখিয়া গিয়াছিল এবং নৃত্যহরির মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সেই সন্ন্যাসী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গিয়াছিল।

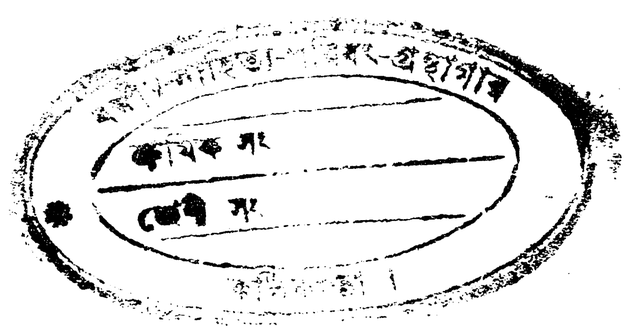

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনা প্রাসাদ কক্ষ।

যুধিষ্ঠির। চল ভাই! সভায় পশিব এইক্ষণ,
জ্যেষ্ঠতাত আবাহন, হউক দেবন,—
তবু অন্যথা কভু না করি।

ভীম। হে পাণ্ডবনাথ!
দেবন—তেঁই সে ডরি! নহে, পাই রণে
সমযোগ্য অরি, বীর হৃদে কি আনন্দ
আছে তার পর? দিগ্বিজয়ে সমর হইল
কতমত, জানিল ভারত বাহুবল
তব কিঙ্করের। দেবনের
কপট সংগ্রামে দেব, নাহি যায় মন!

যুধিষ্ঠির। শুন ভীম! অপূর্ব্ব ঘটন; চক্রবর্ত্তী
রাজা মোরে ত্রিভুবনে বলে, এবে পাশা
ক্রীড়া ছলে জ্ঞাতি চাহে রণ, সে অভাব
করিতে পূরণ আমার উচিত; অক্ষে
কদা ক্ষত্র নহে ভীত,—হেন নীতি আছে
চিরদিন। হব স্বধর্ম্ম-বিহীন—পাশা
করিলে প্রত্যাখ্যান।

ভীম। ধর্ম্মরাজ!
হেন যুক্তি কভু নাহি ধরে মতিমান;
কর দান কৌরবে যতেক ধন চাহে,—
জিনিল যেন না কহে ক্ষত্রিয় সমাজে।
আর কহি তাহে—বিত্ত এ কোন্ বিধান?

রাজ্যকালে পিতৃদেব দিগ্বিজয় করি
সর্ব্বধন অঙ্কে জ্যেষ্ঠমানে সমর্পিলা,—
কহ রাজা! পেয়েছ কি কপর্দ্দক তার?
অধিকন্তু কৌরব আচার স্মর মনে।
পিতৃহীন মোরা—এই পিতৃব্য সবারে
জৌগৃহে জানিয়া আহুতি ডালি দিল।
তায় রক্ষা পাই যদি, রাজ্য কাড়ি নিল।
এই যে প্রাসাদ নব নির্ম্মাইল পিতা,
এবে কেবা করে অধিকার? তার সনে
সত্য পণে কেমনে পাশার প্রতারণা?
ফাঁদে সাধে সাধে পশিবে নৃমণি কেন?
জানি শুনি বিপদ যে বরে আবাহন,
অবশ্য পতন তার, কা'র সাধ্য রাখে?
সম্মুখসমর ক্ষত্রধর্ম্ম, অক্ষক্রীড়া
খলের রচন,—সেই সাধুবুদ্ধজন,
হেন অপধর্ম্ম কভু করে না পালন।

যুধিষ্ঠির। শুন বৃকোদর! স্বতঃ বড়ই দুষ্কর
বুঝিতে ধর্ম্মের গতি—ক্ষত্র কুল-রীতি
তেঁই ভাই না করি লঙ্ঘন। যে কহিলা—
ক্ষত্রধর্ম্মে আছে বিধি রণ, তাহে পুনঃ
আছেত দেবন! হেলন কেমনে করি?
বাহুবলে রণস্থলে মনুষ্য হনন,
কি ধর্ম্ম কি অপধর্ম্ম বিচারিতে নারি,
তবু কুলধর্ম্ম বলি পালি—তেঁই তাহে
জিনি কিম্বা হারি অগ্রে না করি বারণ,
পশি যুদ্ধে অক্ষ ক্ষেত্রে কৈলে আবাহন।

অর্জ্জুন। কিঙ্করেরে ক্ষমিবা রাজন্! শুনিতেছি
যত কূট-অক্ষাভিজ্ঞগণ কুরুপক্ষে
পেয়ে আমন্ত্রণ সভামাঝে উপস্থিত।
অক্ষ বটে ক্ষত্র নীতি, কিন্তু খল সহ

না খেলিবে কদাচন। যথা কূট রণ,
তথা দেব! পরাজয় অবশ্য ঘটন।

যুধিষ্ঠির। ভাই!
হেন যদি হয়—তবু কোন্ বড় কথা!
যাবে কত রত্ন ধন? পাণ্ডব ভাণ্ডারে
যত ধরে, শতবর্ষ খেলিলে দেবন
ক্ষয় কভু নাহি হবে; কিন্তু পুনঃ শুন,
না খেলিলে অপযশ রবে, দুষ্ট জনে
সমাজে কহিবে, পাশার সমরে এবে
যুধিষ্ঠির হৈল পরাঙ্মুখ। হেন বুঝি.
শূন্য রাজসূয়ব্যয়ে পাণ্ডবভাণ্ডার—
ক্ষত্রিয় আচার তেঁই পালিতে নারিল,
ডরিল খেলিতে অক্ষ কৌরবের সাথে।
ধিক্! বৃথায় ভারতে পাণ্ডব আপনা
চক্রবর্ত্তী সর্ব্বেশ্বর রাজা বলাইল।
ভাই! গেল কুলধর্ম্ম রহিল কুখ্যাতি,
ধরিল বৃথা কি জননী জঠরে মোরে?
ক্ষত্রধর্ম্ম করিব পালন! কহিলা যে,
কূট অক্ষাভিজ্ঞ যতজন!—জানি; নিজে
নহিত অক্ষম ক্ষত্রধর্ম্ম ব্যবসাতে,
রাজপুত্র—জানি ভালমতে কালধর্ম্ম
বেদ ধনুর্ব্বিদ্যা অক্ষক্রীড়া প্রকরণ।
কে জিনে কে হারে কি আছে নির্ণয় তার?
ভাই! কোথা কভু পরাজয় নাহি পাই,
যত ব্যয় ততোধিক হবে আয়, শুভ
হেন যোগে ভূভারতে, জনম আমার—
জানে তত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ সুধীর সহদেব।

সহদেব। (স্বঃ) হায়! কি কহিব—নহে মম মতি স্থির,
কি শকতি কনিষ্ঠ করিব নিবারণ?

যুধিষ্ঠির। চল ত্বরা সভায় পশিব, হেন বুঝি—
বিলম্ব বুঝিয়া মো সবার, জ্যেষ্ঠতাত
পিতৃব্য বিদুরে হেথা কৈলা আগুয়ান।

সহদেব। (স্বঃ) ভগবান! তব লিপি কে করিবে আন?
ইষ্টানিষ্ট অদৃষ্ট সে তোমার গোচর,
মূঢ় নর! ধায় তাই ভ্রান্তবুদ্ধিবলে
পুরুষকারে ভেদিতে সে মায়া আবরণ।
ব্যগ্র মন করিতে বারণ ভবিতব্য,
বিড়ম্বনা কি আছে ইহার পর আর?

(বিদুরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কহ তাত! কিবা আজ্ঞা করিব পালন?
কি কারণ তব চিরপ্রশান্ত বয়ান
বিবর্ণ মলিন হেরি আজ? কেবা হেন
করিল কি কাজ হ'ল ভাবান্তর যাহে?

বিদুর। বৎস! কব কায় কি ভাব অন্তরে মোর?
মাত্র দূত আমি—অন্ধরাজ আজ্ঞাবাহী,
তাঁহার আদেশে কহি পশিতে সভায়,—
প্রতীক্ষায় দুর্য্যোধন, সৌবল, শকুনি
প্রমুখ যতেক খ্যাত অক্ষবিদ্‌গণ
বিরাজিছে, তোমা সত্য পণে আহ্বানিছে
পাশার সমরে আজ; মম দৌত্যকাজ
পূর্ণ এবে—কর যেবা লয় তব মন;
কি কহিব, কা'রও নিবারণ ধৃতরাষ্ট্র
না শুনিল। ভগবান! কালে কি হইল!
যদি বলেতে নারিল, কপট পাশায়
জিনিবারে চায়। ধিক্ ক্ষত্র আচরণ!

যুধিষ্ঠির। কহ তাত! কেন পুনঃ হেন নিবারণ?
যবে দিলা আমন্ত্রণ, ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া
দিয়াছি কহিয়া তথা খেলিব দেবন!

বাক্য মম কদাচন অন্যথা না হয়;—
আর তায় গুরু জ্যেষ্ঠতাত অনুমতি,
কি শকতি পাণ্ডবে লঙ্ঘিবে কোনজন?
এইমাত্র যেতেছিনু সভায় হে তাত!
হও অগ্রসর অনুগামী পঞ্চজন;
ধার্ম্মিকেরে ধর্ম্ম নাহি ত্যজে কদাচন।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নত্রয় সমাধান।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

একদিন বৈকুণ্ঠে নারদ ও নারায়ণ কথোপকথনচ্ছলে বলিতেছিলেন, মানব বেশ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ, নরক ও মর্ত্ত্য—তিন স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে। কথা বলিবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নারদকে নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বপ্রথম কোথায় যাইতে তোমার অভিপ্রায়?" নারদ বলিলেন, "যদি যাইতে হয় অগ্রে নরকে, তারপর স্বর্গে, তারপর মর্ত্ত্যে যাইলে ভাল হয়।" নারদের কথা শুনিবামাত্র নারায়ণ বলিলেন, 'তথাস্তু।'

উভয়ে নরক দর্শন করিতে গেলেন। তথায় যাইয়া দেখেন, পাপীরা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অবিরত আর্ত্তনাদ ও হাহাকার করিতেছে। নারদ বলিলেন, "ঠাকুর! এ ভীষণ যন্ত্রণা আর দেখিতে পারি না। ইহাদের অশেষ ক্লেশ দেখিয়া প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আপনার উপস্থিতিতে ইহাদের কষ্টের লাঘব হওয়া উচিত; কিন্তু কৈ তাহা তো হইতেছে না।" নারায়ণ বলিলেন, 'কি করিব উপায় নাই, কর্ম্মফল খণ্ডন করা আমারও সাধ্য নাই। যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে সে তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছে।' এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় নারদ দেখিলেন, একজন পাপী রৌরব নরককুণ্ড হইতে

উঠিতেছে ও ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে আবার ডুবিতেছে, কিন্তু হাসিতেছে। ঐরূপ দেখিয়া নারায়ণকে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দয়াময় প্রভো! এখানে এই বিপর্য্যয় ব্যাপার দেখিয়া মনে বড়ই বিস্ময়ের উদয় হইতেছে। নরকের যন্ত্রণায় সকলেই অস্থিরভাবে কালযাপন করিতেছে, কেবল একজন হাসিতেছে ইহার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিতেছি না।' নারায়ণ বলিলেন 'পরে বলিব।' এই বলিয়া তথা হইতে উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

নরক হইতে স্বর্গে উভয়ে আগমন করিয়া দেখিলেন, তথায় সকলে বিমল আনন্দে অতিবাহিত করিতেছেন, কাহারও কোন ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই, অবিরল আনন্দস্রোতে সকলে ভাসমান। ইহার মধ্যে একস্থানে স্বর্ণ সিংহাসনে এক ব্যক্তি বিমর্ষ বদনে বসিয়া কপালে হস্তনিবেশ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। নারদ দেখিবামাত্র স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বর্গে নিরানন্দ মনে এই ব্যক্তি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কেন? ইহার তাৎপর্য্য বলিয়া আমার সন্দেহ অপনোদন করুন।' নারায়ণ বলিলেন, 'পরে বলিব।' দুই স্থানের দুই বিপর্য্যয় ঘটনা দেখিয়া নারদ বিশেষ চিন্তিত হইয়া কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, বিষণ্ণ অবস্থায় অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় নারায়ণ বলিলেন. 'নারদ এইবার আমরা একবার মর্ত্ত্যে যাব। তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে আগমন করিব।' তারপর উভয়ে মর্ত্ত্যে আগমন করিয়া একজন ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহে অতিথি হইবার বাসনায় গমন করিলেন।

দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বাররক্ষক বলিল, 'এখানে অতিথি সৎকারের কোন ব্যবস্থাই নাই অন্যত্র গমন করুন। আমাদের যিনি প্রভু, তাঁহার আদেশ এই, কেহ আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিবে, যদি তাহা না শুনে, কঠোর কর্কশ বাক্যে গলায় হাত দিয়া বিদায় করিয়া দিবে। এরূপ লোকের নিকটেও আমাদিগকে উদরান্নের জন্য বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইতেছে, অতএব আপনারা আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।' নারদ বলিলেন, 'আর কাজ নাই, এই স্থান হইতেই আমরা প্রস্থান করি।' নারায়ণ বলিলেন, 'একবার মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে চলিয়া যাইব।' দ্বারপালকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলায় দ্বারপাল উভয়কে সঙ্গে লইয়া ধনীর নিকট গমন করিল, ধনী এখন তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন। দুইজন ব্রাহ্মণকে ও দ্বারপালকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া

বলিল, 'কে ইহাদিগকে আনিতে বলিল, এখনি এখান হইতে গলা ধাক্কা দিয়া বিদায় দাও।' নারায়ণ বলিলেন, 'আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। কেবল মধ্যাহ্নে আহার করিয়া প্রস্থান করিব' এই কথা শুনিবামাত্র আরও উত্তেজিত হইয়া ধনী বলিতে লাগিল, 'এখানে ওসব কিছু হইবে না, সহজে যাইতে না চাও প্রহার করিতে করিতে বাহির করিয়া দিবে। অতএব মানে মানে চলিয়া যাও।' নারায়ণ বলিলেন, 'তোমার ধনৈশ্বর্য্য আরও বাড়ুক।' নারদ এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিলেন, 'ঠাকুর এই কি আপনার দয়ার পরিচয়। অপাত্রে দয়া প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে। কি বলিব সাধ্য নাই, আপনার কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার শক্তি কাহারও নাই।' এই কথা বলিতে বলিতে উভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছেন, এত বেলায় কোথায় যাইয়া অতিথি হইব। নারায়ণ বলিলেন, 'নারদ! এই গ্রামের প্রান্তে এক অতি দরিদ্র কৃষক বাস করে; আজ তাহারই গৃহে যাইয়া অতিথি হইব।' নারদ বলিলেন, 'আপনার যাহা অনুমতি হইবে তাহাই করিব। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এ ব্যক্তিকে আপনি আশীর্ব্বাদ করিলেন "বাড়ুক" ইহার তাৎপর্য্য কি, আমাকে বলিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন।' নারায়ণ বলিলেন 'পরে বলিব।'

গ্রামের প্রান্তভাগে পর্ণকুটীরনিবাসী দরিদ্র কৃষকের গৃহে উপনীত হইবামাত্র কৃষক-পত্নী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল,—'অদ্য আমাদের সুপ্রভাত, আপনারা আমাদের বাটীতে অতিথরূপে আগমন করিয়াছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের বাটী পবিত্র হইল, পিতৃলোক তৃপ্ত হইল, জীবন জনম সফল হইল।'

'এমন শুভ-সংবাদ আমার পতিদেবতাকে দিয়া আসি, তিনি মাঠে হল-কর্ষণ করিতেছেন,' এই বলিয়া আসনে বসিতে দিয়া কৃষক-পত্নী প্রস্থান করিল। কৃষক পত্নী দুইটী পুত্রকে তথায় বসিতে বলিয়া স্বয়ং চলিয়া গেল। মাঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে তাহার মস্তকের বেণী আলুলায়িত হইয়াছে, সেই অবস্থায় দৌড়িতেছে, দূর হইতে কৃষক তাহার পত্নীকে দেখিতে পাইয়া বাটীতে কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া হল ছাড়িয়া তৎপর চলিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইয়াছে,'—সে বলিল,—'আজ আমাদের বাড়ীতে দুইজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়াছেন, এমন শুভ-সংবাদ দিবার জন্য আমি স্বয়ং চলিয়া

আসিয়াছি। অতএব যথাযোগ্য আয়োজন করিতে হইবে।' কৃষক, পত্নীকে বিদায় দিয়া বলিল, 'চল, আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া লইয়া যাইতেছি।' কৃষক এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কাজ করিত, সেই ব্রাহ্মণকে যাইয়া বলিল, 'ঠাকুর, আমাকে দুইটী টাকা দিতে হইবে, কারণ আজ আমার বাড়ীতে ভাগ্যক্রমে দুইজন ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়াছেন।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'তুই গরিব-লোক, দু'টাকা লইয়া কি করিবি? আট আনা লইয়া অতিথি সৎকার কর।' কৃষক বলিল,—'ঠাকুর! এ বিষয়ে আমি কাহারও উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করি না, দিবে কিনা বল, এই আমি চলিলাম'। তখন ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা দিল। দোকান হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কৃষক বাটীতে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক অতিথিদ্বয়ের অভ্যর্থনা করিল, তারপর তাঁহাদের আহার সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ে তথায় উপস্থিত থাকিয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিয়া স্নানার্থে গমন করিল। স্নান সমাধান্তে আসিয়া যাহা কিছু প্রসাদ ছিল, তাহার কিছু-কিছু পুত্রদ্বয়কে ও পত্নীকে দিল; অবশিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিল। সেই সামান্য প্রসাদেই সকলের উদরপূর্ত্তি হইল। তাহারান্তে নারায়ণ ও নারদ বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পকরথ আসিতেছে দেখিয়া নারদ বলিলেন,—'আপনি অনেকক্ষণ বৈকুণ্ঠ ছাড়া, সেইজন্য পুষ্পকরথ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে।' নারায়ণ বলিলেন, 'নারদ! এ রথ তোমার জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়। ঐ রথে কৃষক, কৃষক-পত্নী ও তাহার পুত্রদ্বয় স-শরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। তুমি আমাকে যে তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলে, আজ সেই প্রশ্ন তিনটীর সমাধান করিব। নরকে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'একজন লোক রৌরব নরককুণ্ড হইতে উঠিতেছে ও ডুবিতেছে কিন্তু কেন হাসিতেছে? এই কৃষক তাহারই বংশধর। সে মনে মনে এই ভাবিয়া হাসিতেছিল যে আমার কৃত পাপের ফলভোগ এতদিন করিলাম, কিন্তু আমার বংশে এমনি এক ধার্ম্মিক সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পুণ্যফলে অচিরাৎ আমি বৈকুণ্ঠে যাইতে সক্ষম হইব।'

'আর একদিন স্বর্গে একজনকে স্বর্ণসিংহাসনে বিমর্ষভাবে কালযাপন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে, তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ কর। স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া সে ভাবিতেছিল,—আমার কৃত পুণ্যকার্য্যের জন্য আমি এতদিন স্বর্গভোগ করিলাম, কিন্তু আমার বংশে এমনি কুলাঙ্গার কুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে,

যাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অচিরাৎ স্বর্গ ত্যাগ করিয়া নরকে যাইতে হইবে। আর সেই ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহে অতিথি হইবার বাসনায় গমন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলাম এবং কঠোর বাক্য ও ব্যবহার সত্ত্বেও 'বাড়ুক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম,—তাহার তাৎপর্য্য এই যে এখন এ ধনমদে আচ্ছন্ন হইয়া এই অন্যায় ব্যবহার লোকের প্রতি করিতেছে, ইহাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলে আরও গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিবে; সুতরাং পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইবে তখন আপনি ডুবিবে।' নারদ স্থিরচিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া বলিল, 'লীলাময়, আপনার অপূর্ব্ব লীলা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই; আমি কীটাণুকীট কি প্রকারে বুঝিব? প্রভো! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার কৃপাকটাক্ষে পরিচালিত হইতেছে, এ রহস্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই।" তখন নারায়ণ ও নারদের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্পক রথ আসিয়া বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের লইয়া গেল; কৃষক, কৃষকপত্নী ও তাহার পুত্রদ্বয় পূর্ব্বের সেই পুষ্পকরথে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠে স্বতন্ত্র লোকে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল, রৌরব নরককুণ্ড হইতে কৃষকের পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার লাভ করিয়া, বৈকুণ্ঠে তাহার বংশধরের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইল।

কবে সে সুদিন আসিবে?

লেখিকা—শ্রীমতী কমলিনী রায়।

না জানি স্বজনি, কবে সে সুদিন আমার জীবনে আসিবে।
(কবে) হৃদয় নিহিত বিরহ বেদনা নিমেষে সকলি নাশিবে॥
(কবে) বিরহ-আঁধার হৃদয়-আকাশে
মিলন-পূর্ণিমা হাসিবে উল্লাসে,
(তখন) আপনা বিস্মরি, সব পরিহরি তোমাতে যাইয়া মিশিবে।
(কবে) তোমার অমল, স্নিগ্ধ ধবল—প্রেমের শীতল বন্যায়—
হৃদয় আকুলি উঠিবে ব্যাকুলি, মিলন গোধূলি সন্ধ্যায়—
(তখন) সকলি ভুলিয়া সকলি ত্যজিয়া এ হৃদি তোমাতে ডুবিবে॥

চিন্তা।

(নির্জ্জন প্রদেশে)

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তোমার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দেখিতে দেখিতে কোথায় আসিলাম! এ যে নির্জ্জন প্রদেশ। দেখিতেছি পার্শ্বে নদী, সম্মুখে উদ্যান, অদূরে শস্যক্ষেত্র। ঘোর ঘনঘটায় আকাশ সমাচ্ছন্ন। ঐ দেখ মেঘাবলি হইতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। বিহঙ্গমগণ ঘোর কাদম্বিনী সন্দর্শনে ভয়-বিহ্বল-চিত্তে ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিতেছে। কই, আমার মনে ত কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইতেছে না। ঐ বিদ্যুৎ মাঝে আমি তোমার নির্ম্মল জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতেছি। যেখানে তুমি সেইখানেই প্রেম ও আনন্দ। প্রেমানন্দের মধ্যে ভয় থাকিতে পারে না। আলোক ও আঁধার একস্থানে অবস্থান করিতে পারে না।

কে তুমি কেমন কহ আমায়।
যাঁহার স্মরণে ভয় পলায়॥
বিদ্যুতের মাঝে হেরি তোমার
রূপ নিরুপম প্রেম আধার॥

এই বর্ষাকালে প্রকৃতি সুন্দরী সরস কুসুম পল্লবে সুশোভিত। তাহার মধুর হাস্যে চারদিক হাস্যময়। এই নবজলবতী পূর্ণকলেবরা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, এই নবনীরদ বর্ণ ধান্যক্ষেত্র আমি যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেছি, তোমার অপূর্ব্ব রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বিমোহিত হইতেছি। এই স্রোতমালা হেলিয়া দুলিয়া প্রেমানন্দে চলিতেছে, আমার বোধ হইতেছে যেন তাহারা তোমার মন্থর গতির অভিনয় করিতেছে। বীচিমালার শব্দ তোমার পদশব্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। ধান্যগণ সজল-সরস-পবন-হিল্লোলে পুনঃ পুনঃ নতশিরে তোমার চরণেই প্রণিপাত করিতেছে। কই, আমি ত তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তুমি আমার নিকটে, দূরে, অন্তরে, বাহিরে, সঙ্গে রহিয়াছ। কি আশ্চর্য্য! দেখা না দিয়া ভালবাসা লইবার শক্তি তোমারই আছে, স্বরূপতঃ দেখা না

দিয়া ভাবে ও ইঙ্গিতে নিজ অবস্থান সূচনা করা কেবল তোমারই স্বভাব। বুঝিয়াছি তুমি রসিকরাজ, লুকোচুরি প্রেম তোমার উত্তমরূপে শিক্ষা আছে। অথবা তোমাকে প্রেমিকই বা কেমন করিয়া বলিব? তোমার প্রেমের গাঢ়তা নাই। প্রেমের চাঞ্চল্যে প্রেম থাকে না। ছি! ছি! তুমি কেন এত চঞ্চল। হৃদয়ে এস, স্থির হও। কখন হৃদয়ে, কখন সম্মুখে কখন পার্শ্বে রাখিয়া মনের কথা, প্রাণের কথা জানাই। এস সখা! এ সরস বর্ষায় আমরা এই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করি। এই উদ্যানের প্রতি এখন মানুষের যত্ন নাই, তথাপি ইহার মনোহর কান্তি অবলোকন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। এস সখা! প্রথমতঃ এই মুক্ত লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সুন্দরী নবদলমালমণ্ডিতা শ্বেত-কুসুম-শোভিতা। হে সখা! জিজ্ঞাসা করি, এরা কি তোমার ভবনাট্য-শালার নর্ত্তকী? ইহারা সুবাসিনী, সুহাসিনী, মন মোহিনী। ইহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। পবিত্র প্রেমরসে মন আপ্লুত হইতেছে। আমি নিরুপমা লতিকার মধ্যে তব নৃত্য অবলোকন করিতেছি। দেখ! দেখ! তুমি এখানে কি রূপের মেলাই খুলিয়াছ! আবার ওই দেখ পাদপের গায় লতিকা সুন্দরী, যেন বরবধূর মিলন হইয়াছে। সরস বর্ষায় সুরসে সুহাসে তোমার হাস্যের অনুকরণ করিতেছে। এই দেখ সখা! অশ্বত্থ, এই দেখ বিরাট বট, এই আম্র বৃক্ষ। ওই মল্লিকাদি কুসুমকানন। সকলেরই রূপ লাবণ্য নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। এতক্ষণ তোমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, কিন্তু আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি তোমার সংসারে দেখিতেছি সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয়। বৃক্ষ বৃক্ষের সহবাস ভাল বাসে, বালক বালকের মিলনে সুখী হয়, জ্ঞানী জ্ঞানীর সহিত সুখালাপে সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। ধনী ধনীর সহিত মনোভাব বিনিময় করেন। সখা! তোমাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ। তুমি জ্ঞানী, ধনী, রাজরাজেশ্বর, তবে তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু এ সব জানিয়াও মন তোমাকে সখা ভাবে সম্ভাষণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তুমি যে হও সে হও, তুমি যখন আমার মন হরণ করিয়াছ, তোমাকে যখন প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে আমার মন অতি ব্যাকুল, যত শক্তিই থাকুক, নিশ্চয় তুমি আমার সখা। এস সখা! আবার বলি আমার পাশে দাঁড়াও, এই উদ্যানে তোমার কত রত্ন আছে আমাকে হাসিমুখে দেখাও। সখা! আমি তোমার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া বিমোহিত হইতেছি! ঐ দেখ তাল ঐ দেখ খর্জ্জুর, সকলেই কঠিন বর্ম্মাবৃত

কিন্তু উহারা গুড়ের কলসী। আচ্ছা, সখা! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি প্রত্যেক পদার্থকে ভিন্নভাবে ভিন্ন সজ্জায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, না মৃত্তিকাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ সমুদয় পদার্থকে সৃষ্টি করিবার শক্তি দিয়াছ? মনীষীগণ বলেন ক্ষিতি-অপ তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূত প্রভাবে জগতের সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন, পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত ও ধ্বংস হইতেছে। তুমি এই পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ, আর সমুদয় পদার্থই তোমার ইচ্ছানুরূপ উৎপন্ন হইতেছে। ধন্য তোমার মহিমা, ধন্য তোমার কৌশল। এই পঞ্চভূতকে তুমি কি শক্তি দিয়াছ, যাহা দ্বারা স্থাবর, জঙ্গম, সরিৎ, শৈল, সমুদ্র-সঙ্কুল বসুন্ধরা মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদাদি দ্বারা নিরন্তর নবভাবে সজ্জিত হইতেছে? মনীষীরা যাহা বলেন সে সকলের সারবত্তার বিচারকর্ত্তা তুমি, কিন্তু আমি প্রত্যেক পদার্থেই তোমার অধিষ্ঠান অবলোকন করিতেছি। ঐ দেখ, কমনীয়কলেবর কদলীকলাপ, উহাদের সুদীর্ঘ পত্রাবলি বক্রশির হইয়া তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছে। উহাদের গ্রীবাদেশ হইতে করিশুণ্ডাকৃতি সুফলদামগ্রথিত দন্ত বাহির হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। ইহাদের ফল পরম উপাদেয়, পত্র সকল ভোজনপাত্র, অন্তঃসার মনুষ্য ও পশুর আহার্য্য। ত্বক্ সকল ঔষধ ও সূত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা সখা! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি এই সমুদয় পদার্থই মানুষের উপভোগ ও উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ? তুমি কি অগ্রে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার পর অন্যান্য সমুদয় পার্থিই তাহার উপভোগ ও উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ? এই সকল বৃক্ষাদির জীবন ধারণের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না কিন্তু মানুষের জীবন ধারণে ইহাদের সাহায্য প্রয়োজন, তাহাতেই বোধ হয় তুমি মানুষের উপভোগ ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এই সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছ। হে সখা! জিজ্ঞাসা করি, এই সকল প্রকৃতিমণ্ডলী অপেক্ষা কি মানুষ তোমার অধিক প্রিয়? তাই বা কি প্রকারে বলি, অধিক প্রিয়তার লক্ষণ ত কিছু দেখি না! যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে সুখে রাখিতে চায়, সুন্দর ভাবে সাজাইতে চায়। কই মানুষকে ত তুমি ইহাদের অপেক্ষা সুখী ও সুন্দর কর নাই। যদি বলি মানুষ সচেতন আর ইহারা অচেতন! তাই বা কি প্রকারে বলিব। ইহাদের রস গ্রহণের শক্তি আছে, বর্দ্ধিত হইবার শক্তি আছে, পুষ্পিত ও ফলিত হইবার শক্তি আছে, তাহা হইলে অবশ্য ইহাদের জীবন আছে, জীবন থাকিলেই সুখ দুঃখ বোধ আছে। এ কথা আমার নহে, তোমার প্রিয়তম আর্য্য ঋষিগণ পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানের বিজ্ঞানবিদ্গণ যন্ত্র দ্বারা ইহাদের সুখ

দুঃখ প্রকাশের শক্তি দেখাইতেছেন। যদি বলি ইহাদের বাক্‌শক্তি নাই, ইহারা বাদবিতণ্ডার ভৈরব নিনাদে মানুষের মত মহা গণ্ডগোল, মহা অনর্থ, মহৎ দুঃখ, মহৎ ভয় উৎপন্ন করে না, সে ত সুখের বিষয়। যে বাক্‌শক্তিতে পরমাশক্তির হানি হয় সেরূপ বাক্‌শক্তি না থাকাই ভাল। এই বাক্‌শক্তিহীনতা তোমার অপ্রিয়তার লক্ষণ কেমন করিয়া বলিব? বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট মানুষকে আমার অধিক দুঃখী বলিয়া বোধ হয়।

হাহাকার, রোদন, চীৎকার কি মর্ম্মবিদারক! বাক্‌শক্তি যদি তোমার গুণগরিমা বর্ণনে, উচ্চারণে পবিত্র হয় তাহা হইলেই বাক্‌শক্তি সার্থক। বাক্‌শক্তির বলবতী শক্তি তখনই উপলব্ধি হয়, যখন দশকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে তোমার নাম ও গুণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়, হায়! সংসার এরূপ স্থান, বাক্‌শক্তি শোক দুঃখ মোহ প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ। আর এক কথা, মানুষ গুণবান হইলে মানুষেই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে। বুধগণ বলেন গুণবানই তোমার অধিক প্রিয়। তরুলতাগণ মানুষ অপেক্ষা অধিক গুণবান কেননা উহাদের হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, অহঙ্কার নাই। উহারা উদার, সর্ব্বদা পরহিতে রত, পৃথিবী অপেক্ষাও সহিষ্ণু। তাই বলিতেছি, যদি গুণ গুরুত্বে বিচার করি তাহা হইলে তরুলতাগণ মানুষ অপেক্ষা তোমার অধিক প্রিয়। আবার একটা তর্ক আসিয়া মনে উপস্থিত হইল। তোমার ভূমণ্ডল কর্ম্মভূমি। যে কর্ম্মী সেই তোমার প্রিয়। তরুলতাগণ মানুষ অপেক্ষা কর্ম্মী। মানুষের কর্ম্মে অহঙ্কার আছে। মানুষ কর্ম্মী হইয়া আত্ম-প্রশংসায় আপন ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া যায়। অহঙ্কার ও দর্প অজ্ঞান-প্রসূত। যে কর্ম্মে অহঙ্কার আছে তাহা অকর্ম্ম। মানুষের কর্ম্ম সে কারণে দোষদুষ্ট। তরুলতাগণই যথার্থই কর্ম্মী। তাহারা নীরবে তোমার ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে থাকিয়া তোমার জগতকে সুসজ্জিত করে। তাই বলিতেছিলাম গুণ ও কর্ম্ম বিচারে তরুলতাগণ তোমার অধিকতর প্রিয়। ওই দেখ সখা, আর একটা কথা মনে হইল—জ্ঞান। মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ বোধ আছে। জ্ঞানই আনন্দ, অজ্ঞান দুঃখ। আমার বোধ হয়, যদি অতীত বোধ ও ভবিষ্যৎ বিচারে মানুষের পরমা শক্তির অন্তরায় ঘটে তাহা হইলে সেরূপ বোধ ও ধারণা অবাঞ্ছনীয়। যে বোধ পরমানন্দ-বিঘ্নকর তাহাই অজ্ঞান ও মোহ। মায়াসম্ভব মানুষের পক্ষে জ্ঞানানন্দলাভ বহু ভাগ্য ও সাধনার ফল। তাই বলিতেছি, এ জ্ঞান তুমি মানুষকে ভালবাসার জন্য দাও নাই। যদি তাহাই হইত, অতীত বোধ ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় মানুষ সর্ব্বদাই সুখী হইত।

আত্মতত্ত্ব

লেখক—শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় (উকিল)।

কোথা হ'তে আসি হেথা, ভাবিয়া না পাই।
কোথা যেতে হবে পরে, তার ঠিক নাই॥
কেই বা আনিল হেথা, কে বা লয়ে যাবে,
ব্যাকুল হতেছি সদা ইহা ভেবে ভেবে।
কোথা লয়ে যাবে, আর কোথায় রাখিবে,
সেথা গেলে পরেই বা কি দশা হইবে ?
নানা শাস্ত্র নানা মত, স্থির করা ভার,
নিশ্চয় হয় না কিছু—ঘোর অন্ধকার।
নদীবক্ষে তৃণ কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে,
পরস্পর মেলে যথা আসিতে আসিতে।
তার ন্যায় ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন,
ক্রমশঃ আসিয়া হয় তাহার মিলন।
অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা জায়া হয় সংঘটন,
তাহা হ'তে পায় সবে পুত্রকন্যাগণ।
প্রাণসম প্রিয় হয় ইহারা সকল ;
সদা চিন্তা কিসে হবে এদের মঙ্গল।
প্রতিদিন অহরহঃ জাগ্রতে স্বপনে,
অসম্ভব সুখ দুঃখ হইতেছে মনে।
সদাই বিপদ শঙ্কা মনেতে করিয়া,
কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রমে সবে আত্ম পাসরিয়া।
আকাঙ্ক্ষিত লাভে কভু হইয়া হতাশ,
বিপদে বিষন্ন হৃদে বহে দীর্ঘশ্বাস।
স্বজন বিরহ বিষে হ'য়ে জর্জ্জরিত,
বিপদসাগরে কভু হয় নিমজ্জিত।
নব নব রোগ পীড়া নূতন অভাব
আসি নাশে সকলের পবিত্র স্বভাব।

এই যে অসহ্য কষ্ট জগতে থাকিয়া—
যাইতে কি চাহে কেহ ইহাকে ত্যজিয়া ?
মায়া মোহে অভিভূত যেই জন হয়,
দারা, সুত, অর্থ বিত্ত তার মনে রয়।
এদের মমতা ত্যাগ করা হয় ভার,
এই হেতু মৃত্যুকালে কষ্ট হয় তার।
একাকী যে যাওয়া আসা, সঙ্গী নহে কেহ,
আমার আমার করা সেটা মাত্র মোহ !
নিজ কর্ম্ম ফল যাহা, তাহা ভোগ হবে,
অন্যের কর্ম্মের দ্বারা তাহা না খণ্ডিবে।
দেহ নাশে দুঃখ চিন্তা সকলি যাইবে,
মায়া মোহ দৃঢ়পাশ সব ছিন্ন হবে।
আত্মপর ভেদাভেদ কিছু নাহি রবে,
আধি-ব্যাধি শোক-তাপ সব দূরে যাবে।
অভাব আকাঙ্ক্ষা সব হইবেক লয়,
দেহ-নাশে সাধু-চিত্তে নাহি হয় ভয়।
দেহের বিধ্বংসে দুঃখ যাবে অতঃপর,
শেষের সে দিন সাধু ভাবে সুখকর।
পাপী-চিতে সদা ভয়, কম্পিত অন্তর,
শেষের সে দিন তার হয় ভয়ঙ্কর।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ ১ম ভাগ। কলিকাতা, কাঁকুড়গাছী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির-মঠের অন্যতম সন্ন্যাসী তত্ত্বমঞ্জরী মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বামী রামানন্দ প্রণীত। স্বামী কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, পোষ্ট নূরনগর, জেলা খুলনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷।৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের নিকট গ্রন্থকারের নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। স্বামিজীর রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ" নামক নবপ্রকাশিত সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠে আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ সম্বন্ধে আমরা যতগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছি, বর্ত্তমান লেখকের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ" তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি। কারণ অন্যান্য গ্রন্থে কেবলমাত্র ঠাকুরের উপদেশ সকলই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অমিয়মাখা উপদেশাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করতঃ ঠাকুর এক একটী বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা এবং প্রত্যেক বিষয়ক উপদেশের গভীর গভীর তত্ত্বের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য অল্পের মধ্যে প্রচলিত সরল গ্রাম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপিচ আমাদের উপনিষৎ, গীতা, ভাগবৎ, তন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র এবং ইংরাজি বাইবেল ও ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট নামক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির সমশ্লোক ফুটনোটে সংযোজিত করতঃ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই পাঠের উপযোগী করিয়াছেন। ইহাই এই গ্রন্থের বিশিষ্টতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর ব্যাখ্যা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই এইভাবে ভক্তগণকে উপহার দেন নাই। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

(১) সৃষ্টি তত্ত্ব, (২) ঈশ্বর নিরূপণ, (৩) ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি ? (৪) ঈশ্বরের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার, (৫) মায়া, (৬) মা কালীর স্বরূপ তত্ত্ব, (৭) ঈশ্বরের শক্তি বা কার্য্য, (৮) যোগতত্ত্ব, (৯) অভ্যাস যোগ, (১০) ধ্যান, (১১) অদ্বৈত তত্ত্ব বা জ্ঞানযোগ, (১২) বেদান্ত মতে সপ্তভূমি, (১৩) ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা, (১৪) বিজ্ঞানীর অবস্থা, (১৫) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (১৬) ভাবতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ স্থাপন।

সামান্যমাত্র ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করতঃ প্রাণে অপার শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানি গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক গৃহে বিরাজ করিলে, সত্য সত্যই আমরা যে জ্বালাময় সংসারের মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিলাভ করিতে পারিব বসিযেয়ে বিন্দু মাত্রসংশয় নাই।

প্রকাশকের নিকট অথবা শ্রীকৃষ্ণধন পাল, ৪১।এ, বেনেটোলা লেন, পোষ্ট আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কাশীর কথা বা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।—কাশীরাজ-সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৺কাশী সারস্বত মন্দির হইতে প্রকাশিত, মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

এই পুস্তকে বর্ত্তমান কাশীরাজবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ ও পুরাণোক্ত কাশীর রাজবংশের বৃত্তান্ত, বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত কাশী-বিষয়ক ঘটনাবলী ও কাশীর মহিমা সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশীধামে যে সকল দেবদেবীর মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সকল দেবদেবীর মহিমা, মন্দিরাদির ইতিহাস ও কাশীর কীর্ত্তিমালা এবং তুলসীদাস, তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, অহল্যা বাঈ প্রভৃতির কথা জানিতে পারা যাইবে। আমরা "কাশীর কথা বা কাশীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া শান্তিলাভ করিলাম। হিন্দুসমাজে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সচিত্র রত্নতত্ত্ববারিধি।—শ্রীযুক্ত দ্বিজবর দাস প্রণীত, ১৩ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে মণিমুক্তাদিখচিত অলঙ্কারের বিশেষরূপ প্রচলন হইয়াছে। অতএব সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ মহোদয়গণের মূল্যবান মণিরত্ন সমূহের নাম, গুণ, আসল কি নকল তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহারা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রানুসারে গ্রহপীড়া প্রশমনের জন্য রত্নাদি ধারণ করিবেন, তাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে আপনাপন গ্রহের অনুকূল দোষ-বিহীন রত্ন নির্ব্বাচন করিয়া ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। স্বর্গীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় "মণি-মালা" নামে রত্নসম্বন্ধীয় এই শ্রেণীর একখানি মূল্যবান বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন; মণিরত্নাদি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়েই তাঁহার অভিমত প্রমাণ স্বরূপে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা ভক্ত ও ভাবুক। অনন্ত শয্যায় লক্ষ্মী নারায়ণের যে ত্রিবর্ণের চিত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, বস্তুতই তাহা ভক্ত ও ভাবুকের চিত্তাকর্ষক। রত্নাদি পরীক্ষা করিবার জন্য রত্নের যে সকল চিত্র রত্নতত্ত্ববারিধিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে আমাদের বিদুষী গৃহ-

লক্ষ্মীরাও রত্নের দোষ ও গুণের পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে প্রত্যেক রত্নের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রত্নের সহিত মানবদেহের অবস্থার উন্নতি ও অবনতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা গ্রন্থকার অতি সুন্দররূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি স্বর্গীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্কলিত "মণি-মালা" গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তকখানিও জনসাধারণের নিকটে সমাদৃত হইবে।

চিত্রপঞ্জিকা ।—১২০।১২১ নং খোলরাপটী ষ্ট্রীট, চিনাবাজারস্থ সুবিখ্যাত ঔষধ বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানির ইংরাজী নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি। চিত্রখানি সুন্দরভাবে চিত্রিত।

কার্ডপঞ্জিকা ।—রাধাবাজারের ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোম্পানির কার্ডপঞ্জিকা পাইয়া আমরা প্রীত হইলাম। ইহাঁদের জুয়েলারী ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ডায়েরী ।—কলিকাতার দেশবিখ্যাত এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা ও আমদানীকারক মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোংর নিকট হইতে আমরা ইংরাজী নববর্ষের ডায়েরী উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। ডায়েরীখানি চিকিৎসকগণের ও গৃহস্থের বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহাতে কালকাতার বিখ্যাত ডাক্তারগণের নাম ও ঠিকানা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

দেওয়ালপঞ্জী ।—বিখ্যাত "লক্ষ্মী-বিলাস" কেশ তৈল প্রস্তুতকারক এম, এল, বসু এণ্ড কোং আমাদিগকে একখানি দেওয়ালপঞ্জী প্রদান করিয়াছেন। এই পঞ্জিকায় বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় তারিখ আছে। ইহা দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থের তারিখ দেখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

আবেগ ।—৭৯ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসী হইতে প্রকাশিত, বিনামূল্যে বিতরিত।

আবেগ একখানি ক্ষুদ্র সঙ্গীত পুস্তক। সঙ্গীতগুলি সরল, সজীব ও সুমধুর এবং চিত্তের ব্যাকুলতায় প্রাণের ভাষায় লিখিত। দুএকটি গীত আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। গীতগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, রচয়িতা মাতৃভাষাকে মাতার ন্যায় ভক্তির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

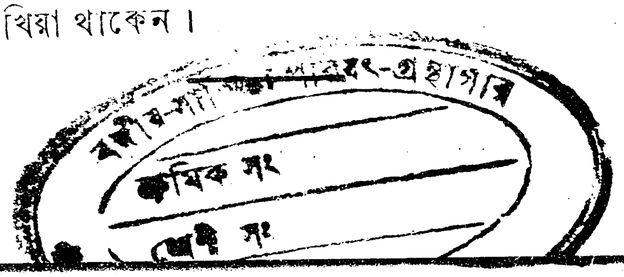

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষণ ও দুর্ব্বলী দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা, ৬ শিশি ৪৷৷০ টাকা, মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনারাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য

এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা,
তিন শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলার আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, এক সের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন ও কবিরাজ শশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের—

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

কবিরাজ শ্রীকালীভূষণ সেন কবিরত্ন।

৩ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কবিরাজ মহাশয়দিগের বংশপরম্পরা হইতে এই ঔষধালয় পরিচালিত হইয়া যে সাধারণের মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র সাধারণের অবগতির জন্য স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত দুই একটী ঔষধের নাম দেওয়া গেল।

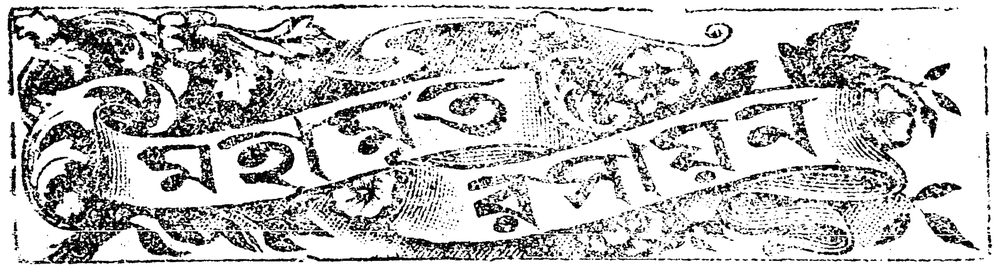

মূল্য প্রতিশিশি ১৷৷০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। ডজন ১৫ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

(উপদংশ জনিত বা অন্য কোন কারণে রক্তদুষ্টির মহৌষধ।)

দারুণ উপদংশ পীড়ার ও তজ্জনিত পারা সেবনের ফলে বা অন্য কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া গাত্রে চুলকাণি, দাগপড়া, স্ফোটোৎপত্তি বা কুষ্ঠ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

২৪ ঘণ্টায় জ্বালা আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

(সপূঁয মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহা প্রমেহ, শুক্রমেহ, রক্তমেহ, সপূঁয মেহ রোগের মহৌষধ এবং তজ্জনিত জ্বালা যন্ত্রনাদির পক্ষে আশুফলপ্রদ।

এতদ্ভিন্ন বিষম জ্বরারিষ্ট—সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক। কনকাসব—হাঁপানী কাসের মহৌষধ। ভৃঙ্গরাজ তৈল—মহোপকারী কেশতৈল। শুক্রবল্লভ বটিকা—ধারণাশক্তি-হীনতার ধন্বন্তরি। বাধকারি বটিকা—বাধক রোগের মহৌষধ।

স্থানাভাবে অন্যান্য ঔষধের তালিকা দেওয়া হইল না। বিস্তারিত ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ৴০ এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বটকৃষ্ণ পালের এড্ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল্ স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র

গোল্ড্ সার্শা-প্যারিলা।

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়। উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্লেট্।

কলিকাতার হেল্থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রাগিষ্ট।

[illegible] লেন, কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সুপ্রশংসিত ও
ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্তবাটীর ভুবন-
বিখ্যাত সেই আদিও অকৃত্রিম—

পদ্মমধু

(যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ।)

মূল্য—প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা, তিন ড্রাম ২৷৷০ টাকা,
মাশুলাদি ।৵০ আনা।

মানবজীবনে চক্ষুর ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় আর নাই। যাহার চক্ষু নাই—তাহার জীবনই বৃথা, চক্ষু না থাকিলে সম্পূর্ণরূপে অপরের গলগ্রহ হইতে হয়। চক্ষু পীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রযত্নে চক্ষুপীড়া দূর করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ মানবের অশেষ কল্যাণ কামনায় পদ্মমধুর গুণানুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সর্ব্ব-নেত্রাময় নিসূদনঃ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে "পদ্মমধু" শান্তি-কারক মহৌষধ। সর্ব্ববিধ চক্ষু পীড়ায় বিশুদ্ধ নির্ম্মল পদ্মমধু তুল্য অমোঘ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা দর্শন ইন্দ্রিয়ের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিবস পদ্মমধু ব্যবহার করিলে চক্ষুপীড়ার আশঙ্কা থাকে না, চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল করে, জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

এন, দত্ত ব্রাদার্স
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS,
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, পৌষ, [৯ম সংখ্যা

১। ব্যবসা বা কারবার—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ৬৩৭
২। পাণ্ডব-নির্ব্বাসন স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ৫৪৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
6.3.28

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য
একদিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই!
মূল্য ৷৴০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।
জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।
৪২।B, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সুপ্রশংসিত ও
ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্তবাটীর ভুবন-
বিখ্যাত সেই আদিও অকৃত্রিম—

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ।)

মূল্য—প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা, তিন ড্রাম ২৷৷০ টাকা,
মাশুলাদি ।৶০ আনা।

মানবজীবনে চক্ষুর ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় আর নাই। যাহার চক্ষু নাই—তাহার জীবনই বৃথা, চক্ষু না থাকিলে সম্পূর্ণরূপে অপরের গলগ্রহ হইতে হয়। চক্ষু পীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রযত্নে চক্ষুপীড়া দূর করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ মানবের অশেষ কল্যাণ কামনায় পদ্মমধুর গুণানুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সর্ব্ব-নেত্রাময় নিসূদনঃ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে "পদ্মমধু" শান্তি-কারক মহৌষধ। সর্ব্ববিধ চক্ষু পীড়ায় বিশুদ্ধ নির্ম্মল পদ্মমধু তুল্য অমোঘ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা দর্শন ইন্দ্রিয়ের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিবস পদ্মমধু ব্যবহার করিলে চক্ষুপীড়ার আশঙ্কা থাকে না, চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল করে, জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

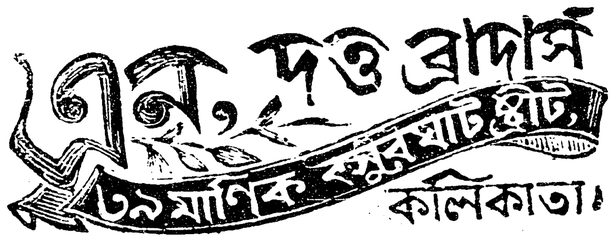

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং

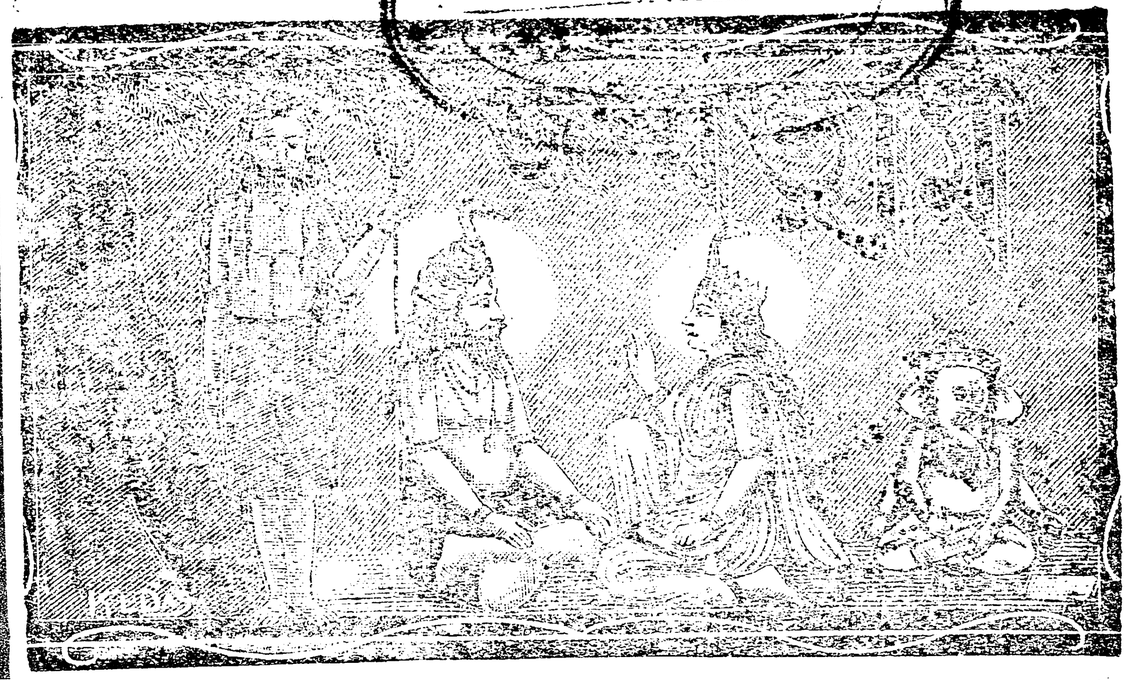

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, পৌষ | ৯ম সংখ্যা

ব্যবসা বা কারবার।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

আমরা অনেকেই মনে মনে কারবার বা ব্যবসা করিবার বাসনা করি, কিন্তু কারবার করিতে হইলে, প্রথমে কি কি প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি না। কোন বিষয়ের কোন সন্ধান না রাখিয়া সাধারণ লোকের প্রস্তাব অনুমোদন বা সমর্থন করিয়াও সময়ে সময়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাই। সাধারণতঃ আমাদের মনের ধারণা ও ভ্রমসঙ্কুল বিশ্বাস এই যে, সকলে যাহা করে ও পারে আমরা তাহা করিব না বা পারিব না কেন? সকলে সকল কার্য্য করিতেছে, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আমরা মানুষ, আমরা কেন তাহা পারিব না? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। কথাগুলি বলিতে ভাল ও শ্রুতিমধুর কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ

আমরা অনেক সময় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকি, দেশের কি শোচনীয় অবস্থা, দেশের লোকের মতিগতি কারবারের দিকে না যাওয়ায় দেশের ঘোরতর অবনতি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রতিকারকল্পে কেহই মনোযোগী নহেন. এইরূপ বিষয় পরস্পর আলোচনা করিয়া থাকি, প্রকাশ্য স্থানে জন সাধারণের নিকট বক্তৃতা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার পরিণতি ঐ আলোচনা বক্তৃতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কার্য্য হয় না।

কেন এমন হয়, কিসে এমন হয়, একথা কেহ স্থিরচিত্তে ধীরমনে নির্জ্জনে অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন কি? অথবা তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন কি? যদি কেহ করিয়া থাকেন তাহার সংখ্যা খুব কম। কম হউক, যদি সেই কম সংখ্যকের দৃষ্টান্ত অপরকে সম্যক্‌রূপে দেখান যায় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সেই সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশা করা যায়, কতদিনে বা কি পরিমাণে তাহা সফল হইবে বলা যায় না।

আমাদের মধ্যে একটা মজ্জাগত দোষ জন্মিয়াছে এই যে, না জানিয়া, না বুঝিয়া সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে আমরা বিশেষ পটু হইয়াছি। জানি, না জানি, বুঝি, না বুঝি, একটা লম্বা চওড়া সমালোচনা করিয়া বসি।

এই দোষ যত দিন পর্য্যন্ত না পরিহার করিতে পারিব ততদিন আমরা প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। এক সময়ে অনেক বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে কোনটাই সমাধান হয় না. ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং যে কোন প্রসঙ্গ করিতে হইবে তাহা সংযত হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া সমাধানের প্রয়াস পাইতে হইবে, তবে সেই সঙ্গত প্রয়াস পরিণামে ফলবতী হইবে।

ব্যবসা, বাণিজ্য বা কারবার সমস্তই একার্থবোধক শব্দ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই প্রবন্ধে সময় সময় কারবার বাণিজ্য বা ব্যবসা কথা প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হইবে না, কারণ সকল কথাগুলি এক অর্থে ব্যবহার করা হইবে।

ব্যবসা করিবার বাসনা আছে—অর্থ নাই, কারবার শিখিবার ইচ্ছা আছে, শিক্ষালয় নাই, যাহার অর্থ আছে তাহার কারবার করিতে বাসনা নাই! এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অসুবিধা ও অন্তরায় থাকায়, আমাদের দেশে, লোকের সুবিধাজনক কারবার করিবার সুযোগ সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। যদি কেহ কিছু অর্থ লইয়া কারবার করেন, অনভিজ্ঞতার জন্য অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিবার শক্তি না থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ হতাশ

ও আক্ষেপে কাটাইয়া থাকেন। যাহারা একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া লোক সানের গুরুভার বহন করিয়া জীবন সংগ্রাম করেন এবং প্রাণপাত করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য্য করেন তাঁহারাই শেষে জয়শ্রী লাভ করেন এবং কারবারে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজ সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান ও দশজন লোককে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হন। কারবারে উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি সাধন অনায়াস লভ্য জিনিষ নহে, ইহা মহা কঠোর সাধনা।

একজন ব্যবসায় উন্নতিলাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন দেখিয়া ঈর্ষাপরতন্ত্র হইলে জীবনে তিনি কখনও কোন উন্নতিকর কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না। ঈর্ষা বা হিংসা অতিশয় ক্ষতিজনক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি যাঁহার যত কম, তাঁহার উন্নতি তত বেশী হইবে। এই প্রবৃত্তি যাঁহার যত বেশী তাঁহার তত অবনতি হইবে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের একজন লোক কোন কারবার করিলে, তাহার পার্শ্বেই অপর একজন ঠিক সেই কারবার করিয়া নিজের ও অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। পরিণামে উভয়ের কারবারই অচল হইয়া পড়ে।

সহসা কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, আগে মনস্থির পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিবার বাসনা স্থির করিয়া, তাহার পন্থা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, কিছুদিন সেই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখিয়া, তাহা হইতে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পরে সে কার্য্যে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রয়োজনানুযায়ী কার্য্য ধীরে ধীরে করিলে ভবিষ্যতে সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা করিতে হইলে মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় করা উচিত, যে সে কথায় বা যাহার তাহার কথায় টলিলে চলিবে না। অটল অচল ভাবে নিজ গন্তব্য পথে যাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে একটী উর্দ্দু প্রবাদবচন উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"হিম্মতে মর্‌দা মদতে খোদা" অর্থাৎ মানুষ সৎসাহস করিলে, ভগবান তাহাকে অভীপ্সিত কার্য্যে সাহায্য করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্পের উল্লেখ করিতেছি :—

একজন ফকির সাহেব একদিন কোন স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেওয়ালের উপর উল্লিখিত প্রবাদ বচনটী দেখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা কি ঠিক্? যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে জানিব ভগবান সত্য। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে জানিব সব মিথ্যা। ফকির সাহেব তৎক্ষণাৎ হিম্মত করিলেন

যে, নবাবের কন্যার সহিত বিবাহ করিবেন, এই বাসনা দৃঢ়তার সহিত মনে মনে চিন্তা করিয়া নবাবের নিকট যাইয়া গোপনে নিজভাব জানাইলেন। নবাব একথা শুনিয়া অবশ্য মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে ফকির সাহেবকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিয়া বলিলেন, "অন্দরমহল হইতে বেগমের ও কন্যার মত না জানিয়া আপনাকে শেষ কথা বলিতে পারি না— অতএব আপনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন।" ফকির সাহেব তথাস্তু বলিয়া সম্মতি দিলেন। নবাব বাহাদুর অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার কন্যা মনে মনে পণ করিয়াছেন, যিনি এক সময়ে সাতটী হাতী যাহা বহন করিতে পারে, তদুপযোগী রত্ন আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনি তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।" ফকির সাহেব এই কথা শুনিবামাত্র উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হিম্মতে মর্দা মদতে খোদা" এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমি সামান্য ফকির, সাতহাতী বহনোপযোগী রত্ন আমি কোথায় পাইব? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, সমুদ্রের নাম রত্নাকর, অতএব সমুদ্রের সিকট নিজ মন্তব্য জ্ঞাপন করিব। সমুদ্রের নিকট যাইয়া গভীর মনঃসংযোগসহকারে একমনে এক ধ্যানে দিবাত্রয় অতিবাহিত করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে একটী মৃৎকলসি লইয়া সমুদ্রের জল উত্তোলন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহকাল সমুদ্রের জল উত্তোলন করিয়া অবসন্ন না হইয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহের সহিত জল উত্তোলন করিতেছেন, হঠাৎ একদিন মানববেশ ধারণ পূর্ব্বক ভগবান আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফকির সাহেব! কি হইতেছে?" ফকির সাহেব বলিলেন, "আপনি কে?" ভগবান বলিলেন, "আমি পথিক।" ফকির সাহেব বলিলেন, "আমার উদ্দেশ্য জানিয়া আপনার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?" ভগবান বলিলেন, "যদি কোন উপকার করিতে পারি, যদি কোন যুক্তি বলিতে পারি, অবশ্য বলিব।"

এই কথা শুনিয়া ফকির সাহেব আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিলেন, ভগবান বলিলেন "আপনি যাহা করিতেছেন, তাহাতে এক জন্মে কেন, বহু জন্মেও জলশোষণ করিয়া রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, তবে আপনার কষ্ট দেখিয়া আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছি, তাই বলিতেছি এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে কোন এক নিভৃত জঙ্গলে প্রচুর রত্নস্তূপ আছে, তথায় যাইয়া অভিলসিত রত্ন গ্রহণ করিতে পারেন।" উত্তরে ফকির সাহেব বলিলেন, "যদি এতটা

উপকার করিয়া যুক্তি দিলেন, তাহা হইলে একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্থানটী দেখাইয়া দিলে আপনার সহিত চিরমিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হই। আমি একাকী যাইলে যদি স্থানটী নির্ণয় করিতে না পারি, তাহা হইলে যাতায়াত পণ্ডশ্রম হইবে, অথচ সে সময়ের মধ্যে আমি অনেক কলসী জল তুলিয়া ফেলিতে পারিব।" "হিম্মতে মর্দা মদতে খোদা" ফকির সাহেব তন্ময় হইয়া এই কথা বলিতেছিলেন। ভগবান তৎক্ষণাৎ ফকির সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপনীত হইলেন। ফকির সাহেব স্থানটী দেখিয়া চমৎকৃত, পুলকিত ও স্তব্ধ হইলেন। জীবনে যাহা কখনও চিন্তা করেন নাই ও দেখেন নাই, সেই অসামান্য অনন্ত রত্নস্তূপ একস্থানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একমনে একধ্যানে বলিতে লাগিলেন, "ভগবান! তুমিই সত্য" "হিম্মতে মর্দা মদতে খোদা সত্য"। এই কথা বলিবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, তথায় আর কেহ নাই, হঠাৎ হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে নবাবের প্রাসাদে যাইয়া নবাব বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনার হাতীশালে যত হাতী আছে, আমার সঙ্গে প্রেরণ করুন, আমি রত্ন আনিয়া দিতেছি।" নবাব বলিলেন "সাত হাতীর কথা আছে, অগ্রে সাতটী হাতী লইয়া যান"। তদনুযায়ী ফকির প্রস্থান করিলেন, এবং রত্নসহ যখন পুনরায় নবাবপ্রাসাদে উগনীত হইলেন, নবাব রত্ন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ রত্ন আপনি কোথায় পাইলেন? আমার ভাণ্ডারে ইহার সদৃশ একটীও রত্ন নাই। আপনার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি নাই।" ফকির সাহেব মৃদু মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন, "হিম্মতে মর্দা মদতে খোদা" একটা কথার পরীক্ষার জন্য আমি এতটা করিয়াছি॥ আমি ফকির লোক, আমার বিবাহের কোন প্রয়োজন নাই। আপনি এই সমস্ত রত্ন কন্যাকে প্রদান করুন এবং যেখানে আপনার কন্যার বিবাহ দিবার অভিরুচি হয় বিবাহ দিউন, আমার কোন আপত্তি নাই।" এই বলিয়া ফকির সাহেব প্রস্থান করিলেন।

কথায় কথায় গল্পে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়াছি, অবশ্য গল্পটী কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রদ তাহার ভুল নাই। ফকিরের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত একমনে কার্য্য করিলে ও উৎসাহ ভঙ্গ না করিলে অবশ্যই মঙ্গলময় ভগবান মানবের অভীপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সাহস শূন্য হইলে মানুষ জীবন্তে মৃতবৎ, তাহার কোন ভুল নাই, যাহার আশা আছে, অথচ সাহস নাই, তাহার আশা কখনও পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় না। অতএব কারবার বা ব্যবসা তুচ্ছ জিনিষ নহে, সাধনার জিনিস, সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে কারবার সম্বন্ধে শিক্ষা করিবার বিশেষ কিছুই নাই, ইহাই অনেক লোকের অভিমত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একজন অল্পবয়স্ক বালকের নিকট একজন অশীতিপর বৃদ্ধ শিক্ষা করিতে পারেন এমন অনেক বিষয় আছে। এ জগতে একজন লোক সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ একথা বলিলে ভুল বলা হয়। আজীবন শিক্ষা করিলেও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তর শিক্ষা করিবার বাকী থাকে, বোধ হয় মানুষ লক্ষাংশের এক অংশও একজীবনে শিখিতে সমর্থ নহেন। তাই বলিতেছিলাম, অহমিকা ত্যাগ না করিলে, দাম্ভিকতা ত্যাগ করিতে না পারিলে প্রকৃত ব্যবসায়ী হইতে পারা যায় না। সকলকে সাদরে গ্রহণ, সকলের সহিত সরল ব্যবহার, শিষ্টালাপ প্রভৃতি কারবারী লোকের বিশেষ গুণ। কারবারী লোকের মনে হামবড়া ভাব কখনই স্থান পাইবে না, কারণ দুনিয়ার ভাব দেখিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া সে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে।

জমি প্রস্তুত না হইলে তাহাতে যেমন কোন ফসলই প্রচুর পরিমাণে জন্মে না, সেইরূপ কারবারের জমী প্রস্তুত করিতে না পারিলে তাহাতে কোন সফলতা লাভ করিবার আশা করা যায় না।

কারবার করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কিছুদিন কারবারী লোকের সঙ্গে থাকিয়া কার্য্যের প্রণালী ও পদ্ধতি শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঠকিবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

অর্থ, বুদ্ধি ও উৎসাহ এই তিনের সমবায়ে কারবারের ভিত্তি দৃঢ় হয়। এই তিনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, তাঁহার উন্নতি অনিবার্য্য। ধৈর্য্য, সততা ও একাগ্রতা কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, প্রতারণা, হিংসা ও অমনোযোগীতা কার্য্যের ঘোর শত্রু, এই সকল পরীক্ষিত সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদের কার্য্যে কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি হইবে না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি না থাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য চলিতেই পারে না। যদিও কিছু দিন চলে, স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ জগতে যাহা কিছু আছে বা থাকিবে, তাহাতে অধিকারী ভেদে প্রত্যেকের কিছু না কিছু অংশ আছে। আমি যাহা উপার্জ্জন করিতেছি, তাহাতে ষোলআনা আমার অধিকার কৈ? যাহার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, তাহাকে সেটুকু না দিয়া সাধ্য কি আমি সমস্ত লইয়া যাই। তাহাই যদি প্রকৃত হয়, ঠিক হয়, যথার্থ হয়, একটু চিন্তা করিয়া

দেখিবার বিষয় নয় কি, যে এদেশে তবে কেন যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। কেন করে না তাহার উত্তর এক কথায় দিবার ভাষা নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই। এ প্রসঙ্গে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব, তবে সকলের মনোমত হইবে কি না জানি না।

প্রথম কথা, আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, যদিও করি তাহা মৌখিক, আন্তরিক নহে। প্রকৃত অন্তরের সহিত বিশ্বাস করা স্বতন্ত্র, বাহ্যিক লোক দেখান বিশ্বাস করা স্বতন্ত্র। বুঝিবার বিষয় এই যে, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিলে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করা হয়। কথাটা বলিতে যত সহজ, বুঝিতে ততটা নয়। বুঝাইতে এত কঠিন যে লোক বুঝিয়াও অনেক সময় বুঝেনা। সুতরাং তাহার উপর কি কথা থাকিতে পারে? এখন আসল কথা এই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদের দেশে যৌথকারবার চলা একেবারে অসম্ভব, কারণ কেহ বিশ্বাসী লোক নাই, সকলেই প্রতারক শ্রেণীভুক্ত। একটু অনুশীলন করিয়া দেখিলে এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যৌথকারবার জিনিষটা কি? দশজন কিম্বা একশত জন কিম্বা সহস্র জন কিম্বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত ভাবে টাকা দিয়া কার্য্য করার নাম যৌথকারবার। পাশ্চাত্য প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ কারবারই এইভাবে চলিতেছে। এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এই ভাবের কারবার বিস্তর চলিতেছে ও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ হইতেছে এবং বিস্তর লোক প্রতিপালন হইতেছে; কিন্তু যৌথকারবার নাই—এই পোড়া বাঙ্গালা দেশে। এখানে ইহা একরকম আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ যেমন অসম্ভব ও অলীক, যৌথকারবারও এখানে তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। কেন এমন হইয়াছে, কিসে এরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েকটী যৌথকারবার আরম্ভ করিয়া তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া লোকের মনে একটা আতঙ্ক বা বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত সেই ছায়া অপসারিত না হইবে, ততদিন আমাদের দেশে যৌথকাররার আকাশ-কুসুমবৎ থাকিয়া যাইবে। জগতের ইতিহাস যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে কোন দেশে প্রথমে যে কোন যৌথকারবার হইয়াছে তাহাই প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, অনেক কারবার অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে, সাধারণের অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছে, অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা পুঞ্জ পুঞ্জ

ভাবে অনুষ্ঠিত ও সংঘটিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে অনেক দিনে সেই সকল ভাব অপনীত হইয়া সুন্দরভাবে যৌথকারবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রচুর ধনাগম হইয়া দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে ও হইতেছে, ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুবাইলে কেমন করিয়া যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশা পোষণ করিতে পারা যাইবে।

অনেক সময়ে আমরা আমাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিয়া থাকি, "আরে যাও যাও ও কথা ভুলে যাও, ও কথা মুখে এনোনা। আমার দেখ্‌তা কতগুলো হলো, কতগুলো গেল, হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমাদের মধ্যে সব নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতক, আমাদের দেশের লোকের মুখে ছাই, আমাদের দেশের লোক কোন জন্মেও উন্নতি করিতে পারিবে না। এই আমি কত কষ্টে চাকরি করিয়া দশ টাকা রোজকার করিয়া দুই তিন জায়গায় একশত টাকার সেয়ার কিনিয়াছিলাম, শেষে একটা পয়সাও পেলাম না, আমার মত কত লোকেয় মুখে ছাই পড়িয়াছে। এইতো দেশের অবস্থা। ইহার উপর বাবুরা যৌথকারবার বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন।" এই রকম সমালোচনা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষান্তরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সেই সকল লোক বাজে কাজে আমোদ আহ্লাদে বৎসরে দুই তিন শত টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া কোন দিনের জন্য ভুলিয়া অনুতাপ করেন না। মনে করুন, কারবার করিতে যাইয়া পাঁচ জন লোক লইয়া কার্য্য করিতেছেন, যদি তাহার মধ্যে দুইজন অসৎলোক থাকে এবং তাহাদের দ্বারা কারবারের হানি বা অনিষ্ট হয় তাহা হইলে কি বলিতে হইবে দুনিয়ার সমস্ত লোক খারাপ, দুনিয়ায় যৌথকারবার অসম্ভব? এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতটা সঙ্গত ও সমীচীন তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় নয় কি?

আরও ভাবিবার বিষয় এই যে, যখন যৌথকারবার আরম্ভ হইয়াছে এবং আমি একজন তাহার অংশীদার তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি প্রণালীতে চলিতেছে তাহার সংবাদ রাখিয়া এখানকার কোন্ দোষে তাহা চলিতেছে না তাহার অনুসন্ধান করিতে কি কোন দোষ আছে? কেহ নিষেধ করিয়াছে কি? সে কথার উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিবেন আমার সময় নাই। আমি দেখি কেমন করিয়া? যদি দেখিবার বা বুঝিবার সময় নাই, তবে ভিত্তিশূন্য কথার উপর নিজ মন্তব্য ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়া পাণ্ডিত্য না দেখাইলে ভাল হয়, দেশের অদ্ভুত লোকের অপূর্ব্ব সমালোচনা এরূপ দোষ সংশোধন করিবার উপায় উদ্ভাবন

চেষ্টা কাহারও নাই। কি করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার প্রতি যদি আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি পতিত হইত তাহা হইলে এতদিন দেশের উন্নতির গতি অন্যদিকে ফিরিত। সকলেই যদি বক্তা তবে শুনিবে কাহারা? সকলেই যদি উপদেষ্টা হয় তবে উপদেশ পালন করিবে কাহারা? আমাদের দেশে অনেকেই কর্ত্তা সাজিতেছেন, কর্ত্তা সাজিবার যোগ্যতা থাক্ বা না থাক, কর্ত্তা সাজিয়াই খুসী। কর্ত্তা সাজা যে কত কঠিন তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁহারা কর্ত্তা সাজিয়া বড় বড় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়া আসিতেছেন তাঁহারাই বুঝেন। প্রথমে যিনি যে কার্য্যে কর্ত্তা হইবেন তাহার সেই কার্য্যে কতটা যোগ্যতা আছে তাহার বিচার করা প্রয়োজন। একটা লম্বা চওড়া খেতাব বিশিষ্ট লোক হইলেই যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নয়। অনেক সময়ে অনেক ধনশালী ব্যক্তিকে কার্য্যে কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য পণ্ড হইয়াছে। একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। ধনশালী ব্যক্তি হইলেই যোগ্য হইবেন ইহার কোন অর্থ নাই। পক্ষান্তরে অনেক ধনশালী ব্যক্তি সচরাচর অলস, অপটু ও বিলাসী সুতরাং তাহাদের দ্বারা একটা কারবারের কর্ত্তৃত্বে সমাধানের আশা করা অন্যায়। এই রূপ ভাবে কর্ত্তা নির্ব্বাচনের দোষে অনেক কারবার অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে যৌথকারবারের মূলে এই সকল দোষ ছিল বলিয়া অনেক কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এখন লোক অনেকটা ঠেকিয়া ও ঠকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। শিখিবার প্রকৃত স্থান না থাকায় লোক ঠকিয়া শিখিয়াছে, ইহাও মন্দের ভাল। এইরূপ ঠকিতে ঠকিতে এমন একদিন আসিবে যেদিন এই দেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দেশের ও দশের অশেষ মঙ্গল বিধান করিবে। আমাদের দেশে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও যশোহর লোন কোম্পানীর কার্য্য বিশেষ আদর্শ ও অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কোম্পানীর কার্য্য কতিপয় ভদ্রমহোদয় একত্রিত হইয়া অল্প টাকায় আরম্ভ করেন, এখন মূলধন অনেকগুণ বেশী হইয়া সুন্দরভাবে কার্য্য চলিতেছে; সুতরাং কর্ত্তা ঠিক হইলে কার্য্য ঠিক চলে, নতুবা গোড়ায় গলদ হইলে কোন কার্য্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। যদি কর্ত্তা দোষী সাব্যস্ত হয় তাহাকে তখনি অপসর দিয়া অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ বা নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যের প্রণালী ও পদ্ধতি প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্য চালাইলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

খাতিরে কোন কার্য্য হয় না ও করা হইবে না ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

আমাদের দেশে খাতির ও অভিমানে অনেক কার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে, এই সকল কথা ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে বা আলোচনা করিলে চলিবে না। নিবিষ্ট মনে স্থির ও ধীরভাবে চিন্তা করিলে প্রকৃত সদুত্তর আপনি আসিয়া পড়িবে।

যৌথকারবার ব্যতীত কোন দেশ কোনকালে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না। একজন লোক দশজন লোক, বিশজন লোক ধনী হইলে তাহারা যে কার্য্য করিয়া লাভ করিবেন তাহা তাহাদেরই থাকিবে অপর কেহ সে কার্য্যের লভ্যাংশ হইতে কিছু পাইবে না, কিন্তু সহস্র জন কিম্বা দশসহস্র জন মিলিত হইয়া মূলধন সংগ্রহ করিলে তদ্দ্বারা যে কার্য্য হইবে তাহা ব্যক্তিগত ধনীর অপেক্ষা অনেক বিশাল আকারের কার্য্য হইবে অথচ বিস্তর লোক লাভবান হইবেন, ক্ষতি হইলে তুলনায় খুব কম ক্ষতি হইবে কিন্তু একজন ধনীর যদি বেশী পরিমাণে ক্ষতি হয় তাহা হইলে তাহা পূরণ করা কঠিন হয় ও পরিণামে কারবার বিলুপ্ত হইয়া যায়। আরও চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, একজন লোক যাহা কারবারে দিতে সমর্থ হয়, দশ সহস্র লোক মিলিত হইয়া কারবারে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ অথচ সকলকে অল্পপরিমাণে টাকা দিতে হইবে। সে টাকা কার্য্যে ক্ষতি হইলে বা নষ্ট হইলে কাহারো ধ্বংশ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এইরূপ দশটী কিম্বা পনরটী যৌথকারবারে যদি কোন ব্যক্তির ন্যূনকল্পে একশত টকা হিসাবে অংশ থাকে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার উন্নতি হইবার বিশেষ আশা করা যায়। এক দিন বা এক মাসে সমস্ত কারবায় নষ্ট হইবার কল্পনা যদি করা হয় তাহা হইলে অবশ্য সামান্য ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। এইরূপ মনে কয়া ঠিক বাড়ীর মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় রজনীযোগে কড়িকাষ্ঠ চাপা পড়িয়া মৃত্যু হওয়ার কল্পনার ন্যায় নয় কি? তাই বলিতেছিলাম বুঝিয়া, চিন্তা ও যুক্তি পূর্ব্বক কার্য্য করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে, অথচ দেশবাসী ক্রমেই কারবারের বিশালক্ষেত্রে উপনীত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির সুপ্রসস্ত পথে অগ্রসর হইতে পারেন। তখন দেশের জাতীয় অর্থের পরিমাণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে সকলেই উৎফুল্লভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন, কারবারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে বিস্তীর্ণতা লাভ করিবে।

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌরব রাজসভা।

(ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, বিকর্ণ, প্রতিকামী, বাহ্লিক ও সভাসদ্‌গণ।)

ধৃতরাষ্ট্র। (স্বগত)
আজ্ঞা মোর যুধিষ্ঠির করেনা হেলন।
(প্রকাশ্যে)
হে সৌবল! আসিবে কি পাণ্ডুপুত্রগণ?
মোর মনে লয়, করিল সংশয় পাছে।
নহে, বহুক্ষণ বিদুর গিয়াছে, কই—
সেত এবে না ফিরিল?

শকুনি। ভাবি তাই,
বিদুরে পাঠায়ে রাজা, না করিলা ভাল,
কি জানি—কি কহে?

দুর্য্যোধন। পিতঃ! জানি চিরকাল
ক্ষত্তা সদা পাণ্ডুপুত্রে হিত চায়, তবু
কেন পাঠাইলা তায়—ছিল অন্য জন।

ধৃত। পুত্র! বিদুরে না দোষ অকারণ, জেন—
আজ্ঞা মম করিবে পালন, পাণ্ডুপুত্রে
ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে সেতো গিয়া আনিয়াছে।

সাধুবুদ্ধি বিদুর ; পাশায় ভাগ্যে হয়
জয়পরাজয়—এ কথা সত্য সে মানে,
মাত্র ভয় গণে পাছে সত্য বাধে রণ।

দুর্য্যোধন। সেকি পিতঃ! সভামাঝে রবে সভ্যগণ,
যে হারিবে দিবে সেই জন, ধর্ম্মমতে
শ্রেয়ঃ সদা সংগ্রাম পাশার, নাহি তায়
অস্ত্র শস্ত্র ঝনৎকার, ধনুক টঙ্কার—
ব্যূহের কৌশল, বাহুবল, রক্তপাত,
হৃদি বিদারক হাহাকার, অধিকন্তু
অবিবাদে দৈবের বিচার, ভাগ্যফল
প্রত্যক্ষ প্রচার পাশার প্রবন্ধে হয় ;
কে তায় করিবে অস্বীকার ? তবে যদি
বাহুবলে করিবে লঙ্ঘন সত্যপণ,—
সভ্যগণ মীমাংসিবে, নহে কে সহিবে,
অন্যথায় তখনি হইবে প্রতীকার ;
ক্ষত্রিয়ে পাশার পণ হারিয়ে না দিল,
শুনিনি কখন। সখা হে! কি কহ তুমি ?

কর্ণ। সত্য যে না রাখে, তার সম কেবা হেয় ?
হেন জন বধে নাহি পাপ ; জেনো সখা,
এই দেহ, যাহা হ'তে প্রিয় কেহ নয়,
সত্য লাগি কাটি তাহা দেয় সাধুজন।

দুর্য্যোধন। তবে কুন্তীর নন্দন ধর্ম্মরাজ যিনি,
কি বিচার তাঁর নাহি জানি, মুনি-বৃত্তি
স্বতঃই শোভন হয় যুধিষ্ঠির।

দুঃশাসন। দাদা!
দেখেছ ভীমেরে, বাহুবল অহঙ্কারে
যেন না দেখে নয়নে কা'রে।

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন!
হাঁরে ভাই! তোর কতই অধিক তাপ
তারে ; যদি পাশা হয় প্রবর্ত্তন, দৈব মানি!

কর্ণ। সখা! নাহি জানি পূর্ব্বে কবে এই পাশা—
ক্ষত্র-ধর্ম্ম ব্যবহারে হইল গণিত।

দুর্য্যোধন। জনশ্রুতি সীমার অতীত।

শকুনি। অঙ্গরাজ!
না হও বিস্মিত, আদি সত্যে কৃতযুগে
এই পাশা ক্ষত্রিয়ে খেলিত পরস্পর,
পরীক্ষিত দৈববল অদৃষ্টলিখন—
চক্রবর্ত্তী নৃপতি কিবা সে ক্ষুদ্রজন।

কর্ণ। বুঝিলাম পাশার রচন কিসে হ'ল।
সত্যে বহু রাজা নাহি ছিল, কেহ এক
সার্ব্বভৌম—অন্য সব তাহার অধীন!
কোন এক মহাবীর সমযোগ্য তার
মিলিত না, শান্তবৃত্তি বিবাদ ছিলনা,
মিটিত না ক্ষত্রিয়ের রণ কণ্ডুয়ণ!
পাশার প্রবন্ধে দ্বন্দ্ব মৃগয়া ভ্রমণ
প্রথা সেই তরে, কিন্তু আজি এ দ্বাপরে
অক্ষ ছল কিবা প্রয়োজন ? চিরদিন
সাধ মনে যোগ্য অরি সনে হয় রণ ;
শিক্ষা বল বিক্রম পরীক্ষা করি দেখি,
শত্রু অপমান হৃদে ভরি রাখি সখে!
কহ, কেন সহ নিত্য অসহ্য দাহন ?

ভীষ্ম। শুননি কি দুর্য্যোধন! এই পাশা হ'তে,
সেই দিন বলদেব হাতে দ্বারকায়
ভীষ্মক-নন্দন রুক্মি, কৃষ্ণের শ্যালক,
হ'ল হত ? কে জানিত অক্ষে হবে এত ?

দুর্য্যোধন। পিতামহ! তোমা আদি আচার্য্যের ক্রমে
সভ্যগণে উপস্থিত থাকিতে বিরোধ
নাহিক হবে, যে হারিবে দিবে সেইজন।
সভ্যাসত্য বিচারিবে অক্ষাভিজ্ঞগণ।

শকুনি। হের, ক্ষত্তা হোথা আগত বিষণ্ণ মন!

দুর্য্যোধন। একাকী! (বিদুরের প্রবেশ)
হে পিতঃ! সত্য কহিনু তখন।

ধৃত। বিদুর! একাকী কেন? পাণ্ডুর নন্দন
যুধিষ্ঠির কি কহিল? খেলিবে কি পাশা?

বিদুর। খেলা স্থির পাইলাম, ভায়া—তব আজ্ঞা
পাণ্ডব প্রধান কভু করে না লঙ্ঘন।

ধৃত। কোথা সবে.—তবে কালব্যাজ কি কারণ?

বিদুর। মহারাজ! তব আশ্চর্য্য উৎসাহ আজ
পাশার সংগ্রামে হেরি হৃদে ডরি! কহি,
অশুভ নিমিত্তে কেন কর আবাহন?
উপস্থিত সভায় পাণ্ডব পঞ্চজন।

(পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ)

যুধি। পিতামহ! ভাগ্য মম, হেরিলাম তোমা
আচার্য্যের সনে হেথা। লহ দোঁহে মোর
প্রণতি রাজীব-পদে! জ্যেষ্ঠতাত দেব!
তব ও চরণ যুগল বন্দিছে পাণ্ডব
পঞ্চজন, কোন আজ্ঞা করিব পালন?

ধৃত। বৎস! যেন তোমা পঞ্চজন, তেন দুর্য্যোধন
ক্রীড়া সুখে করহ বঞ্চন সবে মিলে,
তা' হলে পরম প্রীতি পাই বাপু মনে।

যুধি। সেই আজ্ঞা তব দেব! পালিব যতনে!
ভাই দুর্য্যোধন! আর যত ভ্রাতৃগণ—
সমাগত সভ্যগণ! লও যোগ্য আমন্ত্রণ!

দুর্য্যো। ধর্ম্মরাজ! সিংহাসন করুন গ্রহণ!

শকুনি। শুনি, ধর্ম্মরাজ নাকি পাশার ক্রীড়ায়
আশ্চর্য্য নৈপুণ্য তব, নাহি পরাভব
কহে হেন অক্ষাভিজ্ঞগণে; মনে আছে
সাধ বহু দিন হ'তে, কভু তব সাথে
সত্য পণে খেলিব দেখন; ক্ষত্রধর্ম্ম

জানি তাহে বহুশ্রমে করিনু সাধন,
সভামাঝে দেহ আজি পাশার সমর।

যুধিষ্ঠির। মাতুল! এ দুরোদর অমঙ্গলকর—
সদা কহে সাধুজনে, কেবল বাখানে
কপটী যে, বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়ে কদাপি
পাশায় না চাহে খ্যাতি, অনীতি প্রসূত
যেই কর্ম্ম মম ধর্ম্ম স্বতঃ ত্যজি তায়।

শকুনি। কিন্তু ক্ষত্র ধর্ম্ম অক্ষ,—
শাস্ত্র দেয় সায়, মতান্তর নাহি তাহে
কহে মুনিগণ! সুবুদ্ধি রচন সেই
বুদ্ধি পরীক্ষায়, বৃদ্ধ সম নাহি তায়
ক্ষুদ্র হীনজন, হয়ত যবন করে
সমান প্রহার; বুঝি মর্ম্ম তার বহু
শ্রমে ক'রেছি সাধন বিদ্যা, এস দোঁহে
অক্ষ রণে পশি।

যুধিষ্ঠির। হে মাতুল! পাশার ক্রীড়ার করি জয়
হয় যে আনন্দ তাহে নহি অভিলাষী,
সদা থাকি সুখী গুরু ব্রাহ্মণ সেবায়—
পুত্র সম পালিয়া প্রজায়, জ্ঞাতি বন্ধু
কুটুম্ব স্বগণ সর্ব্বে রত্ন ধনে তুষি,
হেরিতে প্রয়াশী সবে সম সুখী হয়;
বিগ্রহ প্রয়াসী কদা নহি নিষ্কারণে—
বিগ্রহ প্রসবে যেই বিদ্যা হে মাতুল!
বৃথায় বরিলা তায়।

শকুনি। যদি হয় ভয়, যাও নিজস্থানে।
ক্ষত্রিয়ে জানে যে অক্ষ স্বধর্ম্ম বলিয়া,
তেঁই যথা নীতি পালি তাহা; বুদ্ধিমানে
মাত্র জানে অক্ষ শুধু বুদ্ধির কৌশল,
যুদ্ধ পশুবল; কিন্তু কি ফল বিতর্কে?
বৈরাগ্য ধর্ম্মেতে বাপু, তোমায় বাখানি।
ক্ষত্রধর্ম্ম পালে অন্যজনা।

যুধিষ্ঠির। হে মাতুল !
প্রগল্‌ভতা কেন কর অকারণ ? জেন
বাক্য মম টলেনা কখন — গুরু আজ্ঞা
করিব পালন আজি খেলিব সে পাশা
আবাহন কৈলা যবে ; কিন্তু জানে সবে
সত্যপণ যুদ্ধে কিম্বা অক্ষে সে আমার—
তোমার সহিত পাশা খেলিব কেমনে ?
অব্যয় অসংখ্য ধন যা আছে ভাণ্ডারে
কিবা সে চারি সাগরে কেমনে পূরণ
করিবে মাতুল ! তাহা ?

দুর্য্যো। আমি দিব ধরি মম মাতুল হারিবে
যাহা, পণ তরে না হইবে ব্যত্যয়ন।

যুধি। ভাল হে মাতুল ! তবে লও সারি করে।

শকুনি। বাপু ! দেখ পাশা বারেক পরীক্ষা ক'রে।

যুধি। অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ! হে মাতুল হও ত্বরা।
লহ অক্ষসারি, অগ্রে আমি করি পণ।

দুর্য্যো। ধর্ম্মরাজ মুখে অগ্রে শোভে সত্যপণ।

যুধি। ভাল, দুর্য্যোধন ! মম যত রত্নধন
ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব ভাণ্ডারে ধরে এবে,
যদি করি পণ—পারিবে কি তব দিতে,
কোথা তব এত ?

দুর্য্যো পূর্ব্বে করেছি গণন !
করিব পূরণ আমি চিন্তা কিবা তায় ?
কৌরব ভাণ্ডার আজিকার নহে, যথা
ভারতের সার রত্ন সমগ্র দ্বাপরে
নীরধারে ঢালিলা কৌরব রাজগণে—
হেরেনি নয়নে যাহা রাজেন্দ্র সমাজ !
অব্যাজে কর সে পণ কিবা তার ন্যূন,
ন্যূন না হইব আমি।

যুধি। সত্য পণ মম সেই, হে কৌরবস্বামি !
ফেল সারি তবে।

শকুনি। অগ্রে কহ স্থান তব !

যুধি। সত্য পণ, ভাল, সত্য যুগ মম স্থান।

শকুনি। দ্বাপর সে মোর ঘর পাণ্ডবপ্রধান !

যুধি। ফেল সারি মামা !

শকুনি ! হের, পাণ্ডবভাণ্ডার নহে তব আর—
কৌরবের অধিকার হইল এখন ;
করিবে কি আর পণ ?

যুধি। অক্ষাভিজ্ঞ হ'য়ে
কি কহ মাতুল মোরে ? খেলিনা কখন
এক পণ—নাহি ত্যজি অক্ষের নিয়ম।
এইবার পণ মোর যত অশ্বগণ
সহ শত সহস্র গন্ধর্ব্ব বাজীবর
চিত্রসেন দিল যাহা।

শকুনি। জিনিলাম তাহা !
ধর্ম্মরাজ ! হের পাশা দ্বাপরে অঙ্কিত।

যুধি। ভাল, পণ এবে মম, মাতঙ্গমণ্ডল—
সহ বৃষ গাভী উষ্ট্র খর মেষ, আর
যত পশুদল।

শকুনি। হের হস্তের কৌশল !
জিনিয়া লইনু তব সর্ব্ব পশুধন।
বাপু ! আছে আর কিছু করিবে যা পণ ?

যুধি। মম আছে সৈন্যবল ভুবনমণ্ডলজয়ী
চতুরঙ্গ দল অগণন, রাজসূয়
আয়োজন হ'ল যাহাদের বলশ্রমে।

শকুনি। ধর্ম্মরাজ ! সৈন্য তব লইলাম জিনে,
গেল সৈন্য, কিবা পণ ? আছে ধন আর ?

যুধি। হে মাতুল ! রাজ্যে মম সাগর প্রাকার,

মাঝে তার আছে যত ধন রত্নচয়—
শুল্ককররূপে, এইবার কৈনু পণ।

শকুনি। হের অক্ষ, জিনিল সকলি দুর্য্যোধন।
গেল সর্ব্বধন ; পণ কি রাখিবে আর ?

যুধি। আছে রাজ্য অসীম বিস্তার পাণ্ডবের,
রাজসূয়ে রাজধানী যার ইন্দ্রপ্রস্থ,
পৃথিবীস্থ ভূপতি আসিয়া কর দিল,
সহ সভা অতুলন মায়ার পুতুল
দৈত্য-শিল্পীময় রত্নে নির্ম্মাইল যাহা,
কেবল রহিল বাদ ব্রাহ্মণের ভূমি—
আর সর্ব্ব আমি এইবার কৈনু পণ।
ফেল পাশা !

শকুনি। বাপু ! গেল সকল ভরসা।
হের পাশা দ্বাপরে আবার, ধর্ম্মরাজ !
সত্যযুগ আসিবেনা আর। দুর্য্যোধন !
দেখিলা কি বুদ্ধি বড় ধন, পশুবলে
কিবা প্রয়োজন ? হ'ল একদণ্ড রণে
সাগরান্ত অবনী কৌরব অধিকার !

দুর্য্যো। ধন্য হে মাতুল ! তব ধন্য বুদ্ধিবল !

কর্ণ। হে গান্ধার ! ধন্য তব নৈপুণ্য কৌশল !

দুঃশা। গেল রাজ্য ধন, শত্রু হ'ল হীনবল।

বিদুর। কুরুগৃহে জ্বলিল অনল এতদিনে ;
নাহি শুন কাণে যত কহি, অন্ধরাজ,
রোগী যেন ঔষধ না খায় মৃত্যুকালে।
নহে, আজি কেমনে ভুলিলে, কহ শুনি,
পুত্র তব কোন্ জন ? লইয়া জনম,
স্মর মনে, খর রবে ডাকিল সঘনে।
হৈল শূন্যবাণী শুনি "কুরুকালরূপে
গান্ধারীকুমার—পূর্ণ কলি অবতার !"
রাজা ! কহিনু তখন ; পুত্র-স্নেহ মোহে

ভুলি, উপদেশ মম করিলা হেলন।
পতন সময় এই তার, হয় যথা
পুষ্প ধরি বেণু বৃক্ষ সবংশে সংহার !
হের সে পুত্র আচার ; ধনলোভী যথা
মণি লাগি ফণীশির ধরে, মধুলোভী
বৃক্ষে উঠি মক্ষিকা কামড়ে পড়ি মরে,
পুত্র তব পাশার বিজয়ে মত্তগতি,
নাহি ডরে পাণ্ডব সংহতি সাধে সাধে
পশিতে বিবাদে, পড়িলে যাহার ক্রোধে
নাহি রক্ষা ইন্দ্র আদি হইলে সহায়।
জ্ঞাতি হিংসা হয় নিজ পতন কারণ।
তব পুত্র সম দুর্বৃত্ত আছিল কংস,
সপ্ত বংশ জ্ঞাতিতে হিংসিল, কতজন
রাজ্য ত্যজি পলাইলা, তবে উগ্রসেন
জ্ঞাতিগণ সনে একান্ত মন্ত্রণা করি,
দুষ্টদর্পহারী শ্রীকৃষ্ণে নিমন্ত্রি আনি
কংসাসুরে করিলা সংহার। তেঁই কহি,
যদি ভদ্র চাও সবাকার, দেহ আজ্ঞা
ত্বরিত অর্জ্জুনে, নাগপাশে দুর্য্যোধনে
বন্ধনে রাখিতে ; তবে সে সম্প্রীতে রবে
আর পুত্রগণ তব রাজা !

ধৃত। বিদুর ! উপায় কিবা আছে আর ? কহ।

বিদুর। হায় !
এত দিনে স্বার্থ সিদ্ধ প্রায় ; রাজ্যলাভ
হইল পাশায়, হৃষ্ট তার আছ বুঝি ?
আজি তোমা হ'তে হল কুরুবংশক্ষয় !
আর না কহি তোমারে ; কিন্তু ক্ষম মোরে,
হে গাঙ্গেয় ! কৃপ ! দ্রোণ ! দেখিয়া না দেখ
কিবা শুনিয়া না শুন, একি বিড়ম্বনা !
হেন বুঝি সবে মিলে সত্যই ইচ্ছিলে,

পুড়িতে সে প্রচণ্ড পাণ্ডব-রোষানলে!
হায়! নহে নিস্পন্দ নিস্তব্ধ আছ বসে।
কুরুবংশ দাবানল জ্বলিছে সম্মুখে!
কহ সত্য, কে না জান এই শকুনিকে?
দুষ্টমন্ত্রী, কপট, শঠের চূড়ামণি!
জানি শুনি কালফণী কে আনিল ঘরে
কুরুবংশে করিবারে ছারখার? উঠ,
হে শকুনি! গৃহে যাও আপনার, তব
ভগ্নীস্নেহে কর মাত্র এই ভিক্ষা দান।

দুর্য্যো। কহ বহু, যেন এই ভব নিজস্থান;
অসতেরে যদি দাও মান, হয় তাহা
বিষের সমান আপনা দাহন তরে!
অন্তরে তোমার কৌরবের শত্রুহিত,
মুখে মাত্র ধৃতরাষ্ট্রপ্রীতি, জানি আমি
তব রীতি কপটতাময়, এ সভায়
না যুয়ায় বসিবারে, যাও তথাকারে
যথা ইচ্ছা; বৃদ্ধ বলি ক্ষমিনু অনেক;
নহে কহিলে যতেক, অন্য কেহ হ'লে
না রহে জীবন তার। ন্যায় কি অন্যায়,
বিচারিতে তায় তোমা কেহ না জিজ্ঞাসে!

বিদুর। কে রক্ষে তাহারে, সেই বদ্ধ কাল-পাশে?
তেঁই কোন কথা না কহি তোমারে; কিন্তু
হৃদয় বিদরে বৃদ্ধ অন্ধরাজ তরে,
ভাবি তার পরিণাম! সহি অপমান
জ্যেষ্ঠ মুখ চাহি; হা রে! নহে কভু রহি
যথা পাপ বিদ্যমান? হায়, ভগবান!
অবশেষে অন্ধের কি হবে গতি?

দুর্য্যো। হাঃ হাঃ ভাল!
সেই চিন্তা তুমি ভাল ত্যজত সম্প্রতি,
যুদ্ধ অক্ষ ক্ষত্র রীতি বুঝিবে ক্ষত্রিয়ে!

কর্ণ। একি সখা! কি কাজ নিষ্ফল বাক্যব্যয়ে?
(জনান্তিকে)
হের রঙ্গ, চলুক খেলন পুনর্ব্বার।

শকুনি। ধর্ম্মরাজ! রাজ্যধন করিলা সংহার,
আর কি করিবে পণ? চাহি স্থান এক
যথা পঞ্চজন, দারা পুত্র মাতা সনে
স্বাধীন করিবে বাস? কিম্বা যাবে বন?
দেখ ভাবি, আছে কিবা ধন! খেলিবে কি?

যুধি। হে মাতুল!
ডাকিলে খেলিব, ধর্ম্ম মোর আচরিব,
যাবত জীবন রবে। দেখি! এইবার
পণ নকুল দুর্ব্বার, বিপুল বিক্রমে
যার পরাজিত যত পশ্চিম দিক্‌পতি,
কর দিয়ে কৈল নতি রাজসূয় যজ্ঞে
ইন্দ্রপ্রস্থাসনে।

শকুনি। হের পাশা! হেন জনে লইলাম জিনে।

যুধি। পুনঃ প্রিয়তম সহদেব ভাই মম,
অনুপম সুদক্ষ সমরে কি শিবিরে,
নীতিধর্ম্ম জ্ঞানে রাখানে যারে জগতে,
এবার সারিতে হেন ধন কৈনু পণ।

শকুনি। দেখ, জিনিলাম এ হেন সুজন! ভাল,
যেই বৈমাত্রেয় হয়, কার্য্য মন্দ নয়
পাশায় হারিতে তারে—যায় পরে পরে।
কিন্তু তব সহোদর ভীম অর্জ্জুনেরে,
পণে রাখিবে না হেন লয় মোর মতি।

যুধি। রে দুর্ম্মতি!
ভ্রাতৃভেদ কথা কহ, না জানহ মনে,
আমাদের পঞ্চজনে এক প্রাণ; রে অজ্ঞান!
কি অভীষ্ট তব তায়?

শকুনি। বাপু! ক্ষমিবা আমায়,—

সহজে পাশায় মত্ত হয় স্থিরমতি
যেই জন ! অন্য মন না ছিল আমার !

যুধি। ভাল, ধনঞ্জয় পণ রহিল এবার,
তিনলোকে উপমা নাহিক তার, জিষ্ণু
ইন্দ্রাদিদিক্‌পালগণে, গরুড় বাসুকী
দৈত্য গন্ধর্ব্ব রাক্ষস সনে এক রথে
খাণ্ডবদাহনে পরাজিল ! ধনুহুলে
ধরিল ধরণী, নরলোকে নরোত্তম,
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন সে পাণ্ডবরক্ষণ ;
হেন জন পণযোগ্য নয় , করি পণ,
লঙ্ঘন তবু না করি কভু অক্ষবিধি।

শকুনি। হের পাশা ! জিনিলাম হেন ভ্রাতৃনিধি !
পণ আর ?

যুধি। দৈবের নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিবারে
শক্তি কার ? নরলোকে বাহুবলে যার
সম নাহি আর, অজেয় সে জরাসন্ধে
বাহুযুদ্ধে হেলায় বধিল, ইন্দ্র হেন
পালিল পাণ্ডবরাজ্য, দানব রাক্ষস
দৈত্য দুষ্ট যত হিংসাকারী জনে বধি ;
রহিল এবার ভাই বৃকোদর পণ !

শকুনি ! হের বাপু ! বুদ্ধির কৌশল, মাত্র ক্ষণে
পাশায় জিনিনু মহাবলী ভীমসেনে।
আছে কিছু আর ?

যুধি। আছি মাত্র আমি একা,
আপন প্রভুত্ব পণ ! ফেল দেখি পাশা ?

শকুনি। বাপু ! বৃথা দেখা ! পাশা সিদ্ধবিদ্যা মম।
কিন্তু হে কুন্তীনন্দন ! কি কর্ম্ম করিলা,
পাপ আচরিলা, আপনি হারিলা, ছি ছি,
থাকিতে অপর ধন !

যুধি। অন্য কিবা হেন ?

শকুনি। ধন ভ্রাতৃগণ যদি, দারা নহে কেন ?
কর পণ দ্রৌপদী এবার।

যুধি। ছি ছি মামা !
হেন কথা না কহ আবার !
লক্ষ্মীস্বরূপিণী কৃষ্ণা পাণ্ডবঘরণী,
পুত্রবতী পাঞ্চালদুহিতা, গুণ যার
বর্ণনে না যায় কত কব, সিন্ধু প্রায়
সৈন্য মম, নাহি তাহে হেন জন—পীড়িত
আহত আর্ত্ত বিপন্ন, অথবা মম মত
জন—দ্বিজ কি ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য শূদ্র
আদি অগণন, সবার পালনকর্ত্রী —
জননী ধরিত্রী যথা। যোগ্য নয় পণ
রাখি খেলিবারে পাশা।

শকুনি। লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী তোমার বাপু !
সেই মাত্র একই ভরসা। দেখিয়াছি—
পড়ে পাশা হেন নানে কভু কভু জানি '
রহিলে আপনি, রমণী তনয় বহু
হয়, রাখি পণে তায় করহ উদ্ধার
আপনারে, এ সংসারে আপনা হইতে
বড় কেবা আর ?

যুধি। হে মাতুল ! কহি স্থির,
আরবার মম পণ দ্রৌপদী রহিল।

সভাসদ। ধিক্ ! ধিক্ !

শকুনি। হের অক্ষ, লক্ষ্মী বলি নাহি বিচারিল।
সত্য পণে জিনিয়া লইল।

ধৃত। কি হইল ?
হে শকুনি ! কহ শুনি পণ কে জিনিল ?

শকুনি। মহারাজ ! সৌবল জানিল পাণ্ডব-লক্ষ্মী
আজ হতে কৌরবের ঘরে।

দুর্য্যো হে মাতুল ! ধন্য তুমি ভুবন ভিতরে,
চিরতরে শত্রুমুখ হইল অঙ্গার।

কর্ণ। সখে! সত্য যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
সাক্ষ্য সে বিবেক তার; মাতিয়া ব্যসনে
রাজ্য অধিকার ধন ভ্রাতৃ-দারাসনে
খোয়াইল; যোগ্য রাজা ধর্ম্মসিংহাসনে!

ভীষ্ম। ভগবান! আর কি আছে তোমার মনে?

দ্রোণ। হে গাঙ্গেয়! দেখে শুনে ইচ্ছি মরিবারে;
বুঝিলাম সংহারে যাইবে সর্ব্বজন।

কর্ণ। অপূর্ব্ব দৈবের সংযোজন! ভাল সখে!
এই না সে পাণ্ডব সুজন, নিমন্ত্রিয়া
তোমা হেন জনে, পেয়ে আপন ভবনে,
কৈল উপহাস কত? হীন ভৃত্য যত,
সেও তোমা হেরি হাসে, যেন সে সবার
রহস্য-পুতুল, বাতুল কি বিদূষক?
সখে! দৈব নিয়ামক, কালে কর্ম্মফলে
হেন গর্ব্বিত পাণ্ডবে দারাপুত্র সনে
বাঁধি হাতে গলে—
তব পদতলে আনি দিল দাসপণে;
রাজাসনে তা'সবার যোগ্য নয় আর
বসিবারে, বসুক্ যথায় ভৃত্যগণ।

দুর্য্যো। বটে সখে! কহিলে উত্তম। দুঃশাসন!
যুধিষ্ঠির মুকুট ভূষণ লও কাড়ি,
সহ ভাই চারি, সবাকার শস্ত্র বস্ত্র
অলঙ্কার করহ মোচন। ভৃত্যসম
পাণ্ডবের উপযুক্ত হয়, কহ সখে!
করিয়া নির্ণয় সে কর্ম্ম যাহারে সাজে।

কর্ণ। দৈবে হেন হয় বহু রাজে। কালোচিত
কর্ম্ম করে, বিনা কর্ম্ম কে আছে সংসারে?
কি ভূপতি, কৃষী, ভৃত্য, কি ইতর জন,
সক্ষম যে যাহে; করি তাহে অনুমান—
হ'য়ে পাণ্ডবপ্রধান, যুধিষ্ঠির কভু

শ্রম না করিল, সুখ একাই ভুঞ্জিল,
সেই প্রভু, ভারবাহী আর চারি জন;
কিন্তু ধর্ম্মভীত বিশ্বাসভাজন, দেহ
তাম্বূলযোগানভার তাহে। বৃকোদরে
রাখ রাজচতুর্দ্দোল বহিবারে, আছে
কিছু বল; চিরদিন উদর সম্বল—
সবে যত, একা তত খায়; শ্রমজীবী
পরিশ্রম চায়—রহে সুস্থ দেহমনে।
আছে সে অর্জ্জুনে নারীপ্রিয় বহুগুণ
বেশ-পারিপাট্য-সুনিপুণ. দেহ সেবা—
রাজপরিচ্ছদ আভরণ লয়ে সদা
সভার সম্মুখে তব রবে; তবে যদি
তব হিত চায়, মাদ্রীর দুই তনয়—
দোঁহে রাখ দুই পাশে চামর ব্যজনে।
দাসীপণে পাণ্ডব-মোহিনী কৃষ্ণা যিনি
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তোমা করুন সেবন।

দুর্য্যো। সখে! কহিলা হে যোগ্য নিয়োজন—
প্রথম হইতে শেষ মনোরম অতি।

কর্ণ। সখে!
সত্য বটে, সে এক গম্ভীর জানি রীতি,
আজ একে, কালি অন্যে করিতে আশ্রয়,
কিন্তু দ্রৌপদীর নূতন সে নয়; বটে,
অন্য জনে অভ্যাসের আছে প্রয়োজন;

দুর্য্যো। ভাল সখে! ব্যবস্থা উত্তম, জানি সদা,
আত্ম ত্যাগ মম তরে সদা তব মন।

কর্ণ। রাজভোগ শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

দুর্য্যো। বটে, বটে!
এক প্রাণ ভিন্ন দেহ কর্ণ দুর্য্যোধন,
কিন্তু স্বয়ম্বরে ভীষ্মদত্ত ধনুর্গুণ
কে সে সখা, নামাইল অগ্রে, দিল গুণ
পুনর্ব্বার?

কর্ণ। সখে!
বহু পূর্ব্ব কথা—
ক্ষম মোরে, সে কর্ণ নহি ত আর এবে!
হইল অঙ্গার নির্ব্বাণে সে অগ্নিকণা।

দুর্য্যো। ভাল সখে!
আজি নত হবে গর্ব্বিত ফণিনী ফণা।
দুঃশাসন! ভৃত্যপক্ষে লহ সভাতলে;
নাহি জানি—এখন(ও) কি বলে সিংহাসনে
ব'সে প্রভু প্রায়?

দুঃশা। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) হা রে,—উঠহ ত্বরায়!
রাজ আজ্ঞা শুনিয়া না শুন, মূঢ়! যেন
বর্ব্বর আচার।

ভীম। হা রে, একা ভুজবলে গদাঘাতে,
ধৃতরাষ্ট্রবংশ আজ করিব সংহার!
একবার দেহ আজ্ঞা ধর্ম্মরাজ! ওহো!
নিরুত্তর কেন?

অর্জ্জুন। আর্য্য! কর একি কাজ!
(ভীমকে ধারণ) ভাবে বুঝ রাজার নাহিক অনুমতি!
নহে তিনলোকে কাহার শকতি ধর্ম্মে
অপমান করি জীয়ে? পাইত আহুতি
অস্ত্রানলে শুষ্কতৃণসম বহুক্ষণ।
ধর্ম্মে নারি করিতে হেলন, কি কহিব—
তাঁর সত্যপণ, পণ মো সবার জানি,
হইব জ্যেষ্ঠের অনুগামী সর্ব্বক্ষণ;
যদি বা সে হিমাদ্রি নড়িবে, তবু নাহি
ধর্ম্মরাজ প্রতিজ্ঞা টলিবে কদাচন।
তুচ্ছ রাজ্য ধন মিছার জীবন, মাত্র
নিত্য সত্য দুর্লভ রতন, সত্য নামে
নরহৃদে স্থিত নারায়ণ, নিত্য সাক্ষী
জীবের ধারণ-রক্ষণ-পালন-স্বামী।
জানি দেব! বিষম আপদ কালে কভু,
ধর্ম্মপথ কদাচ না ত্যজে সাধুজন,
সত্যমাত্র একই অবলম্বন তথা,
অন্যথা মঙ্গল কোথা? যদি দাসপণ;
হের, সত্য করিব পালন জ্যেষ্ঠ তরে।
জন্ম যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম দ্বাপরপাবন
নরোত্তম ভারত ভিতরে।

(প্রস্থানোদ্যত)

দুর্য্যোধন। কি আশ্চর্য্য! দাসত্বে সে দর্প নাহি ছাড়ে!

কর্ণ। ভাল সখে।
তবে কিবা ব্যাজ দ্রৌপদীরে আনিবারে?

দুর্য্যো। হেন দৌত্যে ভাবিতেছি পাঠাইব করে।

কর্ণ। সখে! নাহি চিন্তা, পাঠাও বিদুরে তথা।
কৃষ্ণারে কহিবে বুঝাইয়া, হবে মত;
আছে গুণ—দৌত্যকার্য্যে নিষ্ফল না ফেরে।

ধৃতরাষ্ট্র। ওহো! মস্তিষ্ক আমার আলোড়িত, যেন
শূন্যে ঘুরে সদা সর্ব্বক্ষণ।

দুর্য্যো। দুঃশাসন! হও আগুয়ান, ত্বরা লহ রে
পিতারে অন্তঃপুরে, ফিরিয়ে আসহ হেথা যেন।

(দুঃশাসন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান)

ক্ষত্তা হে! চিন্ত যে তব বড় উচাটন
হেরি, বসি হেট মুণ্ডে, বুঝি পাণ্ডবের
পরাজয়ে নহ সুখী, তেঁই সে জিজ্ঞাসি,
হতে কি দুঃখিত কৌরব যদি হারিত?
পিতার প্রধান মন্ত্রী কুরুহিত শুনি
ব্রত তব, ধর্ম্মমত তোমার বিচার;—
তেঁই কহি যাও আর বার শীঘ্রগতি
পাণ্ডব আবাসে, যথা সত্য পণে অক্ষে
বিজিতা দ্রুপদ সুতা কমলা স্বরূপা
জানি নারি মাঝে কমলিনী; কহ তারে,
আসি দাসীপণা করুক্ কৌরব গৃহে।

বিদুর। সত্য!
নিকট শমন যার সেই হেন কহে;
আরে মন্দমতি! কর আশা কুলবধূ
পাটরাণী পাণ্ডববনিতা সত্য সত্য
তোর দাসী হবে? কহ, হেন পাপ চিন্তা
তোমা বিনা অন্য কৌরবে কে করে কবে?
সে বংশে কে পাপমতি তব সম জন্ম নিল।
নিল, কহ কে চাহিল কুলবধূ অক্ষে
জিনি করিতে লঙ্ঘন, কহ পুনঃ পুনঃ,
যদি চাহ সে বিচার,—মুক্তকণ্ঠে কহি
সভা মাঝে, নাহি তব দ্রৌপদী উপরে
তিলমাত্র অধিকার; জ্ঞাত সর্ব্বজনে—
যুধিষ্ঠির সত্যপণে আপনি হারিল আগে,

দ্রৌপদীরে পাছে ; নিজে জিত তার
কি প্রভুত্ব আছে অন্য স্বাধীন যে জন
পণ করে তারে ? বিশেষ সে কৃষ্ণার উপরে
নয় অধিকার আর সে চারিজনার,
নহে স্বামী একা যুধিষ্ঠির, করিল সে
মিথ্যা পণ, জিজ্ঞাসহ বৃদ্ধ মন্ত্রী সবে।

দুর্য্যোধন। ধন্য বুদ্ধি ! সে ব্যবস্থা লওয়া হবে পরে।
সত্য কিবা মিথ্যা পণ জানে সেই জন,
ধর্ম্ম অবতার বল বারে। জানি তুমি
চিরদিন দুষ্টমন্ত্রী—শত্রুকুলহিত,
অনুচিত তোমারে প্রেরিতে সেই কাজে।
প্রতিকামি !

প্রতিকামী। কোন্ আজ্ঞা হে কৌরবস্বামি !

দুর্য্যোধন। যাও পাণ্ডব আবাসে, পাঞ্চালীরে লয়ে
ত্বরা আসিবে হেথায়, কহিবে তাহায়—
পাশায় পাণ্ডুজ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম নরপতি
আজি তারে হারিল কৌরব-দাসী পণে ;
পঞ্চজনে নিয়োজিত যে যাহার কাযে,
এবে তাহার আর না সাজে গর্ব্বমদে
প্রাসাদে রক্ষিতে, ত্বরা সভাতে আসিয়া
যাউক জানিয়া তার কর্ম্ম দাসীপণা।
শুন সঞ্জয়ভনয় ! মনে নাহি গণ
তিলমাত্র ভয়, মিথ্যাবিভীষিকা-প্রিয়
পাণ্ডবস্তাবক এই বিদুর বচনে,—
কেনা জানে ক্ষত্তা দুষ্টমন্ত্রী এ সভায় ?
যাও শীঘ্র, দ্রৌপদীরে অগ্রে দাসী পণে
হেরি নিয়োজিতা,—যাব বিশ্রাম আগারে।

(প্রতিকামীর প্রস্থান)

বিদুর। বুঝিলাম এত দিনে এই মহা পাপে
শান্তনু বাহ্লিক বংশ যাইবে সংহারে ;
কিন্তু কহি কারে ? হায় ! রাজ্য ধন-লোভে
নিজে অন্ধরাজ পুত্র-পৌত্র-মিত্রসনে
যায় ছারখারে, অন্ধে জিনি পাণ্ডবেরে
মহানন্দে মন্দিরে পশিল, গৃহচূড়ে
জ্বলিছে কালাগ্নিশিখা হেরে না হেরিল ;

ওহো ! কি হ'তে কি হ'ল। দেব শান্তনব !
কি হেতু নীরব কহ ? পাণ্ডবমহিষী
কৌরব সভায় আসি হবে দাসী, বুঝি
তা দেখিতে চাও ? কুরুবৃদ্ধ হে বাহ্লিক !
সঞ্জয় নন্দনে এখনো ফিরাও, যদি
চাও বংশের কল্যাণ ; কৌরবপ্রধান
এই দুর্য্যোধন মূর্ত্তিমান কুরুকাল,
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডবেরে সত্যে বদ্ধ পেয়ে,
নির্ভয়ে করিছে অত্যাচার ; এখনও
ত্যজ সে আশয়, হেন ঘোর পাপ কর্ম্ম
সবে মিলে কর নিবারণ ; পণে জিত
পাণ্ডব তক্ষক সত্য মন্ত্রে মুগ্ধ মন,
নম্রশিরে আছে বসে ; মূঢ় ! কি সাহসে
পদাঘাতে ঘাঁটাইছ তারে ? কেশরীরে
হেরে বদ্ধ পাশে, অল্পমতি মৃগশিশু
যথা তারে উপহাসে, ভাবে না তখন
এ দুর্দ্দিন নিত্য নাহি রবে। ওহো ! সবে
নিরুত্তর ! বুঝি করিলা মরণ সার !
সেই কালে স্মরিবা এ বিদুর বচন।

দুর্য্যোধন। ওহে দূরদর্শী, ইষ্ট চিন্তহ আপন।
কুরুকুল মঙ্গলামঙ্গল বুঝিবে সে
কৌরব যে জন ; অকারণ ভেদ বুদ্ধি
না দেহ সবারে। যদি তব নাহি সুখ
মম জয়ে, যাও চলি আপনার ঘরে,
নির্জ্জনে পাণ্ডব দুঃখে করিতে রোদন।

শকুনি। ক্ষত্তা হে। অনুশোচন এযে অকারণ।
ভাগ্যফল সময়েতে ফলে ; দুঃখ বটে—
রাজ্যধন ভ্রাতৃ দারা সহিত আপন
হারিল সে এক কালে ; কি করিব,
মোর দোষ কিবা তাহে ? কিন্তু সত্যপণ
নিজে কৈলা ধর্ম্মরাজ, লঙ্ঘিবে কেমনে ?
জেন মনে, দয়া ক্ষমা করিবার কর্ত্তা
একা দুর্য্যোধন মাত্র ; নৈপুণ্য আমার
ছিল কিছু অক্ষের ক্রীড়ায় ; পরীক্ষায়
কৌরব সবাই ব্যগ্র ছিল, ধর্ম্মরাজে

দৈবেতে মিলিল ; সত্য নাম যুধিষ্ঠির—
অক্ষরণে হেন দেখিনি সুস্থির কারে,
তেঁইসে সংসারে রহিল যে খ্যাতি মম
পাশার সমরে লইনু সাম্রাজ্য যিনি
চিরতরে। ধনে জনে রাজ্য সিংহাসনে
মম নাহি প্রয়োজন।

দুর্য্যোধন। মাতুল ! পাণ্ডবগণ মোরে নিয়া যবে
আপন সভায়, করিল সে অপমান
কোথা তুমি আছিলা তখন ?

শকুনি। দুর্য্যোধন ! করেছি ত সত্য সেই পণ—
তবে কিনা—(জনান্তিকে)
দুষ্টা ভাল কথা বলা ক্ষতি কি এখন ?

কর্ণ। হে গান্ধার ! শুধু কি পাশায় বাক্যযুদ্ধে
সপ্রতিভ তব সম হেরিনি কখন।

শকুনি। অঙ্গরাজ ! বুদ্ধিবল কেবল সম্বল মম।

কর্ণ। হের, প্রতিকামী একাকী আইলা সখে !
(প্রতিকামীর প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। কি সংবাদ কহ,
পাইলা কি দ্রৌপদীর দেখা ? কি কহিলা ?

প্রতিকামী। কৌরবেন্দ্র ! আজ্ঞামত তব, কৃষ্ণা মুখে
পাশার কাহিনী তথা পাণ্ডবের পরাভব
শুনি, রাণী অগ্রে বিশ্বাস না গেলা, মোরে
তখনি কহিলা "অসম্ভব ! নীতি জ্ঞানী
পাণ্ডবপ্রধান সদা স্থির মতি, কভু
না করিবে কর্ম্ম হেন ; বাতুল হইলা
কিবা সঞ্জয়নন্দন ?

দুর্য্যো। ভাল, ভাল, কে বাতুল বুঝিব তখন।

প্রতিকামী। কিন্তু যবে পুনঃ কহি সর্ব্ব বিবরিয়া
কার্য্য মম করিনু প্রচার,
অবিলম্বে মোর সনে আনিতে সভায়,—
বুঝি তায়, পাঠাইলা মোরে ধর্ম্মরাজে
জিজ্ঞাসিতে—হারিলা পাশাতে অগ্রে কিবা
আপনাকি নারী সভ্যগণে তবেবিজ্ঞ
সুবিচারি কহে যদি, স্বেচ্ছায় সভার মাঝে
আসিবেন তিনি। কি উত্তর কব তারে

হে পাণ্ডবস্বামি !

দুর্য্যোধন। আরে মূর্খ ! কিবা জিজ্ঞাস উহারে ?
ক্ষত্রিয় সন্তান সত্য পারে কে লঙ্ঘিতে ?
যাও শীঘ্র, আনহ সভাতে দ্রৌপদীরে।
যেবা ইচ্ছা জিজ্ঞাসিবে যারে, কিম্বা এই
সভ্যগণে যদি চায় ন্যায়ের বিচারে,
কহ সেই বিদুষীরে মিলিবে এখানে,
মনোমত আছে কত ; জিতা দাসী পণে
জাতি নারী সপিণী সতর্কা মনে ইচ্ছা
কুটতর্কে বামা আপনারে উদ্ধারিবে।

কর্ণ। সখে ! নারীজাতি দোষী নয়, বটে তার মাঝে
হেন তর্ক পঞ্চবরা কৃষ্ণারে সে শোভে
বিষে ভরা দুষ্টা নারী স্বতঃই বর্জ্জিবে।

দুর্য্যোধন। সখা হে ! এবে যবে সবাই দেখিবে
একে একে সর্ব্বপণ কারলা পূরণ
সত্য গর্ব্বী কুন্তীপুত্র শান্তি মনে তবে
উদয় হইবে যদি ; সঞ্জয় তনয় !
প্রতীক্ষায় কার আছ দাঁড়াইয়া ? ত্বরা
আন দ্রৌপদীরে; কাল ব্যাজ নাহি সয়।

প্রতিকামী। ধর্ম্মরাজ ! মহিষী তোমার জিজ্ঞাসিলা
শেষ কথা, তাঁর আসিবার হেথা যদি
তব ইচ্ছা, উচিত যে হয় শুনি পরে
যাজ্ঞসেনী সভায় হবেন উপস্থিত।

যুধিষ্ঠির। শুন প্রতিকামি ! সত্য নিত্য ধর্ম্ম জানি।
কোন তরে সে সত্যে নহিব বিচলিত।
সত্য মরে একমাত্র হিত, সত্য তরে
জীবন ত্যজিতে নহি ভীত। কহ তায়
আসিয়া সভায় সত্য করুন পালন।
সনাতন ধর্ম্মের রক্ষণ হবে তায়,
দেহ ধরি কে কোথায় এড়ায় কর্ম্মফল ?
কভু হর্ষ সুখ, ক্ষণ পরে শোক দুঃখ,
কখন উল্লাস কভু বিলাস সন্তাপে
শীতাতপ আদি এক ভাসে তার যায়,
সর্ব্ব অবস্থার বিপর্য্যয়ে সত্যধর্ম্ম
একমাত্র পালিতে সক্ষম সাধুজন

সভাসদগণ। জয় ধর্ম্মরাজ দেব দ্বাপর পাবন !

দুর্য্যোধন। মূর্খ ! তোরে কৈনু নিয়োজন হেন বুঝি
দ্রৌপদীর দৌত্যকার্য্যতরে কোন্ কথা
জিজ্ঞাসিছ কারে ? কার বলে হেথাকারে
এলি ঠেলি আজ্ঞা মম, না বুঝি কারণ—
যাও ত্বরা এস লয়ে পাঞ্চালীরে হেথা,
অন্যথা দণ্ডার্হ হবে, আজ্ঞা স্থির মম।

প্রতি। (স্বগত) ভগবান ! কি লিখন আছে মোর ভালে
নাহি জানি, কি ক্ষণে পোহাল যামিনী ?
নহে আজি কেন অন্যে ত্যজি মোরে হ'ল
দ্রৌপদী আনিতে ভার ? দেখি দুই দিকে
নিশ্চয় মৃত্যু আমার—মারীচের গতি,
পাপমতি কুরুপতি দিবে দণ্ড স্থির
কৃষ্ণা না আসিলে ; কিন্তু পাণ্ডব বলে
দেবেন্দ্র রক্ষিতে নারে দিক্‌পাল সহায়ে—
এ বিপদে পাপ পক্ষে রহি—সার দণ্ড,
ধর্ম্মপক্ষে মৃত্যুশ্রেয় গণি। (প্রকাশ্যে) কুরুমণি !
কুলবধূ পাণ্ডবের রাণী, ইচ্ছায় যদ্যপি
না আসেন তিনি, নাহি জানি কি করিব।

দুর্য্যো। ওহো ! দাবানলে তবু প্রবল পাণ্ডব !
সিংহ লক্ষ্য শৃগাল না ধরে। দুঃশাসন !
এই ভীরু পাণ্ডবেরে ডরে, তেঁই কাহ,
ধাও রে সত্বরে, কেশে ধরি পাঞ্চালীরে
আন সভামাঝে দাসীরে আর না সাজে
রাণী হেন রহিতে অন্দরে ; ধিক্ তারে !
নিস্তেজ পাণ্ডব, করে কে তারে গণন
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ পদে দলিত যেমন,
যাও শীঘ্র আন সে দাসীরে হেথাকারে।

(দুঃশাসনের প্রস্থান)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষণ ও দুর্ব্বলী দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশার বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৵০ আনা, ৬ শিশি ৪৷৷০ টাকা, মাশুল ১৷০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনারাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য

এক শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা,

তিন শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলার আনন্দ ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।/০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, এক সের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্টপুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39, MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA

Janmabhumi Registered No. C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৩শ বর্ষ] ১৩৩৪, চৈত্র, [১২শ সংখ্যা

১। স্তোত্র—শ্রীযুক্ত রাজবিহারী ভট্টাচার্য্য ৭৩৩

২। অভিভাষণ—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ৭৩৪

৩। পাণ্ডব নির্ব্বাসন স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী ৭৪৪

৪। আশ্রিত পশুর প্রতি দয়া—শ্রীমতী শচী দেবী ৭৫৮

৫। বরণ—শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি.এ. ৭৬০

৬। বর্ষ-সূচি ... ...

14 7-28

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে ! পথ্যের বিচার নাই।।

মূল্য ৸৹, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সুপ্রশংসিত ও

ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্তবাটীর ভুবন-

বিখ্যাত সেই আদিও অকৃত্রিম—

(যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ)

মূল্য—প্রতি ড্রাম ১৲ টাকা, তিন ড্রাম ২॥০ টাকা,

মাশুলাদি ।৵০ আনা ।

মানবজীবনে চক্ষুর ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় আর নাই। যাহার চক্ষু নাই—তাহার জীবনই বৃথা, চক্ষু না থাকিলে সম্পূর্ণরূপে অপরের গলগ্রহ হইতে হয়। চক্ষু পীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বপ্রযত্নে চক্ষুপীড়া দূর করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ মানবের অশেষ কল্যাণ কামনায় পদ্মমধুর গুণানুকীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সর্ব্ব-নেত্রাময় নিসূদনঃ" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগে "পদ্মমধু" শান্তি-কারক মহৌষধ। সর্ব্ববিধ চক্ষু পীড়ায় বিশুদ্ধ নির্ম্মল পদ্মমধু তুল্য অমোঘ মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা দর্শন ইন্দ্রিয়ের উন্নতি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিবস পদ্মমধু ব্যবহার করিলে চক্ষুপীড়ার আশঙ্কা থাকে না, চক্ষু স্নিগ্ধ ও শীতল করে, জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

এন, দত্ত ব্রাদার্স

৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

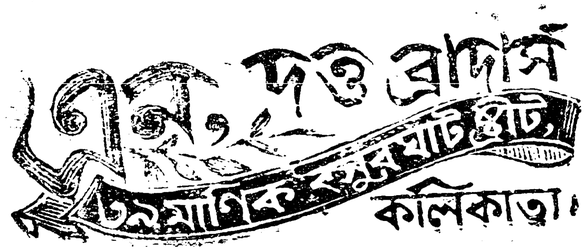

কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশভাগ—ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ।

১৩৩৪ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৩৪ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা হাটখোলা দত্তবাটী,

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta at the

"JANMABHUMI" PRESS.

39, Manick Bose's Ghat Street,

CALCUTTA.

1928.

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা]. [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা ।]

ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের সূচিপত্র।

সংখ্যা, বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
১। অভেদমূর্ত্তি	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৩৫
২। অর্ঘ	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি-এ.	৬০৪
৩। অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	৭৩৪
৪। আত্মতত্ত্ব	„ দীননাথ মুখোপাধ্যায় (উকীল)	৬৩২
৫। আশ্রিত পশুর প্রতি দয়া	শ্রীমতী শচী দেবী	৭৫৮
৬। আমাদের পরিণাম		৭০৬
৭। আগমন গীত	শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র	৫৫৯
৮। একা	„ গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ	৬০২
৯। একখানি লিপি	„ মুণীন্দ্র দেব রায়	৬০৬
১০। এসো	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি-এ	৪৮৬
১১। কলহ	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু, বি এল,	৪০৩
১২। কন্যা দেখা	„ অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫০৬
১৩। কন্যাদায়	„ শশীভূষণ দাস	৭৩১
১৪। কমলা	„ অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী	৫৮১
১৫। কবে সে সুদিন আসিবে	শ্রীমতী কমলিনী রায়	৬২৭
১৬। কি ভাবে রবে জগতে	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়	৪১৮
১৭। কেনারাম বাবুরাম বেচারাম	„ রায় জলধর সেন বাহাদুর	৩৯৮
১৮। কেন	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি-এ,	৫৭২
১৯। কৃষিসভা ও বঙ্গভাষার চর্চ্চা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র লাল মিত্র	৫০৯
২০। গঙ্গা		৬০৬
২১। গঙ্গার বন্দনা	„ রাজবিহারী ভট্টাচার্য্য	৫৬১
২২। গান	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি-এ,	৬০৫
২৩। গীত	শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য	৭০০
২৪। গৃহস্থ মঙ্গল	ডাঃ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দত্ত এম--বি,	৪৬৫
২৫। ঘাত প্রতিঘাত	শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী	৪৫৭

সংখ্যা, বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২৬। চল্লিশের তত্ত্ব	শ্রী-হ-জ-ব-র-ল	৬৯৯
২৭। চিন্তা	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬২৮
২৮। চিত্ত-জয়	„ সত্যেন্দ্র চৌধুরী	৪৪৫
২৯। চোখের দেখা	„ সুধীর কৃষ্ণ মিত্র	৪৪০
৩০। ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ		৪২৯
৩১। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে	„ ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭০
৩২। দায়িত্ব	„ রাজকুমার বসু বি. এল,	৫০৭
৩৩। দীর্ঘজীবন	„ রাজকুমার বসু বি, এল,	৫৩৮
৩৪। ধর্ষিতা	„ যোগানন্দ রায়	৪৮৯
৩৫। ধর্ম্মদাস	„ রসময় ঘোষ	৪৮৩
৩৬। ধানের ভিতর চাউল	„ আশুতোষ ঘোষ	৫৩৩
৩৭। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ	৩৮৬, ৪০৫, ৪৬২, ৫০২, ৫১৮, ৫৪৭, ৫৯৬	
৩৮। নববর্ষ		৩৭৩
৩৯। নববর্ষ	„ বনমালী শেঠ	৪০০
৪০। নিস্তারিণী	„ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭৬
৪১। নিন্দা ও প্রশংসা	„ রাজকুমার বসু বি, এল,	৪২১
৪২। পাণ্ডব নির্ব্বাসন	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী	
	৩৭৮ ৪১০, ৪৪৯, ৪৯৩, ৫২২, ৫৫১, ৫৭৬, ৬১৯, ৬৪৭, ৬৮৫, ৭১৯, ৭৪৪	
৪৩। পানীফল		৬৭৩
৪৪। পিতা-মাতা	শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু বি.এ.	৫০৪
৪৫। প্রতিদান	„ প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল	৬৭৫
৪৬। প্রশ্নত্রয় সমাধান	„ আশুতোষ ঘোষ	৬২৩
৪৭। বন্দনা	নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	৫৬০
৪৮। বরণ	শ্রীমতী শৈলরাণী বসু বি.এ.	৭৬০
৪৯। বড়বাবু	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	৬১০
৫০। বিয়ের বাজার	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৪৬৮
৫১। বিরহে	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৪৮১
৫২। বিসর্জ্জন		৫৭৩

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৫৩।	ব্যবসা ও কারবার	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৬৩৭
৫৪।	ব্রহ্মের পরিণাম বাদ	„ বিহারীলাল দত্ত (তত্ত্ববিনোদ)	৫৪১
৫৫।	ভাব ও ভাষা	„ ললিত চন্দ্র মিত্র বি.এ.	৪৩১
৫৬।	ভুল	„ আশুতোষ ঘোষ	৪৩৭
৫৭।	মহাপুরুষের দক্ষিণেশ্বর গমন	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৫৯৯
৫৮।	মহিমার মহিমা	„ হরিধন মিত্র	৫৬২
৫৯।	মাতৃ-আবাহন		৫৬৬
৬০।	মাসিক-পত্রিকা	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্র লাল মিত্র	৪২৭
৬১।	মিনতি	শ্রীমতী আভাবতী	৫০৮
৬১।	মিলন	শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫৬১
৬২।	রায় রামানন্দ ও গিরিশচন্দ্র	„ সূর্য্যকুমার ঘোষাল	৭০১
৬৩।	শিশুমঙ্গল	ডাঃ শ্রীমতী যামিনী সেন	৭২৭
৬৪।	শেষ	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪০৪
৬৫।	শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য	„ শ্যামলাল গোস্বামী	৬৬৯, ৭১২
৬৬।	সমালোচনা		৫০৮, ৬৩৩
৬৭।	সবার রাস টানে যে তাহার রাস টানে কে	শ্রীযুক্ত অশুতোষ ঘোষ	৬০৩
৬৮।	সাহিত্যে গলদ	শ্রীযুক্ত ভবিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ,	৪৭৭
৬৯।	সাধনা	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল,	৪৭৩
৭০।	স্তোত্র	শ্রীযুক্ত রাজবিহারী ভট্টাচার্য্য	৭৬৩
৭১।	স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার প্রবর W. C. Banerjee	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল.	৩৭৪, ৪১৯, ৪৮৬, ৫১৫
৭২।	স্বাধীনতাপ্রিয় পতির প্রতি পত্নী		৫৬৯
৭৩।	স্বভাব	„ অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৭৮

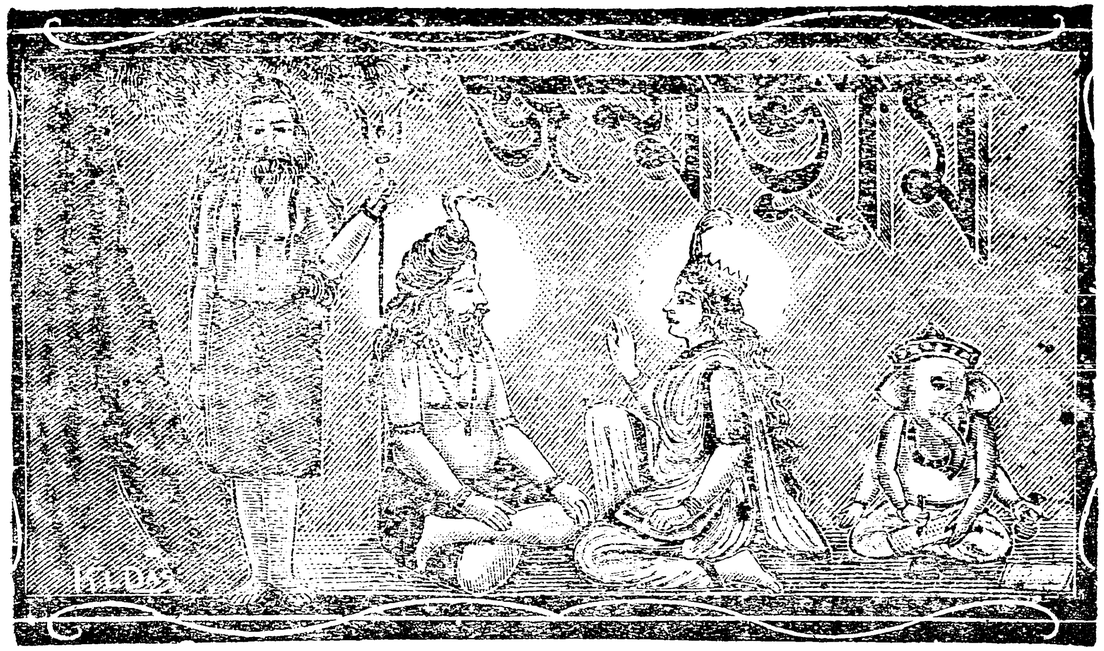

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৩শ বর্ষ | ১৩৩৪ সাল, চৈত্র | ১২শ সংখ্যা

স্তোত্র।

লেখক—শ্রীরাজবিহারী ভট্টাচার্য্য।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর জগৎজন-জগৎপালন।
তুমি হৃষীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রাধারমণ॥
তুমি ছলিলে বলির শ্রীপদ দিলে লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তুমি শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীমধুসূদন গিরি-গোবর্দ্ধনধারণ॥
তুমি অনাথের নাথ করুণানিদান অধমতারণ পতিতপাবন।
তুমি দীনদয়াল ভকতবৎসল ভৃগুপদ-বক্ষে-ধারণ॥
তুমি যশোদা-নন্দন ব্রজের জীবন কংসদর্পনিসূদন।
তুমি নবঘনশ্যাম মদনমোহন নাগ-কালীয়-দমন॥
জয় জনার্দ্দন ত্রিতাপনাশন মধুকৈটভ-ঘাতন।
জয় পীতবসন শিখিপুচ্ছচূড় বনমাল্য-ধারণ॥
জয় পাণ্ডবের সখা ত্রিভঙ্গেতে বাঁকা দ্রৌপদী-লজ্জা-নিবারণ।
জয় মুকুন্দমুরারি ভবের কাণ্ডারি শমন-ভয়-দমন॥

অভিভাষণ। *

আনন্দস্বরূপ মঙ্গলময়ের সৃষ্টিচাতুর্য্যের বিধানে আপাতদৃষ্ট অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টের মধ্যেও ইষ্টের অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষীভূত। সদ্যঃপ্রাণনাশী বিষ-বিজলীও ব্যবহার-গুণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার উপাদানে পরিণতি পায়।

ইংরাজের রেল-বিস্তারের উদ্দেশ্য তোমার আমার পিতামহীর বারাণসী-দর্শন নয়, স্বদেশজাত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য তিনি রেল-অরণ্যে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেললেন, দেশের শ্রম, শিল্পের আশ্রয়চ্যুত হয়ে মজুরের জমীতে অবনত হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কেবল বারাণসী-বৃন্দাবন-দ্বারকা দর্শন করলেম, তা নয়, দূরদূরান্তরবাসী অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ সমধর্ম্মী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে পড়লেম।

শাসন-শোষণাদি কার্য্য সুলভে নিষ্পন্ন করবার অভিপ্রায়ে ও আরও কিছু স্বার্থসিদ্ধির মতলবে বিদেশী বণিক্ তাঁদের বর্ণমালার সহিত আমাদের পরিচয় ক'রে দিলেন, আর অই টনিকের জোরে ফাঁকতালে আমরা বাঙ্গাল সাহিত্যটাকে দীপ্ত জীবনে উদ্বোধিত ও অলঙ্কারচ্ছটায় ভূষিত করতে প্রধৃত্ত হলেম। এই শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারে আমরা যে কৃতজ্ঞতার কি গুরু ঋণে আবদ্ধ, তা' পরে বলবো!

এমন একদিন গেছে যে, এই ময়মনসিংহে আস্‌তে আমরা ভয় পেতেম। আগরতলা সুসঙ্গ আদি চক্রগুলিকে যেমন ভূগোলের গোলে বঙ্গদেশান্তর্গত ব'লে নির্ণয় করা হয় মনে করতেম, ময়মনসিংহ ঠিক তেমনটি নয় জান্‌তেম বটে, তবু ভাব্‌তেম, জলে স্থলে ভয়াল পথাতিক্রান্ত, দুর্দ্দম জমিদারবহুল সেই ব্রহ্মপুত্র-কূলে কে অকূলে প্রাণ হারাতে যাবে। ফলতঃ অনেক অর্থের লোভ সম্বরণ ক'রে আমরা এক সময় অভিনয় করবার জন্য এ চক্রের একটি সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিলেম, সে বহুদিনের কথা—তখন আমরা ন্যাশান্যাল থিয়েটারে।

এ ভ্রম দূর হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে,—যখন কলিকাতা নগরীতে জুবেয়ার-সাহেবের বিরাট এক্‌জিবিসন খোলা হয়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল সেই সময় এ জেলার বহু সম্ভ্রান্ত লোককে বহন ক'রে কলিকাতায় নিয়ে যায় ও অনেকের সঙ্গে তখন

* ধলা বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসব, সভাপতি—নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

আমাদের পরিচয় হবার সম্মান ও সৌভাগ্য ঘটে। তন্মধ্যে মুক্তাগাছার অধুনা স্বর্গগত মধ্যম কর্ত্তা হরেন্দ্রকিশোর ও ছোটকর্ত্তা যোগেন্দ্রকিশোর আচার্য্য মহোদয়দ্বয়ের পুণ্যনাম এখানে উল্লেখ না ক'রে থাক্‌তে পাল্লেম না। মাৎসর্য্য-বর্জ্জিত এমন অমায়িক সারল্যের অনাড়ম্বর দৃষ্টান্ত আমার এই দীর্ঘজীবনের মধ্যে অল্পই দেখেছি।

এরপরে তিনবার আমার অদৃষ্টে ময়মনসিংহে আসা ঘটে। দু'বার মুক্তাগাছায় ও একবার রামগোপালপুরে। ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারবর্গ থেকে সাধারণ গৃহস্থ শিক্ষিত-সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি যে কত শিষ্টাচারী মিষ্টভাষী, তা আমি অনেকের সঙ্গে মেশামেশি ক'রে এইখানে ব'সে ভাল ক'রে বুঝে গেছি।

রামগোপালপুর থেকে ফেরবার পথে নসিরাবাদ সহরের দুর্গাবাড়ীতে আমরা অনুরুদ্ধ হয়ে কয়েক রাত্রি অভিনয় করি; আমি থিয়েটারের সঙ্গে এই বাঙ্গালা দেশের অনেক জেলায় বেড়িয়েছি, বেহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও যে যাই নি, তা নয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমার এই দীর্ঘ-অভিজ্ঞতায় একমাত্র এই ময়মনসিংহেই আমাদের নিকট অভিনয় দর্শনের জন্য কেহ পাশ চান নাই অথবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেও চার বা দুই টাকা মূল্য দিয়ে এক একখানি টিকট গোপনে ক্রয় ক'রে ফেলেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন সাব্‌ডিবিসন্ ও গ্রামে অভিনয় করবার জন্য আমরা এত আহ্বান পেয়েছিলাম যে বোধ হয়, সে সময় অন্ততঃ দু' তিন মাস এ জেলায় কাটিয়ে যেতে পারতেম, কিন্তু তখনও বাঙ্গালা নাট্য-সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে সৌখীনভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তাই সম্ভবতঃ অ-দিমে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি; আদর প্রত্যাখ্যানের ফল হাতে হাতে পেলেম, কলিকাতায় পৌঁছেই প্রথম সংবাদ শুনলেম, বঙ্গের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র তার পূর্ব্বদিনে লোকান্তর গমন করেছেন।

ময়মনসিংহ সম্বন্ধে যে ভাব প্রাণে তেত্রিশ চৌত্রিশ বৎসর ধ'রে আনন্দে পোষণ ক'রে এসেছি, এতদিন পরে আজ এই সুযোগে তা প্রকাশ ক'রে ফেললেম; যদি এই সম্মিলনীর সময় নষ্ট ক'রে থাকি—মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

* * * * *

অন্ততঃ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তিন চা'র বার একটা কথার পুনরুল্লেখ শুনলেম যে, "এতদিন পরে বাঙ্গালীজাতি জাগরিত হয়েছে।" কিম্বদন্তী, লিপিবদ্ধ বিবরণ ও প্রত্যক্ষের দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে পশ্চাদ্দিকে লক্ষ্য করতে

আমি যতদূর সমর্থ হয়েছি, তাতে বাঙ্গালী যে কবে ঘুমের অসাড় অঙ্কে অচেতন হয়ে পড়েছিল, তা ত' বুঝতে পারি নি। তবে সবার চোখে সব সময়ে সকল মানুষ জাগ্রত ব'লে অনুমিত হয় না। প্রভুর তিন ডাকের পর পরিচারক সম্মুখে হাজির হ'ল, বাবু বললেন, "কিহে বাপু, এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে নাকি?" অথচ ঠিক সেই সময়ে সেই ভৃত্য অন্দরে জলতোলার বন্দোবস্তে প্রভুপত্নী গৃহিণীর আজ্ঞা পালন করছিল। কর্ম্মচারী আফিসে পৌছুতেই 'বড়বাবু' ধমক দিলেন, "এতক্ষণ ঘুম হচ্ছিল নাকি?" সেবক নির্ব্বাক্; কেন না সে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যা পরিত্যাগ ক'রে গৃহকার্য্যের ঝঞ্ঝাটে পাঁচ মিনিট বিলম্বে আফিসে এসেছে। বিলম্বে আসার অপরাধে আফিসের কর্ত্তা তাকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খাটিয়ে নিয়ে তবে ছেড়েছেন, বাড়া ফিরতেই বৌমার গঞ্জনা,—"আফিসে গিয়ে দরোয়ানের খাটিয়ায় প'ড়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি?"

প্রয়োজন ভেদাভেদে একের দৃষ্টিতে যা নিদ্রা, অপরের চোখে তা জীবন্ত উদ্যম, একের দৃষ্টিতে যা বাজে কায, অপরের চোখে তা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশুর জাগরণ প্রকটিত হয় ক্রীড়ার অঙ্গনে; ছাত্রকে জাগরিত দেখি তার পাঠাগারে; রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টি করলে বুঝতে পারি যে, গৃহিণী জাগ্রত; ঠাকুরঘরের মেঝেয় দেখতে পাই, বৃদ্ধকর্ত্তা চক্ষু মুদে ব'সে আছেন, বুঝি,—তিনি নিদ্রিত ন'ন, ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ ক'রে ধ্যানস্থ।

এইরূপে জাতিবিশেষের মধ্যেও জাগরণ রূপান্তর গ্রহণ ক'রে থাকে। পাঞ্জাবের শিখ জাগে রোষে অসি কোষমুক্ত ক'রে, পাহাড়-দোরস্ত হাড়ে মারহাট্টা জাগে ঘোড়ার পিঠে ভক্ষ্য জোগাড়ে, মরুর মাড়োয়ারী জাগে উদরের অনুরাগে ধরাতল ঢুঁড়ে বেড়াতে, আর প্রবাহিণী শতেশ্বরীহারভূষণা মোলায়েম মাটীর বাঙ্গালী জাগে প্রেমের কাহিনী গান ক'রে।

যে প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে এক দূর-দিনে প্রাচীন ময়মনসিংহকে মহুয়া —মলুয়ার গানে জাগ্রত রেখেছিল, সেই প্রেমের মাদনা-ই সাড়া দিয়েছিল চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের লীলা-গীতিতে, আবার সেই প্রেমের উষ্ণ প্রস্রবণ উচ্ছসিত হয়ে ফুটে উঠেছিল বঙ্কিমের ভাষা-ঝঙ্কারে 'বন্দে মাতরম্' গানে।

জাতির সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয় না অসির ফলকে; কামানের ফুৎকার জাতির বিজয়-পতাকাকে উড়ায় না, জাতিকে জাগ্রত রাখে, জাতিকে উদ্দীপিত করে তার ভাষার মন্ত্রশক্তি। রাজপুত জাতিকে জীবিত রেখেছিল তার

চারণরসনানিঃসৃত জাগরণের গান। ভল্টেয়ারাদি ভাবুকগণের লেখনীমুখেই ফরাসী-বিপ্লবের অসি শাণিত। আজও সমগ্র ফরাসী জাতিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে "মার্সেলিস" গান।

যে নীচবৃত্তির মোহে এক জোড়া চোখের কালো তারার ঠারে পুরুষের মাথা ঘুরে যায় বা এক গোছা চিক্কণ-চুলের মদির গন্ধে তার দেহ লতিয়ে পড়ে, যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণ করবার শক্তি লুপ্ত হয়, তার নাম আসক্তি, প্রেম নয়।

পুরুষের বীরত্ব, নারীর মহত্ত্ব ফুটে ওঠে প্রেমের শিশিরসেচনে। সীতার অমৃতময় প্রেম শ্রীরামচন্দ্রকে দশানন নিধনে শক্তি প্রদান করে; ভ্রাতৃ-প্রেমের বলে লক্ষ্মণ বুক পেতে দিয়ে শক্তিশেলের আঘাত গ্রহণ করেন। ভীমের গদায়, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে যাজ্ঞসেনী-প্রেমের সংহারিণী শক্তি। স্পেনের নাইটগণ নিজ নিজ প্রণয়িনীর প্রেম-প্রতিমা প্রাণে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হতেন। পিতৃ-প্রেমের প্রেরণায় তরুণ শ্রীমন্ত অকূল-সাগরে ভেলা ভাসাতে সমর্থ হয়েছিল। হরি-প্রেমের উন্মাদনায় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিষেধ আজ্ঞার বিরুদ্ধে নগরাধ্যক্ষ কাজীর অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে নগরকীর্ত্তন গানে প্রেমের জয় ঘোষণা করেছিলেন। প্রেমদানে মানবকে পরিত্রাণ করতে এসে শ্রীযীশু ক্রুশকণ্টকালিঙ্গনে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন।

বাঙ্গালী তার সাগর-ছেঁচা রতন এই বাঙ্গালাটুকুকে বরাবর আপনার প্রাণের সমস্ত প্রেম দিয়ে ভালবেসে আসছে। বাঙ্গালা হ্যাংলা নয়; পরের ধনের প্রত্যাশী হবার তার প্রয়োজনও নাই; তার স্থলে অন্ন, জলে ব্যঞ্জন, রসনা-রঞ্জন মধু তার লতায় লতায় দোলে, শাখায় শাখায় ফলে, কাণ্ডে কাণ্ডে গলে, লেমনেডের বোতল তার গাছের আগায় ঝোলে। বসনের জন্য বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালীকে কার্পাস দেয় বঙ্গ-সুন্দরীর চারু অঙ্গ সাজাতে কোটি কোটি কীট প্রাণপাত ক'রে কুসুম-কোমল রেশম প্রস্তুত করে, বনের পাতা বনের ফুল, গহনার নমুনা গড়ে। হ্যাংলা ত বাঙ্গালা নয়ই, তার ওপর মা আমার লুণ্ঠন, বঞ্চন, ভিক্ষা চিরদিন ঘৃণার চোখে দেখেন, তাই একদিন স্বাবলম্বী হবার জন্য অনেক ভোগ বর্জ্জন, অনেক প্রলোভন ত্যাগ করেছেন। দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই একরকম না একরকম শিরোপা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে, কেবল বাঙ্গালীই "নাঙ্গাশির।" আমার বোধ হয়, আত্মনির্ভরতার অভিমানে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা একদিন এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে, সুদূর ভূভাগ দূরে থাক, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কামরূপ বা বিহার প্রদেশের

কাছেও ব্যবহার্য্য বস্ত্রের জন্য ঋণগ্রস্ত হ'তে লজ্জাবোধ করতেন এবং সেই জন্য বাহুল্যবোধে পাগ্‌ড়ী ইত্যাদি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র ধুতি-উড়ানিকেই সমাজের মর্য্যাদারক্ষার আসনে বসিয়েছিলেন।

যে ভেতো বাঙ্গালীর বুকের ভিতর এতটা জাত্যভিমান ছিল, সেই বাঙ্গালী এদ্দিন ঘুমুচ্ছিল—আজ জেগে উঠেছে। একথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে পৈতামহপুরুষের নিন্দার পাতকে পাতকী হ'তে হয়।

পাঠান-মোগল-শাসনকালেও বাঙ্গালা নামে মাত্র পরাধীন ছিল, জমিদারদের নিকট থেকে একটা সালিয়ানা খাজনা পেলেই নবাব সুবাদার সন্তুষ্ট, আভ্যন্তরিক শাসন-পালন জমীদার, জ্যোৎদার বা গ্রাম্যমণ্ডল পঞ্চায়তের হাতে। হৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঘরের ব্যাপার পরের হস্তগত হয় নি।

যদি নব-জাগরণ ব'লে একটা কথা ব্যবহার করতেই হয়, তবে সেটা ধরতে হবে বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন-সময় হ'তে।

আমি ব্রাহ্মণ মানি। ব্রাহ্মণত্বের চরণতলে এই শুভ্র শির আমার সহস্রবার অবনত করি, কুসংস্কারাপন্ন মূর্খের দৃঢ়বিশ্বাস যে, এই 'দেব-দেশের' সর্ব্বতোমঙ্গলের জন্য সত্য ব্রাহ্মণত্বের পুনরভ্যুদয় একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ-হৃদয় ব্রাহ্মণ-আত্মা আর উপবীত শোভিত বক্ষঃস্থল একই বস্তু, একথা স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত নই।

পৌরোহিত্যের আধিপত্য স্বার্থ-প্রণোদিত স্মৃতির শাসনে সমগ্র জাতিটাকে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অসাড় জীবন-সমষ্টির নষ্টগোষ্ঠীতে অবনত ক'রে দিয়েছিল।

যে মহান্ মানব সমাজবন্ধন গঠনের আদিকালে পার্থিব সমস্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, ভোগ-বিলাস, অধিকার-প্রভুত্ব, অন্যান্য জাতির হস্তে তুলে দিয়ে, তপশ্চরণ, বেদাধ্যয়ন, সমাজে জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতি জগতের মঙ্গলকর কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে নিজের সামান্য প্রাপ্যকে ভিক্ষা আখ্যায় ভূষিত ক'রে ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করেছিলেন, ক্রমে তাঁর বংশধর আধিপত্যের মাদকতায় বিভোর হয়ে অভিধানকার রূপে লিখলেন, "ব্রাহ্মণের অর্থ—ভূদেব, আর শূদ্রের অর্থ দ্বিজদাস, অন্ত্যজ, জঘন্য।" সঙ্গে সঙ্গে অভিধানকারের মাসতুতো ভাই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মশায় আইন জারি করলেন, বঙ্গদেশে একমাত্র সূত্রধারি-পুত্র ভিন্ন অপর সকল লোকই শূদ্র। এই শূদ্র নিজের পিতৃশ্রাদ্ধ করতে ব'সে যদি পুরুত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে যে,

"আমায় কি বলাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না", অথবা কন্যাদানের সময়েও যদি ঐরূপ একটা প্রশ্ন ক'রে বসে, তবে ঠাকুর তখনই সেই অভাগাকে ম্লেচ্ছ নাস্তিক প্রভৃতি ধর্ম্মমণ্ডিত সম্বোধনে ব্রহ্মশাপের ভয় দেখান।

আধিপত্যের তপ্ত মদিরার মোহে মানবের মস্তিষ্ক যতটা বিকৃত হয়ে ওঠে, বোতলগর্ভস্থ সুরার তারল্যে ততটা তীব্রতা নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতির ইহ-পরকালের গতি আমার হাতে ব'লে কথায় কথায় শাসিয়ে, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যের উপর একটা একটা টেক্স বসিয়ে, "তোদের মুক্তির চাবি আমার হাতে" ব'লে ভয় দেখিয়ে দ্বিজ-পরিচয়ে সমাজের নেতৃত্ব একায়ত্ত ক'রে তাঁরা সমস্ত দেশটার বিবেকবুদ্ধি, এমন কি, সহজ জ্ঞান পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে দিয়েছিলেন; ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁদেরই গোত্রপতি আদিপুরুষগণ সিদ্ধান্ত ক'রে গেছেন যে, প্রত্যেক মানবই সেই পরমব্রহ্মের এক একটি অংশ, শূদ্রের অন্তরস্থ যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি ভদ্রভাবরূপে আবদ্ধ ছিল, ঐশিক প্রেরণায় মধ্যে মধ্যে তিনি বিদ্রোহী হবার প্রয়াস পেলেও, অজ্ঞান-জনিত ভয়বিহ্বল রসনা কিছু প্রকাশ করতে সাহসী হ'ত না।

এমন সময় ইংরাজ এসে তাঁদের মুদ্রিত পুস্তক বাঙ্গালীর হাতে দিলেন। এই নূতন ব্রাহ্মণদের বিদ্যাদানরূপ সদাব্রত অনুষ্ঠানের দুইটি অভিপ্রায় ছিল;—একটি প্রকট, অপরটি কূট। তাঁদের উভয় অভিপ্রায়-সিদ্ধির ভিতর দিয়ে আমরা কু-ফল সু-ফল দুইই লাভ করলেম। কু-ফল মস্তিষ্কের তেজোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রম শক্তির আশ্রয় হাত-পা অবশ হয়ে পড়ল, সত্য শূদ্রত্ব দাসবৃত্তিকে আমরা ইষ্টের আসনে বরণ ক'রে তুললাম; অপরদিকে পৌরোহিত্য-শাসন অত্যাচার ব'লে বুঝতে পেরে সমস্ত দেশীয় আচার, দেশীয় ব্যবহার, দেশীয় ভাব ভাষা সকলের উপর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ক্রিয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব।

মিল্টন-মেকলে-কল্পিত মদিরা-পান-জনিত প্রথম নেশার অবসানে ইংরাজী অধ্যয়নের সু-ফল আহরণে আমরা আপনাদিগকে নিয়োজিত করেছি।

জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণযুগে বিদ্যালাভে বঞ্চিত থেকে আমাদের চোখে ঘোলা প'ড়ে গিয়েছিল; বৃটিশ বিদ্যামদের উত্তেজনা, পরে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে আমাদের প্রাণ শ্বেত-প্রেমে মোহিত ক'রে দিয়েছিল, ইংরাজের দোকান থেকে কেনা চশমা প'রে আমরা শ্যামলের কোমল সৌন্দর্য্যের পানে দৃক্‌পাত না ক'রে মর্ম্মরের কঠোর শুভ্রতাই রূপ-গুণের প্রকৃষ্টাধার ব'লে মনে করতে লাগলেম; কিন্তু

অভ্যাসে অভ্যাসে ঐ নূতন চশমা যখন চোখের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে বীক্ষণশক্তি সুস্পষ্ট ক'রে দিলে, তখন যে কেবল আমাদের নিজের ঘরে কত শোভনীয় সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত রত্নরাজি আছে, তাই দেখ্‌তে পেলেম—তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দেখে শিউরে উঠ্‌লেম যে চশমাখানির জন্য সাহেব যে বিলখানি দাখিল করেছেন, তার অঙ্ক গণিতের সংখ্যায় নির্ণীত করা যায় না ; বুঝলেম, এই চশমার বিনিময়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিক্রয় ক'রে ব'সে আছি। পুরুত ঠাকুর তিথি-ভেদে মধ্যে মধ্যে আমাদের উপবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পারণেও পুণ্য আছে, এ সূত্রটিও যোজনা ক'রে দিয়েছিলেন। নবাগত দ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণগণ যে মহাড়ম্বরে রজত-সূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন, তার পুণ্যফল লাভার্থ আমাদের যে মাঝে মাঝে উপোস কর্‌তে হবে, তা নয়, উপবাসী অপেক্ষাও শতগুণে হীন হেয় ভিখারীর ঝুলি দাঁড়াচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকা।

"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে।" বুঝলেম, তরোয়াল নয়, বন্দুক নয়, কামান নয়, বিকলাঙ্গকরণের বা জীবনহননের কোন অস্ত্রই নয়, ইংরাজ জয় করেছে আমাদের মনকে, আমাদের ভাবকে, আমাদের আত্মজ্ঞানকে তার সাহিত্যের প্রবল প্রতাপে ; আর সেই সাহিত্যের শক্তি জীবন্ত ইংরাজের স্বদেশ-প্রীতিতে।

"Right about turn"। প্রেমিক বাঙ্গালী তখন একেবারে ঘুরে দাঁড়াল বাড়ীর দিকে মুখ ক'রে। নিধুবাবুর গীতে, ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারে যা আধ-আধ ভাষায় ফোট-ফোট হয়ে উঠ্‌ছিল, বঙ্গের নবীন কবি রঙ্গলালের রসনা তা তরঙ্গ তুলে ব'লে উঠ্‌লো ;—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায় ?"

অব্যবহিত পরে দেবেন্দ্র-মন্দিরস্থ সারস্বতকুঞ্জবিহারী বিহঙ্গ-কুলকণ্ঠে নানা ছন্দে জাতীয় সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌ল, তারপর স্বদেশ-প্রেমের আকুলতা মধুসূদনের মেঘনাদে, হেমচন্দ্রের ভেরীনাদে, নবীনের পলাশীর পাদে পাদে।

গৌরাঙ্গের জন্মভূমিতে প্রেম-প্রবাহিণী খাতের রেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, মাঝে মাঝে বন্যা আসে, প্রেম দুকূল ছাপিয়ে উঠে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ তখন এক হ'য়ে যায়, তাই নীলকর-পীড়িত দীন কৃষকের প্রেমে ধীরাজ অধীর হয়ে বুকের

বেদনা গানে নিবেদন করলেন, অশ্রুপাতে দীনবন্ধু প্রথম নাটকের মত নাটক লিখ্‌লেন 'নীলদর্পণ', সে চোখের জল এত তপ্ত যে, তার অনলবাহী স্রোতে বঙ্গভূমির সমস্ত ইংরাজী নীলক্ষেত চিরদিনের জন্য জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

পদ্যে বাঙ্গালার পূর্ব্বসম্পদ্ গৌরবের সহিত সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শনের উপযুক্তই ছিল, ক্রমে পুনর্যৌবনের নব নব লাবণ্যচ্ছটায় ভূষিত হয়ে পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের দৈবশক্তির প্রভাবে বঙ্গের কবিতা এক্ষণে জগৎ-পূজিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য নব্য-বঙ্গের নিজের সৃষ্টি। দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত প্রথম যুবকদলই সমসাময়িক-সমাজের নিকট ইয়ং-বেঙ্গল বা 'নব্যবঙ্গ' উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত হ'লেও তাঁর সংস্কৃতের মুক্তামালাজড়িত সদ্যোনবনীত-তুল্য গদ্যের মধ্যেও ইংরাজী-সাহিত্যের সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর-প্রেমতত্ত্বের নবীন ধারা ভাষায় প্রকাশের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে পাশে বসিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' মুদ্রিত গদ্যের মধ্যে যে নূতন ওজস্বিতা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছেন, তার তেজ, তার ঝঙ্কার আজও পর্য্যন্ত অনেক প্রবন্ধে—অনেক কাব্যে প্রদীপ্ত ও ধ্বনিত। ক্রমে কথাসাহিত্যের সাজে বাঙ্গালাগদ্য দেখা দিলে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালে' এবং সিংহ মহোদয়ের 'হুতুম পেঁচায়।'

ইংরাজী শিক্ষিত মনীষীগণ সংবাদ বা সাময়িক-পত্রে ও গ্রন্থাকারে তাঁদের বাঙ্গালা রচনা প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেও তখনকার শিক্ষিতসাধারণ মাতৃভাষাকে গর্ভধারিণীর সঙ্গে অন্দরের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন ; নিজের বাপই পত্রস্থ হতেন 'মাই ডিয়ার ফাদার' ব'লে, তা অন্যে পরে কা কথা।

ঘরের এই উপেক্ষিতা বাণীটিকে সমাজে তুলে লন, বঙ্গসাহিত্যাশ্রমের কুলপতি বঙ্কিমচন্দ্র। সাহিত্যের পূজামণ্ডপে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে দুর্গোৎসবের আনন্দরবে সমগ্রদেশকে উদ্বোধিত করেন।

আজকাল শুন্‌তে পাই, নবনব্যবঙ্গের চক্রবিশেষে কথা উঠেছে যে, বঙ্কিমের ভাষা আর চলে না। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে বল্‌তে হবে যে জাহ্নবীজলও এখন অচল, যতক্ষণ না দ্রবময়ী বিলাতীকলের আকর্ষণে লৌহনলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দ্বিতলের মর্ম্মরমণ্ডিত স্নানাগারে উঠে সাবান-মার্জ্জিত সফেন কেশতরঙ্গের উপর ক্ষীণধারা বর্ষণ করেন। কবি ব'লে গেছেন :—

"We call our fathers fools, so wise we grow,
Our wiser sons will also call us so."

ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবীন চিন্তার ধারা আপনার দেশের ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে, বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে প্রথম প্রবৃত্তি দিয়ে যান বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর একাশ্রমী সুহৃৎ কতিপয়। মেঘনাদ-রচয়িতা মধুসূদন যেমন কাশীরামদাস কৃত্তিবাস হ'তে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত বঙ্গের পূর্ব্বতন কবিগণের চরণে মস্তক অবনত ক'রে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন, শিষ্টাচার নবীন লেখক-সমালোচকদিগকে সেই কবিশ্রেষ্ঠের পথানুসরণ কর্‌তে ইঙ্গিত করে।

সেই পুণ্যাত্মগণ-প্রবর্ত্তিত ঘৃতপ্রদীপের মঙ্গলশিখাই নবাগতের মস্তিষ্কে মোমবাতির কল্পনা জাগ্রত করে; মোমবাতি ব'লে দেয়, গ্যাসের সম্ভাবনা, পরে ক্রমবিকাশে সেই গ্যাস আজ বিজলী আলোকে বঙ্গের কাব্যসাহিত্যকে দৈবজ্যোতিতে বিভাসিত কর্‌ছে।

স্বনামধন্য অনেকগুলি মনীষীর প্রতিভা আজ বাঙ্গালা ভাষাকে জ্ঞানরাজ্যের এই বরণীয় আসনে উন্নীত করেছে; তন্মধ্যে কয়েকটি পুণ্যনাম স্মৃতি, লোক-শ্রুতি ও ইতিহাসে সুস্পষ্ট। জনকস্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়; সৌষ্ঠব-সম্পাদনে সপুত্র মহর্ষি ও অক্ষয়কুমার দত্ত; সালঙ্কারা কন্যা সৎপাত্রে সমর্পণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; আর ভাষাদেবী এক্ষণে যে বিশ্ববিদ্যালয়-রাজসংসারের পাটেশ্বরীগণের মধ্যে অন্যতমা, তা মুখোপাধ্যায়-কুলাঢ্য সার আশুতোষের ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে।

কথা-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বাহুল্যই এক্ষণে বঙ্গভাষাকে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সমাদৃত করেছে। সংস্কৃতের ভূরিভোজনে নবীন গদ্যের ওজন যখন এমন ভারি হয়ে উঠ্‌ছিল যে, তুলাদণ্ডের বিপরীত দিকে কথায় কথায় অভিধানের বোঝা চাপিয়ে পাষাণ ভেঙ্গে না নিলে বাগর্থ সমান বুঝে আর ভাবগ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না, পাঠ-ব্যায়ামরূপ শ্রমসাধনে বাল-বিদ্যার্থী ভিন্ন অপর সাধারণে সে মল্লভূমিতে প্রবেশ করতে সহজে রাজি হতেন না, তখন টেঁকচাঁদ নামধারী স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়, বাঙ্গালা বৃহৎ মহাভারত প্রণয়নে অমর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। সেই সময়ের এই দুইখানি পুস্তক অতি উচ্চ-শিক্ষিত হ'তে বর্ণমালার সহিত পরিচিতমাত্র সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ের আদর অধিকার ক'রে বসে। সংসারের নিত্য ঘটনার বাস্তব চিত্র প্রদর্শনে, লোকালেখ্যলিখনে ও ব্যঙ্গ-রসের রঙ্গ-মাধুর্য্যে পুস্তক দু'খানি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হলেও ভাষাঠাকুরাণীর শ্রীঅঙ্গ হ'তে সংস্কৃতের অলঙ্কার দূরীকরণের প্রয়াসে মাকে যে কেবল সাড়ী-শাঁখায় সাজান হয়েছিল, তা নয়; মাঝে মাঝে যেন তাঁর কোমরে গামছা পর্য্যন্ত জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বুঝ্‌তে পারা যায়।

সেই সময় হ'তে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিবিধ বিচিত্র বেশপরিবর্ত্তনে ভাষার শিঙার সাজ চল্‌ছে এবং চল্‌বে যতদিন বাঙ্গালীর প্রাণে ভাব ও রসনায় রব থাক্‌বে। সকল যুগের সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এই বিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করে। বৈদিক ভাষার সঙ্গে রঘুবংশের ভাষার জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু অশৌচ স্পর্শে না, কবিকঙ্কণের পদ্যে ও রবীন্দ্রনাথের পদ্যেও ঐরূপ কুটুম্বিতা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী গদ্য পদ্য বুঝতে হ'লে এখনকার ইংরাজকেও টীকাকার খুঁজে বেড়াতে হয়। এই সেদিনকার কথা, আমাদের পাঠ্যাবস্থায় মেকলে-এমারসনের আদর্শ যেরূপ আদৃত হ'ত, বিংশতি শতাব্দীর ছাত্রগণের কাছে তার আর সে আদর নাই। ব্রাউনিংএর ফ্রাউনিংএ যে সোণার বায়রণও বুঝি কলেজস্কোয়ারের মোড়ের পুরানো আয়রণের দোকানে স্থান পায়। সিংহ মহোদয় তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার' ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, বাঙ্গালা বেওয়ারিশ ভাষা; ছোট ছেলেরা যেমন একটু মাথা-ময়দার নেচি পেলে যা ইচ্ছে তাই কতকগুলো গ'ড়ে ফেলে, কোন কোন গ্রন্থকার ভাষার সেইরূপ শ্রাদ্ধ করেন॥ এক্ষণেও যে সেইরূপ লেখক-শিশু দেশে নাই, একথা বলা যায় না; কিন্তু তার জন্য কারও আশঙ্কা পাবার আবশ্যক নাই; কেন না, নাবালক অবস্থার ছেব্‌লামি সাবালক হ'লেই কেটে যায়, তখন সে পৈতৃক সম্পত্তি কি হিসাবের সঙ্গে বুঝে নিতে পারে।

আজ তাদের সাধের সাহিত্য-গৌরবে বঙ্গবাসী ন্যায্য প্রাপ্য গরবে গর্ব্বিত। গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে বাঙ্গালা পুস্তকাশ্রম ও পাঠাগার। মাতৃবাসে বা প্রবাসে চট্টগ্রাম হ'তে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে বাঙ্গালীর নিবাস উপনিবেশ আছে, পুণ্যব্রত পালনের ন্যায় সেই সেই স্থানেই বৎসরে বৎসরে সাহিত্য-সম্মিলন সংঘটিত হয়। সাহিত্যভক্ত-পদরজে গড়াগড়ি দিয়ে ধন্য হবার জন্যই এই দীন প্রাচীন আজ ময়মনসিংহের বাণী-তীর্থে এসেছে।

ধর্ম্মের ন্যায় আমার মনে ধারণা দৃঢ় যে, সাহিত্যের শক্তি, সাহিত্যের মর্য্যাদাই বাঙ্গালী জাতিকে জগতের চক্ষুতে বরেণ্য ক'রে দেবে। হিন্দু সরস্বতীনামা নারী-প্রতিমার পদতলে ব'সে বিদ্যার আরাধনা করে। স্ত্রীশিক্ষা এদেশে একান্ত বিদেশী আমদানী নয়। পঞ্চশত বর্ষাধিক পূর্ব্বে আপনাদিগের এই ময়মনসিংহের কাব্য-তপোবনে কবি তপস্বিনী চিত্র-কৌমারব্রতধারিণী চন্দ্রাবতী আবির্ভূতা হয়েছিলেন; বঙ্গের অন্যান্য চক্রেও শিক্ষিতা ও অক্ষরজ্ঞানবিহীনা অনেক গ্রাম্য

কবি নারীরূপে দেখা দিয়ে গেছেন। বর্ত্তমানে আবার সেই দেবীরা লেখনীধারিণী, ভাবোচ্ছ্বাসের গীতে মাতৃভূমি পূতকারিণী। সাহিত্যের একজায়ে হিন্দু মুসলমান তরুণ নরনারীরও জাতি-সমন্বয়ও হয়ে যাচ্ছে; এ জোড়কলমে সমজাতীয় রসে রসে মিশে একতার মধুফল ফল্‌বে।

আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি যে অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতবর্ষ শিষ্ট-সাহিত্যের সম্মানে বঙ্গবাণীকে সমাদৃত কর্‌বে। আমি প্রথমেই বলেছি যে, কালপ্রভাবে রুচিভেদে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশভূষা অলঙ্কারাদি নূতন নূতন ছাঁচে গঠিত হলেও কি প্রাচীন ও কি নবীন বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ প্রেমের রূপান্তরমাত্র। সাহিত্যের সারথ্যে আমাদের প্রেমের রথ-রথ ভারত-ভ্রমণ ক'রে হিন্দুস্থানের মর্ম্মস্থানে বিজয়-পতাকার দণ্ড প্রোথিত কর্‌বে।

পাণ্ডব-নির্ব্বাসন।

লেখক—স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কৌরব-সভা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—:*:—

দুর্য্যোধন। সখে!
কহিতে পিতাকে এ সংবাদ, সভা ছাড়ি
ক্ষত্তা বুঝি গেল?

কর্ণ। ভাবি, বিলম্বে কি ফল,
লইতে দাসীরে রাজাগারে ততক্ষণ।

দ্রৌপদী। হায় বিধি! ছিল যদি অদৃষ্টে লিখন
এতেক দুর্গতি, তিরস্কার তারপর,
মৃত্যু কেন না হয় এক্ষণে? অন্তর্য্যামি!

কোথা হরি! কাতরা কামিনী ডাকে আজ,
এ বিপাকে, ওহে লজ্জানিবারণ! কর
এ দাসীর দুঃখ বিমোচন, দয়াময়!
নারী প্রাণে আর নাহি সয়; কোথা কৃষ্ণ!
রক্ষ ধর্ম্ম সতীত্ব সখীর তব প্রভু!

দুর্য্যো। কহ কৃষ্ণা! সখা তব কৃষ্ণ বুঝি হরি?
মরি মরি! পঞ্চপতি, সতী তবু! দেখি
কৃষ্ণ প্রতি বড় অনুরাগ, সখী তার!

কর্ণ। চিরদিন নটীর এ খল ব্যবহার!

দুর্য্যো। দুঃশাসন!
কি বিচার! লও ধ'রে ওরে নিজস্থানে,
পণে দাসীভাবে কুরুগণে সেবিবারে।

দুঃশাসন। আয়! (কৃষ্ণাকে পুনঃ ধরিতে অগ্রসর)

(ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। আরে দুর্য্যোধন! তুই দুষ্টমন্ত্র শুনি
গেলি ছারেখারে; পাঞ্চাল-রাজনন্দিনী
পাণ্ডবমহিষী, তারে আনিবি সভায়
দাসীপণে, কভু মনে হয়নি আমার।
(দ্রৌপদীর প্রতি)
ক্ষমা দেহ বৎসে! ক্রোধ কর পরিহার
মোরে চাহি; কুরুকুল-বধূগণ মাঝে
তুমি সে প্রধান, ব্রতধর্ম্মে, পুণ্যকর্ম্মে
পবিত্র-চরিত্র-গত সুদুর্লভ গুণে,
ত্রিভুবনে তোমার বাখান বীরনারী;
হায়! ভাগ্যদোষে মম কুপুত্র জন্মিল,
তব দুর্গতি করিল, হেন দিল দুঃখ;
কর ক্ষমা, না হও বিমুখ, সতি! তুমি
সন্তুষ্ট নহিলে মম কুলধ্বংস হবে,
মোর ব্যথা তোমারে লাগিবে, তে কারণে
ক্রোধে স্থান নাহি দেও মনে। কহ বধূ!

কহ, দিব চাহ যেই বর, হও তুষ্ট
ত্যজি কটূক্তির চাহ যেবা ইচ্ছা তব,
রত্ন ধন সিংহাসন, বর দিব তোমা ;
কর ক্ষমা কুরুগণে সুপ্রসন্ন মনে।

দ্রৌপদী। যদি দেব ! দিবে বর এ দুঃখিনী জনে,
ধর্ম্মরাজ দাসত্ব মোচনে দেও আজি
অনুমতি, সর্ব্বপৃথ্বীপতি চক্রবর্ত্তী
দণ্ডধর পাণ্ডবপ্রধান, দাস বলি
ভারত ভিতর যেন কেহ তাঁরে কভু
নাহি করে নাম। মম পুত্রগণে কুত্র
দাসাত্মজ বলিয়া না গণে কোনজনে।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু ! হইনু তুষ্ট অতি তব প্রতি,
গুণবতি ! সম্প্রতি মাগহ অন্য বর ;
একদান নহেত সোসর তব সতি !

শকুনি। কি দুর্ম্মতি ! তবু যদি থাকে চারিজন !

দ্রৌপদী। কহি, আর্য্য ! তুষ্ট মোরে হইলা যদ্যপি,
আর পতি চারিজনে সহ অস্ত্র-যান
দাসপণে কর মুক্ত সমক্ষে সবার।

ধৃতরাষ্ট্র। দিনু বর, মুক্ত সবে। চাহ কিছু আর
যেই তব মনে লয় ; কুলের আশ্রয়,
ভরত বংশের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর কুমার,
শ্রেষ্ঠা তুমি মহিষী তাহার, কহি সত্য—
বড় ভাগ্য মম আজি, পাই অবসর
দিতে বর তোমা ভাগ্যবতি ! কহ বধূ !

দ্রৌপদী। ক্ষম আর্য্য ! করি পদে নতি !
আছি তুষ্ট অতি, দেব ! দুই বর পাই ;
তৃতীয় না চাই—শাস্ত্রে নাহি সে বিধান।
শুনি দ্বিজ গুরুমুখে উচিত বৈশ্যকে
চাহে মাত্র এক ! ক্ষত্র লবে দুই বর,
শত পাবে ব্রাহ্মণকুমার ধর্ম্ম জানি।

তুমি গুরু গুরুর আমার, লোভ মনে
না জন্মাও আর, এই ভিক্ষা চাহি দেব !
লোভে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার, পাপ স্পর্শে
নাহিক নিস্তার ধর্ম্মাশ্রয়ে শ্রেয়ঃ মানি।
সত্যে মুক্ত স্বামী ; তুচ্ছ গণি ধনে,
ভাগ্যে পূর্ব্ব পুণ্যে নর করে তা অর্জ্জন ;
ক্ষম আর্য্য ! করি পুনঃ চরণ বন্দন।

ধৃতরাষ্ট্র। যাও বৎসে ! হউক কল্যাণ, ধর্ম্মজ্ঞানে
তোমার সমান নাহি নারী, কহি মুক্তস্বরে ;
ধন্য ধন্য সতী তুমি ভারত ভিতরে।

কর্ণ। সখা ! দেখেছ কি কোথা শুনেছ কখন,
হেন হীন পুরুষ উদ্ধারে নারী যারে ?
দাসত্ব-পাথারে পাণ্ডব ডুবিয়াছিল,
পাঞ্চালী তরণী হ'য়ে, হেন অসময়ে,
হের পঞ্চে উদ্ধারিল ; বিফল জীবন,
ব্যর্থ গর্ব্ববাক্য সে কাপুরুষ জনার !

ভীম। ওরে সূতপুত্র ! অন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র জ্ঞান
থাকিলে, কহিস্ একথা ? অহো ! কি ধৃষ্টতা !
শূদ্র হ'য়ে, ক্ষত্র মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ, মূঢ় !
হইস্ রে সদা ; সে তরে কহিব শোন্,
বিধি কৈল নিরূপণ সম্বন্ধ সংসারে,
সখামধ্যে শ্রেষ্ঠ সহধর্ম্মিণী রমণী !
যে বিনে জীবন দুঃখকর গণি, যার
মিলনে প্রথমে নর, গৃহ-ধর্ম্মে হয়
রত, যাহার সহায়ে অর্থ-উপার্জ্জিয়ে,
করে দান যজ্ঞব্রত তপস্যা কতেক,
পত্নী দ্বিতীয়া হইয়া বিষয় বাসনা
ভুঞ্জি যার প্রেমসুখে, সুপুত্র জন্মায়ে
সাধে নিজ পিতৃগণ-পিণ্ড-প্রয়োজন !
থাকে কেহ এত অভাজন, জ্ঞাতি বন্ধু

আত্মীয়-স্বজন, পতিত বলিয়া ত্যজে,
পত্নী তারে ভক্তিভাবে ভজে, সতীধর্ম্মে
চিতানলে হয় পতি-সহায় মরণে.
পরলোকে তারে তাকে স্বপুণ্য দিয়া যে,
সে কেননা হবে গণ্য ত্রাণকর্ত্তা ব'লে
কর্ম্মক্ষেত্রে এ সংসারে ?
জিজ্ঞাস দ্বিজাতিগণে আচার্য্যের ক্রমে।

দ্রোণ। বটে ! এই বাক্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ !
ধন্য ভীম ! ক্ষত্র-ধর্ম্মে তব সে বাখান !

কর্ণ। মিষ্টান্ন ভক্ষণ বটে পাই সে প্রমাণ !

ভীম। এবে এক কথা তোরে রে সূত-সম্ভব !
এতই কি দুর্ব্বল পাণ্ডব তোর মনে ?
সত্যপণে সমুদ্রে নিমজ্জমান প্রায়
অশক্ত আছিল শাস্তি দিতে, তোর সম
দুষ্টমতি কপটী দুর্ব্বৃত্ত খলগণে !
রাগাইয়া ভীমে তোমা সব বিনা কোথা
কে বাঁচে জীবনে ? কেন জানে অন্তর্য্যামী !
লজ্জাহীন তোর সম কর্ণে নাহি শুনি,
কপটে পাশায় জিনি হীন বল, কিনা
আজ পাণ্ডবেরে ! অথবা সংসারে বুঝি
নাহি হীন আমার সমান ; নহে কেন
কালদণ্ড সম এই ভুজযুগ্ম ধরি
চূর্ণ নাহি করি তোরে রেণুর প্রমাণ ?

অর্জ্জুন। আর্য্য ! ক্ষম, কিবা কার্য্য হীনজন বাক্যে
করি কর্ণদান ? জান দেব ! সিংহ লক্ষ্য
গজেন্দ্র প্রমাণ ! হীন সহ সম দ্বন্দ্বে
অপমান সার ! হীন জাতি সূতপুত্র
অতি দুরাচার, তার সনে নাহি শোভে,
বিতণ্ডা বিচার ভরতবংশজগণে !

ভীম। না না পার্থ ! সত্যহীন মোরা ; নহে কেন

সহে নেত্রে, সহ রে কেমনে, পুত্রবতী
পাটেশ্বরী নারীর দুর্গতি শত্রু করে ?
কি হেতু পাণ্ডবনাম ? দেহে রহে প্রাণ ?
হ'ল হতমান, বল বাকী কিবা আর ?
ব্যর্থ ভুজবীর্য্য, দেহ ভার, স্বাধীনতা,
নারী যার ভিক্ষা মাগে, জ্ঞাতি করে দান !
করিয়াছি পান পূর্ণপাত্র হলাহল,
তবে বিলম্বে কি ফল ? যদি সত্যপণ-
মুক্ত ধর্ম্মরাজ, শত্রু সব মিলি আজ
আছে এক ঠাঁই ; ভাগ্যে এ সুযোগ পাই !
উঠ ভাই ! বৃথা বাক্-বিতণ্ডা-বিস্তার,
বাহুবল সার ; কোন্ ছার ক্ষুদ্র কুরু ?
করিব সংহার মুহূর্ত্তেকে, একে একে
মারিব বাছিয়া, তবে হিয়া জুড়াইবে ;
নির্ম্মূল ! নির্ম্মূল শত্রুকুল মোর কোপে,
হবে বসুধার মহাভার বিমোচন !

যুধিষ্ঠির। রহ ভীম ! ক্ষমাগুণ বীর-আভরণ !
ক্ষমার্হ যদ্যপি শত্রুজন হয় ভাই ;
সুযোধন অন্য কেহ নয়, বুঝ মনে,
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত পুত্র সে কৌরব।

অর্জ্জুন। দুষ্টের দমনকর্ত্তা শত্রু-নিসূদন
হরিপদ স্মরি, আর্য্য ! রহ দিন চাহি।

ভীম। ভাইরে অর্জ্জুন ! কিসে ন্যূন, ভাবি তাই ;
কেন ধর্ম্মরাজ আজ ত্যজিল স্বকাজ ?
শত্রুবধ ক্ষত্রধর্ম্ম নীতির বিধান।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত ! বন্দি দেব ! পদযুগ্ম তব !
কহ এবে আজ্ঞাহীন পাণ্ডব সবিবে
কিবা আজ্ঞা, আর এখন কি কার্য্য তার ?
হে আর্য্য ! কর্ত্তব্য দেহ করি নির্ব্বাচন !

ধৃতরাষ্ট্র। শুন বৎস ! গান্ধারীর মোর মুখ চাহি

দুর্য্যোধন-দোষ যত করিবে মার্জ্জনা।
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমার তুলনা মিলে নাহি
ভূ-ভারতে ; সর্ব্বশাস্ত্রে তুমি সে পণ্ডিত,
সুধীর সুব্রত, জনহিতপর সদা—
সত্যভক্ত সাধুশ্রেষ্ঠ সত্যকর্ম্মশীল !
ক্ষত্রবীরকুলমাঝে তুমি ধর্ম্মবীর !
সদা ধর্ম্মপদে মতি স্থির, কদা কোন
গুরুদণ্ড না কর চালন অন্যজনে।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কুরুগণে সর্ব্বক্ষণ
পালন তোমার ভার, বংশের তিলক
তুমি তাত ! তবাধীনে কৌরব সনাথ !
আজি পুত্র মম দুষ্টজন মন্ত্রণায়
কৈল যেই অত্যাচার, তোমা বিনা সহে
সাধ্য কার ? দুর্য্যোধন ভাইত তোমার ;
হঠকার কৈল সুধু মাতিয়া ব্যসনে।
ভাবি মনে দেহ ক্ষমা, কি কহিব আর !
পাশায় এতেক হবে মনেতে ছিলনা।
বৃথা গতানুশোচনা, বৃথা আত্মগ্লানি,
কে মিত্র কে শত্রু এবে বুঝিলাম সার !
যাও তাত ! সাম্রাজ্য শাসহ আপনার।

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত আজ্ঞা ধরি শিরে, গুরুজন
যত হেথাকারে সবার চরণ বন্দি,
যাচিছে বিদায় পঞ্চপাণ্ডব সম্প্রতি !

[পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান।

সকলে। জয় ধর্ম্মরাজ জয় !

বিদুর। জয় যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম দ্বাপরপাবন !

ভীষ্ম। ধন্য বৎস ! ধন্য তুমি ভারত-ভূষণ !

দুঃশাসন। দাদা ! একি হ'ল, বৃদ্ধ পিতা বুদ্ধিদোষে,
আর ক্ষত্তা পরামর্শে ভুলি, সকলিত
বিনাশিল, যতেক্ জিনিয়া ফিরে দিল !

শকুনি। ব্যর্থ শ্রম—কৌশল বিফল হ'ল আজি !
তক্ষকে আঘাতি পুচ্ছে ছাড়ি দিলা বাপু !
না করিলা ভাল !

দুর্য্যো। মামা ! কি উপায় আছে আর বল ?

শকুনি। পাশাই যে কেবল উপায় !

দুর্য্যো। দুঃশাসন ! সভা যেন রহে প্রতীক্ষায় !
মামা ! চল শীঘ্রগতি পিতৃ-সন্নিধান,—
পাণ্ডবে জিনিব, নহে ত্যজিব এ প্রাণ।

[সকলের প্রস্থান।]

—*: চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত। :*—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ—ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি ও দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র। শুন দুর্য্যোধন ! যদি বিবাদ মিটিল
ভাল ভালে, বুদ্ধিমানে আর কি সে কথা
পুনঃ তুলে ? হ'ল ইথে উভয় মঙ্গল।

দুর্য্যোধন। অথবা জ্বলিল কাল বিগ্রহ অনল !
হায় পিতঃ ! কেবল আমার ভাগ্য দোষে
অনর্থ তুলিলে, শেষে দুর্জ্জয় পাণ্ডবে
পেয়ে বশে বন্দী সত্যপাশে মুক্ত কৈলে,
ভুলিলে ভূপাল-ধর্ম্ম শত্রুর শাসন ;
বৃহস্পতি দেবে সে দিলা যে বিধি, জানি,
যুদ্ধে বা কৌশলে বুদ্ধিবলে যে প্রকারে
পারি শত্রু বধি—কহিয়াছ পূর্ব্বে মোরে,
তবে নাহি জানি কোন্ মন্ত্রীর চাতুরে
পড়ি আজি, দুরন্ত শার্দ্দূলে দুর্ভেদ্য সে
পিঞ্জরে পূরিয়া, ঘাঁটাইয়া ছাড়ি দিলে
নিজপুরে অকাতরে—নাশিতে আপন

সন্তান বান্ধবগণে। যদি হেন ছিল
তব মনে, কেন কৈনু পাশা প্রণয়ন ?
জিনি সর্ব্বধন পুনঃ ফিরি দিলা স্নেহে,
যাহে রাজগণে আনি বশে ; সবে মিল
হ'লে পরে অবহেলে বলে পাণ্ডবেরে
পারিতাম জিনিবারে। না জিজ্ঞাসি মোরে
কৈলা হেন, ক্ষমিবে কৌরবে ভাব মনে ?

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন তব চিন্তা কিবা সে কারণে ?
যাও নির্ভয়ে স্বস্থানে, জান স্থির মনে,
যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে ক্ষমিয়াছে তোরে চাহি
মোর পানে।

দুর্য্যো। ধিক্ মোরে ! জেনে শুনে পিতঃ !
বুদ্ধিমানে এ বিশ্বাস কভু মানে প্রাণে ?
তব উপরোধে যদি সকলি ক্ষমিবে,
কিন্তু স্থির, পাঞ্চালীর অপমান কথা
পাণ্ডব না সহিবে—লইবে প্রতিশোধ
জানিও সর্ব্বথা ; সসৈন্যে সাজিতে রণে,
তেঁই ভাই পঞ্চজনে, ইন্দ্রপ্রস্থে গেল।
পিতঃ ! ক্ষত্র হ'য়ে কেহ শত্রুরে না ক্ষমে
কভু।

ধৃতরাষ্ট্র। এ সংশয় না লয় আমার মনে ;
কি বল গান্ধার !

শকুনি। বটে, কিন্তু মহারাজ !
ঘটেছে কারণ তার—বৃথানুশোচনা !

(দুঃশাসন ও কর্ণের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এস, সখে ! কি সংবাদ দুঃশাসন ?

দুঃশাসন। এইমাত্র কৈলা যাত্রা ভাই পঞ্চজন !
দাদা ! ভীমের যে ক্রোধ, কি কব তোমায় !
মোরে চায়—আর গর্জ্জিয়া আস্ফালে সদা।

কর্ণ। সখে ! যার সাথে রণ বাঞ্ছি সদা, আজি

সে অর্জ্জুন যুগ্মতূণ গাণ্ডীব ধনুক
মোরে সদর্পে দেখায়। কেবা কারে চায়,
কিন্তু সমর অপরিহার্য্য ; দেহ আজ্ঞা,
সজ্জিত হউক চতুরঙ্গ সৈন্যগণ।
জিনিব পাণ্ডবে সত্য করিলাম পণ।

ধৃতরাষ্ট্র। শুন কর্ণ, দুর্য্যোধন ! আমা বিদ্যমানে,
পাণ্ডুপুত্র সনে রণ শোভনে না যায় !
পুনঃ তায়, জয়ের অত্যল্প সম্ভাবনা।
কোন্ জনা ত্রিভুবন-বিজয়ী পাণ্ডবে
জিনিতে হইবে শক্ত বলে ?

দুর্য্যো। হায় তাত !
তেঁই কহি, সর্ব্বনাশ কৈলে, ভরা তরী
ডুবালে আনিয়া বাহি কূলে ; বুদ্ধি ভুলে
ঘটালে আপনি আমা সবার নিধন !
কুন্তীপুত্র একবার ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে,
বলে কে আর আঁটিবে তায় ?

ধৃতরাষ্ট্র। হায় বৎস !
কি হইবে ? ঘুরে গতি কি বল উপায় ?

দুর্য্যো। এক বল দুর্জ্জয় সে মাতুল পাশায় !
পুনঃ কর আবাহন, এইবার পণ —
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে,
বৎসরেক অজ্ঞাত বাসে রহিবে, তায়
যদি প্রকাশ হইবে, ঐরূপে পুনঃ
ত্রয়োদশ বর্ষ যাবে বন, সত্য পণ !
দেহ আজ্ঞা পাণ্ডবে আনিতে, যেন পথে
পারে শীঘ্র ভেটিতে, না প্রবেশিতে পুরে !

ধৃতরাষ্ট্র। কে যাইবে ?

(প্রতিকামীর প্রবেশ)

দুর্য্যো। উপস্থিত সঞ্জয়নন্দন।

ধৃতরাষ্ট্র। প্রতিকামি ! শীঘ্র পাণ্ডুপুত্রে ভেটি পথে,

মোর নামে কহ পুনঃ পশিতে পাশায়।
হরি! করি যত কর্ম্ম তোমারই ইচ্ছায়।

[প্রতিকামী, দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রস্থান।

(বিদুর ও গান্ধারীর দুই দিক দিয়া প্রবেশ)

গান্ধারী। মহারাজ! পুত্রের কথায় পুনঃ নাকি
পাণ্ডুপুত্রে ডাকিলা পাশায় শুনি? তাহে
অনুমানি, কুরুধ্বংস তব অভিপ্রায়!

ধৃতরাষ্ট্র। শুন রাণি! বহু নাহি বলহ আমায়।
যদি সত্য যুদ্ধ হয়, কুলক্ষয় হবে;
তার পূর্ব্বে সতর্ক হতে কি যোগ্য নয়?
পুনঃ তেঁই দেবনে ডাকি পাণ্ডবে, জেন,
বিধিলিপি ফলিবে, নহিবে কভু আন।

গান্ধারী। হে রাজন! দুর্য্যোধন-কূটশাস্ত্রে ভুলি,
হৈলা হতজ্ঞান, নহে যেই কাল-অগ্নি
এই হইল নির্ব্বাণ, সেই নিজ করে
জ্বাল তারে কি কারণ? কুন্তীর নন্দন
কৈল ক্ষমা তোমা আমা চাহি; দুর্য্যোধন
কেন তারে পুনঃ হিংসা করে? রাজা!
জান নাকি হিংসাভাব পুত্রের আপন?
এর জন্মকালে ক্ষত্তা যা কহিল হায়!
দেখি ক্রমে ক্রমে সব ফলিতে চলিল।
ত্যজ কুরুকাল দুষ্টে, মা হ'য়ে যে কহি,
তবে বংশ রবে জঞ্জাল ঘুচিবে যদি।
ধনে পুত্রে হয়েছে শ্রীবৃদ্ধি ভাগ্যফলে,
একে ত্যজি বাঁচাও সকলে; নহে তব
বুদ্ধিভুলে সমূলে বিনাশ সব পাবে,
সব যাবে করিভুক্ত কপিত্থের প্রায়,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী তায় কে রাখিবে?
তেঁই প্রভু! এক ভিক্ষা মাগি তব পায়,
আর নাহি ডাক পুনঃ পাণ্ডবে পাশায়।

ধৃতরাষ্ট্র। শুন রাণি! পূর্ব্ব হতে জানি তথ্য তার,
কিবা বুঝাও আমায়? হবে ধ্বংস
কুরুবংশ এ গৃহবিবাদে সুনিশ্চয়।
না খেলিলে দ্যূত, উপস্থিত বাধে রণ,
কেমনে করি তা নিবারণ? নহে, পাছে
ঘটিবে যা বিধির লিখন, এখনত
পাণ্ডুপুত্র সত্যপণে খেলুক দেবন!
ক্ষত্তা হে! সভায় পুনঃ করিব গমন।

[সকলের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া দুর্য্যোধন ও ভানুমতীর প্রবেশ)

দুর্য্যো। একি প্রিয়ে এখন হেথায়?

ভানু। প্রাণেশ্বর!
এই কতক্ষণ আছি তব অপেক্ষায়;
দাসী করে অনুনয় পাশা প্রবর্ত্তন
যেন আর নাহি হয়, উভয় মঙ্গল
হবে তায়।

দুর্য্যো। দাসী! কে সে, পাণ্ডব-প্রেয়সী?
পণে মুক্তা এই মাত্র কৈল যাত্রা পুরে।

ভানু। ধর্ম্মমতে তব বিক্রীতা কিঙ্করী এই
অধিনীর অনুনয়।

দুর্য্যো। সম্ভব কি হয়?
যে চিতায় এই চিতে জ্বলন্ত চিতায়
কয়দিন জ্বলেছি পুড়েছি, ভুলেছিনু
তোমার ও প্রিয়ানন মানস-মোহিনি!
দুর্জ্জয় সে শত্রু জিনিয়ে পাশায়, পিতা
কৈল মুক্ত ক্ষত্ত-মন্ত্রণায়, কৌশলে সে
জিনিব আবার সুনিশ্চয়,
ক্ষতি তায় কিবা নাহি জানি।

ভানু। কিন্তু তাহে জ্ঞাতি সনে
চির বিবাদ ঘটিবে অনুমানি, নাথ!
আকুল পরাণী আশঙ্কায়।

দুর্য্যো। কি উপায়
আছে তায় রাণি! চিরশত্রু জ্ঞাতি সনে
চিরবাদ বিধির বিধানে ; বীর যেই
ক্ষত্র ধর্ম্মে মানি, তিলমাত্র নাহি গণে,
জিনে শত্রু পারে যে প্রকারে ; তেঁই কহি
ধর্ম্মাচারে বাধা নাহি দেহ প্রিয়ে!
হইয়ে সহধর্ম্মিণী!

ভানু। হেথে কি কহিব
পুন আর? পরাধীনা জীবনে রমণী।

দুর্য্যো। রাণি!
যত করি তুমি মোর জীবনসঙ্গিনী।

(উভয়ের আলিঙ্গন ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রপ্রস্থ সম্মুখ।

পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও ইন্দ্রসেন।

ভীম। ইন্দ্রসেন! কুরুসনে আজি মহারণ,
কতক্ষণে হবে সবে সমরে প্রস্তুত?

ইন্দ্রসেন। সদা সুসজ্জিত দেব! তব সৈন্যগণ!

ভীম। ধর্ম্মরাজ! কিবা আজ্ঞা করুন এখন!

যুধিষ্ঠির। শুন ভীম! সেইদিন বলেছিনু কথা,
গুরুবৃদ্ধ জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় যে কোন,
ত্রয়োদশ বর্ষকাল কখন কাহার
করিব না অপ্রিয়াচরণ, হইবনা
নিজকুল ক্ষয়ের কারণ। বাক্য মম
না করি অন্যথা ; বরঞ্চ সহিব কষ্ট
যদি ভালে লিখে থাকে ধাতা। ভাব মনে,
রণ কুরুসনে মম হয় কি শোভন?

ভীম। রাজা! শোভে ত সুন্দর আপন নারীর
সভামাঝে বস্ত্রাপহরণ? কৌরবের

শত্রুতা কি আছে বাকি বুঝিতে এখনও?
ধন্য সহিষ্ণুতা, লোকে রহিল আখ্যান,
শূদ্র হেন পাণ্ডব সহিল অপমান।

যুধিষ্ঠির। নিজকর্ম্ম অনুসারে ভুঞ্জে জীবগণ
সুখ দুঃখ এ সংসারে—দোষ দিব কারে?
অন্যে মাত্র নিমিত্ত তাহাতে, জেনো ভাই!
ভোগ বিনা কোথা হয় প্রারব্ধ খণ্ডন?
সহিষ্ণুতা সাধুর লক্ষণ সদা জানি।

সহদেব। ধর্ম্মরাজ! হোথা পুনঃ আইল প্রতিকামী।

(প্রতিকামীর প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কি সংবাদ!

প্রতি। ধর্ম্মরাজ! ক্ষম দাসে,
কি কহিব আর, অন্ধরাজ আজ্ঞা দিলা
হস্তিনায় বাহুড়ি যাইতে পঞ্চজনে,
পুনঃ পশিতে দেবনে, এইবার পণ—
যে হারিবে ত্রয়োদশ বর্ষ যাবে বন।

যুধিষ্ঠির। হের ভাই! সবে কিবা আশ্চর্য্য ঘটন!
অদৃষ্ট বন্ধন ঘুচে, ঘুচে না আবার!
বৃথায় পুরুষকার! সার শ্রীহরি চরণ,
রাজ্যভোগ বনবাস তাঁহার নিয়ম।
প্রতিকামি! অগ্রগামী হও! ইন্দ্রসেন!
বনবাস যোগ্য পরিচ্ছদ মোসবার
কর আয়োজন। সতি যাজ্ঞসেনি! হয়ে
রাজার দুহিতা এবে কোথা, কোন্ কর্ম্ম
করিবা এখন?

দ্রৌপদী। রাজা!
সতীধর্ম্ম পতি সনে করিব পালন।

যুধিষ্ঠির। হরি! করি কর্ম্ম জানি তব প্রয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

আশ্রিত পশুর প্রতি দয়া।

শ্রীমতী শচী দেবী।

শুনা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের কোনও গণ্ডগ্রামে এক রাজা উপাধিধারী জমিদার বাস করিতেন। এক সময়ে তাঁহার পুত্রের সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে বাটীর কর্ত্রী মানত করেন, সন্তানের রোগোপশম হইলে, মা দুর্গার নিকট মহিষ বলি দিব। সন্তানের রোগোপশম হওয়াতে কর্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, এবার পূজার সময়ে মহিষ বলি দিতে হইবে।

পূজার দিন উপস্থিত হইল, মহিষ আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহার সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটিল। ইহাতে গৃহস্বামী রাজা বাহাদুর স্থির করিলেন গৃহে পোষিত যে মহিষটা আছে তাহাকেই বলি দিব।

গৃহপালিত মহিষটী রাণীমাতার বড় বশীভূত ছিল! মহিষটী আর আর মানুষের নিকট দুর্দ্দান্ত, কেবল রাণীর নিকট শান্ত সুতরাং রাজা এই মহিষকে যে বলি দিবেন ইহা সাহস করিয়া রাণীকে বলেন নাই।

নবমী পূজার দিন উপস্থিত হইল, রাণীমাতা ভাবিয়াছিলেন মহিষ সংগ্রহ হইয়াছে।

এদিকে গৃহপালিত মহিষকে বন্ধন করিয়া আনা হইল, তাহাকে স্নান করান হইল, মাথায় সিন্দূর দেওয়া হইল, তাহার গলদেশে ঘৃত দ্বারা নিপীড়িত করা হইল ও উৎসর্গ করা হইল! এতক্ষণ মহিষ শান্তভাবে ছিল, কিন্তু যখন তাহাকে হাড়কাঠে ফেলা হইল তখন সে আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া একেবারে দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িল। তাহাকে ২০।২৫ জন লোকও ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে হাড়কাঠ সবলে উৎপাটিত করিয়া সেই হাড়কাঠ সমেত ছুটিয়া প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া রাণীমাতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে এমন সাহস কাহারও হইল না। শেষে রাণীমাতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঠিক মনে হইল রাণীমার শরণাগত হইল। রাণীমাতা দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "একি সর্ব্বনাশ! আমাদের পোষা মহিষকে কাটিবার জন্য কে আদেশ করিয়াছে?" বাটীর দেওয়ান আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল "মা, মহিষ মেলে নাই, কাজেই মহারাজ এই মহিষ বলি দিতে হুকুম দিয়াছেন। আপনি রাজাজ্ঞার অন্যথা করণের সহায়তা করিবেন না। মহারাজ যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাহাতে আপনি জিদ করিলেও আপনার কথা থাকিবে না। আপনি

যখন আপনার পুত্রের মানত করিয়াছেন তখন মানত রক্ষার জন্য আপনাকে এই মহিষ অর্পণ করিতে হইবে, অন্যথায় আপনার পুত্রের অকল্যাণ হইবে।"

রাণীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "আমিত এ মহিষ বলি দিবার মানত করি নাই। সুতরাং ইহাকে বলি দিতে কিছুতেই দিব না।"

রাণীমাতা একামাত্র একদিকে, আর সমস্ত লোক অন্যদিকে। কাজেই তাঁহার সমস্ত কথা ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মহিষ যখন উৎসর্গ করা হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই ইহাকে বলি দিতে হইবে, অন্যথা প্রত্যবায় ঘটিবে, এই কথা সকলেরই মুখে শ্রুত হইতে লাগিল। রাণীমাতার পুত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে এক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কল্পনা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তিনি মহিষের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন সুতরাং মহিষের ভয়ে কেহই তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিল না।

এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও রাণীমাতা মহিষকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, নানা কৌশলে মহিষকে নূতন বিপুল হাড়কাঠের নিকট আনা হইল, ও তাহাকে বলিদান দিবার সমস্ত উদ্যোগ হইল। সকলে শক্তিসমবায়ে মহিষকে হাড়কাঠে ফেলিল। মহিষ এবারে আত্মশক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাণীমাতার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। রাণীমাতা এবারে প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং একখানি পাঁঠা কাটিবার যে খড়্গ ছিল তাহা ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহিষ বলি দিবে দাও, কিন্তু ঐ খড়্গ মহিষের উপর পড়িবামাত্র এই খড়্গ আমার গলায় পতিত হইবে।" তিনি এই কথাগুলি এমন দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন যে, সকলে বিপদ গণনা করিলেন। সুতরাং মহিষ বলি দিতে আর কাহারও সাহসে কুলাইল না। রাজা বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি স্ত্রীহত্যা অনিবার্য্য হইবে। বলি না হইলে প্রত্যবায় হয় হউক্, স্ত্রীহত্যা হইলে সংসার জ্বলিয়া যাইবে। রাজার হুকুমে বলিদান রহিত হইল, রাণীমাতা যেন মরা ছেলে পুনর্জীবিত পাইলেন এইভাব দেখাইয়া চিত্তের মহাপ্রসন্নতার সহিত মহিষের গলা জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে গোয়াল ঘরে লইয়া গেলেন, এবং "আহা বাছাকে কত কষ্ট দিয়াছে" বলিতে বলিতে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যে ললনার চন্দ্রানন চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও কখন দেখিতে পায় নাই তিনি আজ দয়ার প্রভাবে স্বয়ং ভগবতীর রূপ ধরিয়া জনমধ্যে নির্লজ্জভাবে চামুণ্ডার ন্যায় ভ্রমণ করিলেন। সকলের মনে এই ধারণা হইল স্বয়ং ভগবতী, একটী মানুষ তাঁহার যেমন প্রিয় একটী পশুও তাঁহার তেমনি প্রিয়; তাহাকে রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

বরণ।

শ্রীমতী শৈলরাণী বসু, বি-এ।

আয় গো ঘরের লক্ষ্মী, আপনার ঘরে!
শোভা সুষমায় ভরি',
ভবন উজ্জ্বল ক'রি
নয়নে আন গো শান্তি, বরাভয় করে।
দুঃখ দৈন্য করি দূর,
ধন ধান্যে ভরপূর
কর গো নূতন মঞ্চ এ শুভ বাসরে।

(২)

আগত নূতন বর্ষ,
দিকে দিকে কত হর্ষ,
আহা কী শান্তিতে ভরা মুগ্ধা বসুন্ধরা!
তবু এ নয়নে মোর
বহিছে কেন মা লোর,
চির-হাহাকার ঘোরে এ হিয়া আবরা?
আন মা শান্তি সুখ,
ঘুচে যাক্ সব দুখ,
আন মা সুধা বরিষণ পরাণে ত্বরা!

(৩)

আছে মা হৃদয়-জ্বালা,
আছে মা দৈন্য-ডালা,
আছে মা লোচন-বারি পূজিতে চরণ!
কোথা পাব পারিজাত,
চন্দ চুয়া জানি না ত,
উপহার উপচার – হেম আভরণ।—
এস মা হৃদয়ে শুভা,
এস মা নিলয়ে ধ্রুবা,
এস মা শান্তি-দায়িনী—করি গো বরণ!

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ড্‌স টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন!

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র

গোল্ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্‌ড লেন, কলিকাতা।

তোমার রুগ্নদেহ কার্য্যক্ষম ও হৃষ্ট পুষ্ট করিতে

অমৃতবল্লী কষায়

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিবে

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮/১—১৯ ল্যোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
29 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA